প্রকাশক
শ্রী সত্যেন্দু চ্যাটার্জি
১৮-এ টেমার লেন
কলিকাতা—৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬

মুদ্রাকর
শ্রীমুদ্রণালয়
১২, বিনোদ সাহা লেন
কলিকাতা—৬

গ্রন্থনা
ফ্যান্সী বাইণ্ডার্স

ভূমিকা

উনবিংশ শতকে বঙ্গদেশে নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল। সেদিন সমাজ-দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে তার লক্ষণ অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবেই দেখা গিয়েছিল। শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্র এর ব্যতিক্রম ছিল না। বিচিত্র ভাবতরঙ্গের আলোড়নে বাঙালীর নবজাগ্রত সৃজনধর্মী মনীষা দীর্ঘকালাশ্রিত মত আর পথ পরিত্যাগ করে সাহিত্যের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের আবিষ্কারে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছিল। সেই অভিনিবিষ্ট মনন এবং আবিষ্ক্রিয়ার প্রকাশ এই শতকের প্রথমার্ধে দেখা গিয়েছিল সাহিত্যিক-গদ্য রচনায়। পূর্বার্ধের এই পর্বে (১৮০০—১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ) শক্তিমান গদ্য-রচয়িতা হিসেবে রাজা রামমোহন রায়, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নাম বিশেষভাবেই স্মরণীয়।

এই শতকেরই উত্তরার্ধে অনুভূতিমূলক আবিষ্ক্রিয়ার প্রকাশ দেখা গেল কাব্য-কবিতার অগ্রপ্রতায়। পর্বটির শক্তিমান স্রষ্টারূপে স্মরণীয় মধুসূদন দত্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহারীলাল চক্রবর্তী, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং নবীনচন্দ্র সেনের নাম। যুগ-সন্ধিক্ষণের কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তাঁর মধ্যে নবযুগচেতনার অরুণাভাস। রঙ্গলালের 'পদ্মিনী-উপাখ্যান' কাব্যের আবির্ভাব (১৮৫৮) এবং ঈশ্বর গুপ্তের তিরোভাব (১৮৫৯) স্মরণ করে ১৮৫৮-৫৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই আধুনিক কবিতার যুগ শুরু হয়েছিল বলা সঙ্গত।

বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে ঋতু পরিবর্তনের ইতিহাসটি যথেষ্ট আকর্ষণীয়। প্রথম দশ বছর মূলতঃ ভারতীয় পুরাণ আর ইতিহাসের উজ্জ্বল অধ্যায়গুলি থেকে সংগৃহীত বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত মহাকাব্য আর আখ্যায়িকাকাব্য সাহিত্যের ভাণ্ডার পূর্ণ করেছে। আবার এই সময়সীমারই মধ্যে গীতিকবিতার সূত্রপাত ঘটেছে। গোড়ার দিকে তার প্রকাশ কিছু পরিমাণে বাধাগ্রস্ত হলেও কবির নিজস্ব ভঙ্গীতে তাঁর মনের কথাও এই পর্বে বাঙালী পাঠক শুনতে শুরু করেছিল।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দটি বাংলা গীতিকবিতার ইতিহাসে বিশেষভাবেই স্মরণীয়। এই বছর বলদেব পালিতের 'কাব্যমালা' ও 'ললিত কবিতাবলী'; বিহারীলাল

চক্রবর্তীর 'বঙ্গসুন্দরী', 'নিসর্গ সন্দর্শন', 'বন্ধু-বিয়োগ' ও 'প্রেম প্রবাহিণী'; হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবিতাবলী ১ম খণ্ড'; রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'কাব্য কলাপ' এবং গোবিন্দচন্দ্র দাসের 'প্রসূন' প্রকাশিত হয়।

বাংলা গীতিকবিতার ধারা রবীন্দ্রনাথের অবদানে যথেষ্ট পরিমাণে সমৃদ্ধ হয়েছে এবং তিনিই এই শাখাটির যে শ্রেষ্ঠ কবি এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু তিনি যাঁকে এই শাখার পথিকৃৎ রূপে অভিহিত করেছিলেন, তাঁর কবিপ্রতিভা সম্পর্কে নানা প্রকার প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। তিনি সত্যিই পথিকৃৎ ছিলেন কিনা, তাঁর কাব্যগুলিতে শক্তির কতখানি পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁর বহু বক্তব্যের প্রকৃত অর্থ কী, বাংলা গীতিকবিতার ধারায় তাঁর কোন প্রভাব সত্যিই আছে কিনা—বিহারীলাল সম্পর্কে এমনি বহু প্রশ্ন আমাদের অনুসন্ধিৎসু করে তোলে।

গবেষণাপত্রের আকারে রচিত হলেও এই রচনার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী সম্পর্কে পূর্ণায়ত আলোচনা। কবির সমকালীন সমালোচক যাঁরা, তাঁদের রচনা যেমনি শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠ করেছি, তেমনি শ্রদ্ধার সঙ্গে জিজ্ঞাসু মন নিয়ে পাঠ করেছি আধুনিক কালের সমস্ত আলোচনা। কিন্তু আমার মূল্যায়ন থেকেছে একান্তভাবেই আপন শিক্ষা ও দীক্ষার দ্বারাই পরিচালিত। বলাবাহুল্য, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় প্রকার মানদণ্ডই আমি প্রয়োগ করবার চেষ্টা করেছি।

উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বা অবিমিশ্র নিন্দাবাদ যে যথার্থ সমালোচনা নয়, এ কথা আজ আর আলোচনার অপেক্ষা রাখেনা। সমস্ত প্রকার শিল্প-সাহিত্যের মূল্যায়ন যে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে হওয়া উচিত সে বিষয়েও আজ মতভেদ নেই। যে সব শিল্পীর শিল্পকৃতি নিয়ে বিতর্ক আছে, বিশেষ করে তাঁদের ক্ষেত্রে পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজন চিরদিনই থাকবে। কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী এই শ্রেণীর কবি। অতএব তাঁর ক্ষেত্রে সমালোচনার ধারা অব্যাহত থাকা অবশ্যই প্রয়োজন।

গবেষণামূলক এই কাজে আমাকে প্রবর্তিত করেছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অন্যতম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ, আর প্ররোচনা এসেছিল গ্রন্থগার-বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক শ্রীমান ডঃ পীযূষ-কান্তি মহাপাত্রের কাছ থেকে। আমার এই কাজটির (পিএইচ. ডি—১৯৭৪)

প্রতিটি স্তরে ডঃ ঘোষের পরামর্শ এবং সহায়তা পেয়েছিলাম বলেই আমার দায়িত্ব পালন সম্ভবপর হয়েছে। তাঁর কাছে আমার সারস্বত ঋণ অপরিমেয়।

কবি বিহারীলালের পৌত্র প্রভাতকুমার চক্রবর্তী ছিলেন ভারত-প্রশাসন-কৃত্যকের প্রবীণ কর্মী। গ্রন্থরচনার সময় তিনি উড়িষ্যাতেই কর্মরত ছিলেন। কবির বংশলতিকাটি প্রভাতকুমারের পত্নী শ্রদ্ধেয়া গীতা দেবীর সঞ্চয়ে ছিল। অগ্রজপ্রতিম প্রভাতকুমার ও শ্রদ্ধেয়া গীতা দেবীর কাছ থেকে ওঁদের কিছু পারিবারিক তথ্যের সন্ধান পেয়েছি। তাঁদের কাছে আমি নিঃসংশয়ে ঋণী। শ্রদ্ধেয় প্রভাতকুমারের জীবদ্দশায় এই গ্রন্থটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি বলে আমার যে ক্ষোভ রয়ে গেল, তা কোন দিনই দূর হবে না।

সমালোচনামূলক গ্রন্থপ্রকাশে প্রকাশকদের সংকোচ অপরিচিত লেখকের ক্ষেত্রে যে বহুল পরিমাণে বর্ধিত হয়, এ কথা সবারই জানা। এরই পটভূমিতে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দু চ্যাটার্জি যখন এই গ্রন্থটি প্রকাশের আগ্রহ জানান তখন স্বভাবতই আমি অভিভূত হয়েছি। এঁর কাছেও আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। প্রুফ দেখার ক্ষেত্রে যথাক্রমে ডঃ তুষারকান্তি মহাপাত্র, শ্রীআলোক দেব, এবং শ্রীতাপসকুমার ভট্টাচার্যের সহায়তা স্মরণীয়। নির্ঘণ্ট রচনা করে শ্রীমান তাপস বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। ডঃ ঘোষের প্রবর্তনা আর শ্রীমান পীযুষকান্তির প্ররোচনা কতখানি ফলপ্রসূ হয়েছে, তার বিচার কবি বিহারীলাল সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু পাঠক আর গবেষকরাই করবেন। কলকাতা থেকে দূরে থাকায় ছাপার ক্ষেত্রে কিছু ত্রুটি রয়ে গেল। বিহারীলালের কবি-প্রতিভার পূর্ণ পরিচয়দানের প্রথম প্রয়াস হিসাবে পাঠকেরা এ গ্রন্থকে গ্রহণ করলেই এ লেখার সার্থকতা।

রিজিওন্যাল কলেজ অব এডুকেশন
ভুবনেশ্বর। উড়িষ্যা।

বিষ্ণুপদ পাণ্ডা

১

প্রাক্‌ কথন

যে কোনো দেশের সাহিত্যসমালোচনার ধারাপথ অনুসরণ করলে প্রথমেই যে বিষয়টি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটি হ'ল যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনারীতির পরিবর্তন। বাংলাসাহিত্য সমালোচনার ইতিহাস এর ব্যতিক্রম নয়। প্রাক্‌ রবীন্দ্রযুগ থেকে শুরু করে রবীন্দ্রোত্তর যুগের সমালোচনা ধারার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, যার আদর্শ এককালে ছিল অলংকারশাস্ত্র, তার উপর পাশ্চাত্য সমালোচনার প্রভাব পড়তে শুরু করে ঊনবিংশ শতাব্দীতেই। শেষ পর্যন্ত সমালোচনার মানদণ্ড বিংশ শতাব্দীতে হয়ে দাঁড়াল সর্বাধুনিক পাশ্চাত্য আদর্শই। সমালোচনারীতির এই পরিবর্তন বিস্ময়-কর বা অযৌক্তিক নয়। সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য রসবোধে যে মৌলিক পার্থক্য নেই এ সত্য অনায়াসেই ধরা পড়ে।

কিন্তু বিস্ময়কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তখনই, যখন দেখি কোন বিশেষ কবি বা সাহিত্যিকের শিল্পকৃতির বিচারে ও মূল্যায়নে কলাবিদ-গণের মধ্যে মতবৈপরীত্য প্রকাশিত হচ্ছে। মূল্যায়ন পদ্ধতি বা সমালোচনাকে যেখানে মূলতঃ বিষয়াশ্রয়ী হতে হয়, সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গিকে করে তুলতে হয় নৈর্ব্যক্তিক, সেক্ষেত্রে মতবৈপরীত্য যথেষ্ট পরিমাণে কৌতূহলোদ্দীপক। শিল্প সাহিত্য সম্পর্কে পরিচয়-পরিধির বিস্তীর্ণতা, তীক্ষ্ণ মননশীলতা, রসবোধের প্রশ্নাতীত গভীরতা এবং মূল্যায়নের বহুমানিত প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও কোনো বিশেষ শিল্পকৃতিকে কেন্দ্র করে সমালোচকদের মধ্যে মতবিরোধ প্রকাশিত হলে সাধারণ পাঠকদের পক্ষে তা বিভ্রান্তিকর হয়ে উঠতে বাধ্য। এই বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির হাত থেকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্য নিয়ে মধ্যপন্থাবলম্বী যেসব

সমালোচনা প্রকাশিত হয় সেগুলির চাইতে অবশ্য বিপরীতমুখী মতবাদের সার্থকতা অনেক বেশী। এগুলির সংস্পর্শে এসে মন যুক্তিবাদী আর সতর্ক হয়ে ওঠে, ধীরে ধীরে উদ্দিষ্ট শিল্পকর্মকে অবলম্বন করে উপলব্ধি সত্যান্বিত হয়ে ওঠে।

বাংলা সাহিত্যের যে অল্পকয়েকজন কবি সাহিত্যিককে কেন্দ্র করে সমালোচকরা সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী মতবাদ প্রকাশ করেছেন তাঁদের শিরোমণি বিহারীলাল চক্রবর্তী। সাহিত্যসমালোচক ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, শশিভূষণ দাশগুপ্ত প্রভৃতি সমালোচকেরা এই কবি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। পরবর্তীকালে আরও কোনো কোনো সমালোচকও এঁর কাব্যধারা নিয়ে আলোচনা করেছেন; কিন্তু সামগ্রিকভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে বিহারীলাল সম্পর্কে প্রশংসা নিন্দায় পরিণত হয়েছে। আবার কোনো সমালোচক একে 'নৈসর্গিক নিয়ম' বলে ঘোষণা করে এই পরিবর্তিত ধারণাকে সহ্য করে নেবার উপদেশ দিয়েছেন।

বাংলা কাব্য সাহিত্যকে অবলম্বন করে উনবিংশ শতাব্দীতে যা কিছু সমালোচনা লিখিত হয়েছে তার বড় অংশটি ভাবপ্রবণতার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। কবি বা সাহিত্যিক সম্পর্কে পূর্বপ্রতিষ্ঠিত একটি ধারণাকে আশ্রয় করেই, শুধু মাত্র তারই আলোকে তাঁর সাহিত্যকৃতিকে দেখবার চেষ্টা এই ধরনের অধিকাংশ সমালোচনায় দেখা যায়। পরবর্তী-কালে পাশ্চাত্য সমালোচনা-দর্শনের সংস্পর্শে এসে বাংলা সমালো-চনার ধারা নতুন মত ও পথের সন্ধান পেয়েছে, বহুল পরিমাণে তত্ত্বাশ্রয়ী আর নৈর্ব্যক্তিক হয়ে উঠেছে। তাই সাম্প্রতিককালের এইসব সমা-লোচনাকে মূল্যহীন বা লঘু বলে অগ্রাহ্য করার অবকাশ অল্প। আবার উনবিংশ শতাব্দীর সমস্ত সমালোচনাকেও ভাবপ্রবণ বলে বাতিল করে দেবার অবকাশ অল্প। বলাবাহুল্য, মত-পার্থক্যের অবসর সর্বক্ষেত্রেই আছে এবং তা থাকাও স্বাভাবিক। কিন্তু এই সব সমালোচনার কোনোটিই সর্বতোভাবে বর্জনীয় নয় এবং তার চাইতেও বড় কথা,

এগুলির মধ্যে কিছু কিছু সাত্ত্বিক প্রশ্নও উত্থাপিত হয়েছে যার মীমাংসায় আসা আশু প্রয়োজন।

বাংলা কাব্যধারার আলোচনায় বিহারীলালের উল্লেখ যে অপরিহার্য এ ধারণা আমাদের সকলেরই আছে; কিন্তু এই উল্লেখ প্রায় ঐতিহাসিকতা রক্ষার উদ্দেশ্যেই আমরা করে থাকি। বিহারীলালের রচনা সৃজনধর্মী কিনা, রঙ্গলাল ও মধুসূদনের পরবর্তীকালে তাঁর রচনা পূর্বসূরীদেরই অনুকরণাত্মক, নাকি অন্য কোনো পথসন্ধান বিহারীলাল দিতে পেরেছেন, এ সম্বন্ধে স্বচ্ছধারণা আজও গড়ে ওঠেনি। বিহারীলালের সমকালীন কয়েকজন কবি এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর প্রভাব স্বীকার করেছেন, তা নিতান্তই সৌজন্যমূলক কিনা তারও বিচার প্রয়োজন।

শশাঙ্কমোহন সেন আধুনিক বাংলার কাব্যসাহিত্যাদর্শকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। সে তিনটি বিভাগ হ'ল—বস্তুগত, তত্ত্বগত আর ভাবগত।[১] দেখা দরকার বিহারীলালের আদর্শ কোন শ্রেণীভুক্ত। তাছাড়া বিহারীলালের নিবিড় আত্মমগ্নতার কারণ কী, তাঁর প্রেরণার উৎস কোথায় এবং তাঁর কাব্যধারার বিরুদ্ধে যে অস্পষ্টতার অভিযোগ আছে তা কতখানি সমর্থনযোগ্য, এ সব কিছুরই আজ যথাযথ মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন।

আধুনিকতা সংশয়াতীতভাবে কালাশ্রয়ী নয়। তার উদ্ভব আর বিকাশ শিল্পীমানসে। আমরা সমাজের প্রভাব অস্বীকার করি না, করা সম্ভব নয়। কিন্তু সেইটিই সব নয়। স্রষ্টা সমকালীন সমাজচেতনাকে কতখানি আত্মস্থ করেছেন, জগৎ ও জীবনের মূল্যায়নে ঐতিহ্যাশ্রয়ী চিন্তাধারার কতখানি অনুসরণ করেছেন, কি তারই পটভূমিতে বর্তমানকে আশ্রয় করে দূর ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে আপন অন্তরের মধ্যে সত্যোপলব্ধির সাধনায় কতখানি সিদ্ধিলাভ করেছেন, এর উপর সাহিত্যের আধুনিকতা বহুলাংশে নির্ভরশীল।

এই আধুনিকতাকে বিশ্লেষণ করে আমরা তার যে লক্ষণগুলিকে

প্রধান বলে মেনে চলি, তার একাধিক বিহারীলালেই প্রাধান্য পেয়েছে কিনা বা তিনিই সেগুলির প্রবর্তক কিনা তার বিচার হওয়াও প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে সেই ক্ষেত্রেই হবে বিহারীলালের মৌলিকতার বিচার।

সারদামঙ্গল কাব্য সম্পর্কে স্বীয় চিন্তাধারার উল্লেখ করে বিহারীলাল রংপুর নিবাসী অনাথবন্ধু রায়কে যে পত্র[২] লেখেন সেখানে চিন্তাধারার বিশ্লেষণও নাকি সুস্পষ্ট নয়।[৩] সেখানে 'গুপ্ত অধ্যায়ের যে সব রহস্য'[৪] নিহিত আছে তার উদ্ঘাটনও প্রয়োজন বলে অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী উল্লেখ করেছেন।

এ পর্যন্ত আমরা বিহারীলালের কবিকৃতির প্রসঙ্গ বা ভাববস্তু সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের সমালোচনার উল্লেখ করেছি। কবির অনুসৃত প্রযুক্তি সম্পর্কেও কিন্তু প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। 'সারদামঙ্গল' এবং 'সাধের আসন' এই দুটি কাব্যগ্রন্থের যে সর্গ-বিভক্তি—তা নিতান্তই অর্থহীন এবং সর্গগুলির মধ্যে যোগসূত্র দুনিরীক্ষ্য—রবীন্দ্রনাথও এই মত প্রকাশ করেছেন, প্রকাশ করেছেন অধ্যাপক তারাপদ মুখোপাধ্যায় এবং প্রমথনাথ বিশী। অধ্যাপক বিশী আরও এগিয়ে গিয়ে বলেছেন যে, এই সর্গসজ্জা মূলত মধুসূদনেরই প্রভাব। কাব্যগ্রন্থ দুটির বক্তব্য, অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়-এর মতে প্রথম সর্গের মধ্যেই সমাপ্ত।[৫] অন্যান্য সর্গগুলিতে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন বক্তব্য স্থান পেয়েছে মাত্র। অধ্যাপক বিশী বলেছেন, সমকালীন বাংলাকাব্যে সর্গসজ্জা নতুন ছিল না, কিন্তু তাঁর মতে 'ঐ সর্গসজ্জাটি বাদ দিলে কবির মৌলিকতার মস্ত একটি স্তম্ভ ধসে পড়ে যায়'। এই মত কতখানি যুক্তিসহ তার মূল্যায়নও প্রয়োজন। অধ্যাপক বিশী বিহারীলালের সঙ্গীতগুলি সম্পর্কেও ওই একই যুক্তি উপস্থিত করেছেন, কিন্তু একথাও বলেছেন যে, কবির 'মৌলিকতার অনেকটা দাবীই অমূলক' হয়ে দাঁড়ালেও 'সবটা নয়'। তিনি আশা প্রকাশ করেছেন[৬] যে, কবির মৌলিকতার পরিমাণ নির্ধারণের ওপরেই তাঁর 'শেষ ও সত্তাপ্রতিষ্ঠা' নির্ভর করবে। অতএব এক্ষেত্রেও আমাদের কিছু করণীয় আছে।

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে বাংলা কাব্যধারার আলোচনায় বিহারীলালের উল্লেখ অনিবার্যভাবেই করেছেন সমালোচক আর সাহিত্যের ইতিহাস প্রণেতারা। এই উল্লেখ অনেকখানি ঐতিহাসিকতা রক্ষার উদ্দেশ্যে হলেও কেউ কেউ এমন কিছু মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন যা নিয়ে চিন্তা করার অবকাশ আছে।

আচার্য সুকুমার সেন বিহারীলাল প্রসঙ্গে আলোচনার শুরুতে বলেছেন যে, তাঁর 'কবিত্বে পোষাকের সজ্জা নাই, চিন্তার প্রকাশ আছে। তাই, তাঁহার কাব্যসৃষ্টি স্বতঃস্ফূর্ত, অন্তরঙ্গ এবং তাঁহার জীবন-লীলার অঙ্গীভূত।'[৭] কিন্তু ইনি 'সারদামঙ্গল' সম্পর্কে বলেছেন, 'বিহারীলালের শ্রেষ্ঠ কাব্য সারদামঙ্গল।.........এখানে কবিকল্পনা যেমন বাষ্পোদ্বেল ও পরিবর্তনশীল কাব্যকল্পনাও তেমনি প্রায় বস্তুহীন ও উদ্বায়ু।...কাব্যের আখ্যানবস্তু বলিতে বিশেষ কিছুই নাই।'[৮] আচার্য শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'সারদামঙ্গল' এবং 'সাধের আসন' প্রসঙ্গে বলেছেন 'এরূপ বিরাট মহিমান্বিত কল্পনা, এরূপ অন্তর্গূঢ় রহস্যময় ভাবব্যঞ্জনা, বোধাতীত ধ্যানতন্ময়তার এরূপ আত্মকেন্দ্রিক প্রসার আর কোন গীতিকাব্যের বিষয় হইয়াছে কিনা সন্দেহ।'[৯] বিহারীলালের কাব্যধারার বিভিন্ন দিক আলোচনার পর উপসংহার অংশে তিনি বলেছেন, 'তিনি যে পরিমাণে ভাবুক ছিলেন সে পরিমাণে শিল্পী ছিলেন না।'[১০]

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বিহারীলাল সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'বিহারীলাল যত বড় ঋষি ছিলেন তত বড় কবি ছিলেন না বটে কিন্তু এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা উচিত যে, তাঁহার কাব্যের যত গভীর ভাবধারা তাহা তাঁহার বুদ্ধির কৃপাদত্ত সামগ্রী নহে, হৃদয়ের প্রীতিময় উপহার।'[১১] ডঃ দাশগুপ্ত তাঁর আলোচনার মধ্যে 'অন্তঃকরণ ও বহিঃকরণ' সম্পর্কিত দ্বৈতবাদ ও 'অলৌকিক ও লৌকিকের নিরন্তর মিশ্রণ'[১২] সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছেন 'এগুলিকে কেন্দ্র করেই বিহারীলালের কাব্যধারার ত্রুটি ধরা পড়ে।' ডঃ দাশ-

গুপ্তের মতে ভাবাবেগের অকৃত্রিমতা থাকা সত্বেও নিপুণ প্রকাশভঙ্গীর অভাবে রচনা কাব্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। তাছাড়া তাঁর মতে, কাব্যের জগৎ অলৌকিক বা লোকোত্তর ভাবের জগৎ।[১৩] অতএব সেক্ষেত্রে লৌকিক ভাব ও ভাষার মিশ্রণ রসভঙ্গের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।)

বলা বাহুল্য এই সব সর্বজনশ্রদ্ধেয় সমালোচকদের মতবাদগুলিকে আশ্রয় করে সত্যানুসন্ধানের সুযোগ অবশ্যই গ্রহণ করা যায় এবং যে কোনো শিল্পসৃষ্টিকে নিয়ে মূল্যায়নের এই প্রকার সুযোগ সব সময় থাকেই, আর তা থাকা উচিতও। চিন্তার জগতেও নতুন নতুন ভূসংস্থান জেগে উঠছে আর তাদের আশ্রয়ে শিল্পমূল্য নিরূপণের নতুন মানদণ্ডও রচিত হচ্ছে। বিহারীলাল সম্পর্কিত যতকিছু সমালোচনা এযাবৎ আমাদের হস্তগত হয়েছে সেগুলির রচয়িতাদের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাবান। তবুও গতানুগতিক চিন্তাধারার প্রভাব থেকে মুক্ত, যুক্তিনিষ্ঠ আর আত্মনির্ভরশীল বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের মানসিকতাকে মূলধন করে বিহারীলালের কাব্যকুঞ্জে প্রবেশের বাসনা আমাদের। আমরা যতদূর সম্ভব নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তাঁর রচনাগুলির মূল্যায়নের চেষ্টা করব, এককথায় এইটিই আমাদের প্রধান কর্তব্য। এর পরের যে দায়িত্ব আমরা স্বীকার করে নিয়েছি তা হ'ল বিহারীলালের প্রভাব-প্রসঙ্গটিকে বিচার করা। অবশ্য এই প্রসঙ্গটি পূর্বোল্লিখিত বিষয়ের সঙ্গেই সংযুক্ত। বিহারীলালের রচনায় যদি কাব্যমূল্য স্বীকৃত হয় তাহলে তার প্রভাবও স্বাভাবিকভাবেই স্বীকৃত হয়। রসোত্তীর্ণ কাব্যসাহিত্য পরবর্তী রচয়িতাদের যে কিয়ৎপরিমাণে প্রভাবিত করে, এ মত বহুমানিত। এতে উত্তরসূরীদের অসম্মান যে ঘটে না এ সত্যটিও সর্বস্বীকৃত। বিহারীলালের প্রভাবপ্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে আমরা শুধু তাঁদেরই কথা ভাবব না,' যাঁরা তাঁর প্রভাবকে উচ্চকণ্ঠে স্বীকার করে নিয়েছেন ; আমরা দেখবার চেষ্টা করব বিহারীলালের প্রভাব ব্যাপকতর কিনা এবং তা হয়ে থাকলে তার স্বরূপটিই বা কি।

একটা কথার উল্লেখ এখানে নিতান্তই প্রয়োজন। উত্তরসূরীদের প্রভাব-প্রসঙ্গটি অনুকরণাত্মক রূপ নিয়েছে কিনা তা দেখা আমাদের মোটেই উদ্দেশ্য নয়। আমরা যদি দেখি যে বিহারীলালের শিল্পকর্মের মধ্যে যেসব দোষ ত্রুটি থেকে গিয়েছিল সেগুলির দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁর উত্তরসূরীরা নিজেদের সতর্ক রাখতে পেরেছেন, তাহলে তাকেও সংশোধনাত্মক প্রভাব বলে আমরা গ্রহণ করব। প্রভাব-প্রসঙ্গ বিবেচনায় এ মতটিও অশ্রদ্ধেয় নয় নিশ্চয়ই। মূলতঃ আমরা দেখব বাংলা কাব্যের যে ঐতিহ্যধারা বিহারীলাল পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে এসেছিল, তাতে এই কবি কতখানি গতিসঞ্চার করতে পেরেছেন। সেই ঐতিহ্যাশ্রয়ী ধারায় এই কবি কোন নতুন সুর সংযোজন করেছেন কিনা তার সন্ধানও নেওয়া হবে। কিন্তু এ সবই হবে তাঁর কবিসত্তার মূল্যায়ন।

উল্লেখপঞ্জী

১. শশাঙ্কমোহন সেন : বঙ্গবাণী ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২৮
২. সাহিত্য সাধক চরিতমালা, সম্পাদক : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড, ৫ম সংস্করণ, বিহারীলাল পৃঃ ২৯
৩. বিহারীলাল রচনাসম্ভার, সম্পাদক : প্রমথনাথ বিশী, ১ম সংস্করণ, সম্পাদকীয় পৃঃ ৶.
৪. বিহারীলাল রচনাসম্ভার, সম্পাদক : প্রমথনাথ বিশী, ১ম সংস্করণ, সম্পাদকীয় পৃঃ ৶.
৫. তারাপদ মুখোপাধ্যায় : আধুনিক বাংলা কাব্য, ১ম পর্ব, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ১৫৩
৬. বিহারীলাল রচনাসম্ভার, সম্পাদক : প্রমথনাথ বিশী, ১ম সংস্করণ, সম্পাদকীয় পৃঃ ৷৴.
৭. সুকুমার সেন : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ৫ম সংস্করণ, পৃঃ ৪৩৪
৮. সুকুমার সেন : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ৫ম সংস্করণ, পৃঃ ৪৪৩

৯. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা, ২য় খণ্ড, ৩য় সংস্করণ, আধুনিক যুগ পৃঃ ১০৫
১০. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা, ২য় খণ্ড, ৩য় সংস্করণ, আধুনিক যুগ পৃঃ ১০৬
১১. শশিভূষণ দাশগুপ্ত : বাংলা সাহিত্যের নবযুগ, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পৃঃ ২৭২
১২. শশিভূষণ দাশগুপ্ত : বাংলা সাহিত্যের নবযুগ, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পৃঃ ২৭৭
১৩. শশিভূষণ দাশগুপ্ত : বাংলা সাহিত্যের নবযুগ, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পৃঃ ২৭৮

২

কবি ও কাব্য

(ক) পরিমাণ প্রসঙ্গ

বিহারীলালের স্থান নির্ণয়ের সময় এসেছে—'তিনি নব্য রোম্যান্টিক কবিগণের অগ্রণী আর বাঙালী minor কবিগণের মধ্যে] শ্রেষ্ঠ।'[১] এই মন্তব্যের মধ্যে আমাদের অন্যতন কর্তব্যের ইঙ্গিত আছে। অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী সাধারণভাবে কবির জন্য যে স্থান নির্দেশ করে দিয়েছেন তার পুনর্মূল্যায়ন হওয়া উচিত। বলা বাহুল্য, এ কথা সব কবি সাহিত্যিকের সৃষ্টি সম্পর্কেই প্রযোজ্য। এই পুনর্মূল্যায়নের মধ্য দিয়েই কাব্য বিচারের নতুন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে, আর সেই সঙ্গে কবি ও কাব্য সম্পর্কে পাঠকের ধারণা নতুন দিগন্তের সন্ধান পায়। স্মরণ করা যেতে পারে সেক্সপীয়রের কথা। গত কয়েক শতাব্দী ধরে প্রতিভাধর সমালোচকেরা তাঁর অবদানের আলোচনায় পুস্তকের পর পুস্তক রচনা করে চলেছেন। শুধু এই সব রচনা নিয়েই একটি ছোট পাঠাগার গড়ে তোলা সম্ভব। তবুও অতি সাম্প্রতিককালে কোনো নতুন সমালোচক সেক্সপীয়র সম্পর্কে কোনো পুস্তক রচনা করলে ইংরেজীসাহিত্যে অনুরাগী পাঠকসম্প্রদায় তা সাদরে গ্রহণ করেন। ঠিক অতখানি এখনো না হয়ে উঠলেও, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে রচিত পুস্তকের সংখ্যা কম নয় এবং তা ক্রমবর্ধমান।

আমাদের মূল বক্তব্য এই যে, সমালোচনার ধারা যদি অব্যাহত থাকে, পাঠকের রসবোধ মার্জিত হয় আর ছোটখাট ভ্রান্তিরও নিরসন ঘটে। মাঝে মাঝে যে কোনো কবির কাব্য নিয়ে যদি সমালোচনা করা হয়, তাহলে সার্থক সমালোচনাগুলিও সাহিত্যধারার অঙ্গীভূত হতে পারে। সমালোচনা যে সাহিত্যের শ্রেণীতে উন্নত হতে পারে তার প্রমাণ পর্যাপ্ত না হলেও, কিছু কিছু পাওয়া যায়।

সাম্প্রতিক কালে টি. এস. এলিয়ট-এর সমালোচনারীতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে শ্রদ্ধা অর্জন করেছে। এলিয়টের পাঠকমাত্রেই জানেন তাঁর তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী শক্তি আর সুমিত ভাষণ প্রায় সমকক্ষহীন।

পুরোনো কাব্যগুলির সমালোচনা মাঝে মাঝেই যে হওয়া প্রয়োজন, এ মত তিনিও পোষণ করেন। তিনি মনে করেন যে সমালোচকদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে নানাধরনের ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে যেতেই পারে। এ ক্ষেত্রে একাধিক সমালোচক একই কবির কাব্য নিয়ে আলোচনা করলে ঐ সব ত্রুটি বিচ্যুতির সংশোধন সম্ভবপর হয়ে ওঠে। তাঁর মতে "the longer the sequence of critics we have, the greater amount of correction is possible."[৩]

সমালোচক শিল্প-ব্যাখ্যাতা। অতএব তাঁর নৈপুণ্য সর্বসাধারণের উপভোগের বস্তু হয়ে উঠবে, এ কল্পনা করা অন্যায় নয়। এই কল্পনার মধ্যে একটি আশঙ্কা সংগুপ্ত থাকে। সেটি হ'ল এই যে, কাব্যবিচারের সময় কাব্যপাঠক অবহেলিত হবেন না। কাব্যপাঠক আর কবি, এই দুজনের প্রতি শ্রদ্ধাবান থেকেই প্রকৃত সমালোচক তাঁর কাজে ব্রতী হন। এর ফলে সমালোচকের রসোপভোগ কাব্যপাঠকের অন্তরে সংক্রামিত হয়। সমালোচনাকে যাচাই করে নেবার কষ্টিপাথর এইটি. সংক্রামণশক্তির সাফল্যেই সমালোচনার সাফল্য।

অধ্যাপক বিশী বিহারীলালকে Minor (অপ্রধান) কবি হিসেবে চিহ্নিত করে তারপর সেই শ্রেণীতে তাঁর জন্য একটি স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। Major (প্রধান) আর Minor poet হিসেবে কবিদের পৃথকীকরণ খুব সহজসাধ্য নয়। বাঙ্গালী কবিদের এইভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। ইংরেজী সাহিত্যের সমালোচনায় এ শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং এলিয়ট এই বিশেষ অভিধাটি সম্পর্কে যা বলেছেন তা অত্যন্ত মূল্যবান। এ নিয়ে আমরা পরে আবার কিছু আলোচনা করব; তবু সংক্ষেপে বলি যে,

তিনি বলেছেন কাব্যসৃষ্টির পরিমাণ বিচারে আমরা কোনো কোনো কবিকে Minor বলতে পারি বটে, কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে, এই বিশেষণটি অবজ্ঞা-সূচক নয়। এলিয়ট সুনির্দিষ্টভাবেই Major poets এর গুণাবলী নির্দেশ করেছেন। আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয় সেই গুণাবলী।

কবি টেনিসনের 'ইন্ মেমোরিয়ম্' আলোচনা প্রসঙ্গে এলিয়ট বলেছেন, "He has three qualities which are seldom found together except in the greatest poets: abundance, variety and complete competence."[৪]

যাঁর কাব্যসৃষ্টি প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্যে উজ্জ্বল এবং যাঁর বক্তব্য প্রত্যয়ান্বিত, তিনি নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ কবি। প্রসঙ্গত একথা বলতে কিন্তু তিনি ভোলেননি যে এই তিনটি গুণের একত্র সমাবেশ দুর্লভ।

কবি বিহারীলালের কাব্যগুলির পুনর্মূল্যায়ন করতে গিয়ে আমরা মানদণ্ড হিসেবে এলিয়টের মন্তব্যটিকে ব্যবহার করব। একটু স্থিরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে এগুলির মধ্যেই প্রাচ্য আলংকারিক কাব্যবিচার পদ্ধতি অঙ্গীভূত। এলিয়ট যেখানে বৈচিত্র্য বলেছেন, শুধুমাত্র বিষয়-বৈচিত্র্য নয়, আঙ্গিকের দিকটিও সেখানে তাঁর উদ্দিষ্ট। কবি শুধু বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীরই পরিচয় দেন না, নানা কথা নানা ভাবেও বলেন তিনি। এর ফলে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধির স্বরূপটি যেমন ধরা পড়ে, তেমনি উপস্থাপন-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে ধরা পড়ে তাঁর আন্তরিকতা। বাচ্যকে ছাড়িয়ে বাচ্যাতীতকে কতখানি অভিব্যঞ্জিত করতে পেরেছে, কাব্যের মূল্য সেখানেও স্থিরীকৃত হয়। অতএব এলিয়ট যে পথের নির্দেশ দিয়েছেন সে পথে অগ্রসর হওয়া সব দিক থেকেই সঙ্গত।

বিহারীলালের কবিজীবনের দৈর্ঘ্য পঁয়ত্রিশ বছর। কাব্যরচনার কালবিচারে এটি সাধারণভাবে বহু বাঙালী কবি ও সাহিত্যিকের সৃজনশীল জীবনের চাইতে দীর্ঘতর, কিন্তু সে তুলনায় বিহারীলালের

রচনা সুপ্রচুর নয়। অবশ্য আমাদের দৃষ্টি তাঁর কাব্যধারাতেই নিবদ্ধ, গদ্যরচনায় নয়। তবু একথা বলতেই হয়, Minor বা দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিদের মত তাঁর কবিতা, পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায় বা কবিতাসংগ্রহের (anthology) মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। একাধিক কাব্যগ্রন্থ কবির জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং তাঁর মৃত্যুর পরও কিছু রচনা তাঁর পুত্র অবিনাশ চক্রবর্তী প্রকাশ করেছেন। আপাতত কবির রচনা-পরিমাণ সম্পর্কে আমাদের একটি সুষ্ঠু ধারণা তৈরী হওয়া প্রয়োজন।

পরিমাণ প্রসঙ্গটির বিচার নীরস সংখ্যাতত্ত্বে পরিণত হওয়াই স্বাভাবিক। তবুও এর প্রয়োজন আছে। কবি তাঁর 'সোনার তরী'তে যেটুকু ফসল তুলে দিয়েছেন তার নিরিখ ধার্য করতে হলে মোট ওজনটুকু অবশ্যই আমাদের জানা দরকার।

কবির রচনা একত্রিত করে প্রথমে প্রকাশ করেন কবির জ্যেষ্ঠপুত্র অবিনাশ চক্রবর্তী। এই গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড যথাক্রমে ১৩০৭ সালের বৈশাখ ও ১৩২০ সালের শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবির 'কাব্য সংগ্রহ' প্রকাশ করেন ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে। ১৩৬৮ সালে অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর সম্পাদনায়, 'বিহারীলাল রচনা সম্ভার' প্রকাশিত হয়েছে। 'স্বপ্নদর্শন' শীর্ষক গদ্য রচনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত গ্রন্থাবলীতে স্থান পেয়েছে। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, কোন গ্রন্থাবলীতেই কবির রচনাগুলিকে কালানুক্রমে গ্রথিত করা হয় নি। এর ফলে এই সংকলন গ্রন্থগুলি অনুসরণ করে কবিস্বরূপের বিবর্তনধারার পরিচয়লাভ অসম্ভব হয়ে পড়ে। বর্তমান আলোচনায় কাব্যগুলিকে কালানুক্রমে গ্রহণ করা হবে।

কালানুক্রমিক বলতে প্রকাশকালটিই উদ্দিষ্ট নয়। আমাদের লক্ষ্য কাব্যরচনার কাল। কিন্তু এই ক্ষেত্রে যে সমস্যাটি থেকে গিয়েছে তা হ'ল এই যে, সব কটি কাব্যরচনার কাল সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই। কোনো কোনো কাব্যগ্রন্থের মধ্যেই, কোথাও বা দু'একটি

চিঠিপত্রে কবির কিছু রচনার কাল সম্পর্কে উল্লেখ আছে। এভাবে যেগুলির নির্ভরযোগ্য উল্লেখ পাওয়া গিয়েছে সেগুলি গৃহীত হয়েছে, আর যেগুলির রচনাকাল পাওয়া যায় নি, সেগুলির ক্ষেত্রে প্রকাশকালটিকেই রচনাকালের সমান্তরাল রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে। 'স্বপ্নদর্শন' গদ্যরচনা। বিশ্ববিদ্যালয়প্রকাশিত গ্রন্থাবলীতে এটি প্রকাশিত হয়েছে বলেই এটিও আলোচনার অঙ্গীভূত। যে সব ক্ষেত্রে রচনাকাল পাওয়া গিয়েছে সে সব ক্ষেত্রে সেটি বন্ধনীর মধ্যে উল্লিখিত হবে। কালানুক্রমিক রচনাতালিকাটি নিম্নরূপ—

(১) স্বপ্ন দর্শন—গদ্য রচনা (১৮৫৮) এটি প্রকাশিত হয় রচনারই বছর। সমগ্র রচনাটি ১৮টি দীর্ঘ অনুচ্ছেদে বিভক্ত। বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত কাব্যসংগ্রহে পৃষ্ঠা সংখ্যা তেরো।

(২) বন্ধু বিয়োগ—চার সর্গে বিভক্ত একটি কাব্য (১৮৫৯), এটি প্রকাশিত হয় ১৮৭০ সালে। একটি সঙ্গীত সহ চারটি সর্গের পঙ্‌ক্তি সংখ্যা মোট ১০৯০। বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত কাব্যসংগ্রহে পৃষ্ঠা সংখ্যা চব্বিশ।

(৩) প্রেম প্রবাহিণী—পাঁচ সর্গে বিভক্ত ১১২৮ পঙ্‌ক্তির একটি কাব্য (১৮৬০), প্রকাশিত হয় ১৮৭০ সালে। কাব্যসংগ্রহে পৃষ্ঠা সংখ্যা মোট ছাব্বিশ।

(৪) সঙ্গীত শতক—সমাপ্তিসূচক সঙ্গীতটিকে নিয়ে মোট ১০১টি সঙ্গীতের সংকলন (১৮৬২), প্রকাশিত হয় ১৮৬২ সালে। এর দুটি সঙ্গীতের পঙ্‌ক্তি-সংখ্যা ৬৮ ও ৮০। এ ছাড়া অনেকগুলি দীর্ঘায়তন সঙ্গীত এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত। কাব্যসংগ্রহের পৃষ্ঠা সংখ্যা চল্লিশ।

(৫) নিসর্গ সন্দর্শন—সাতসর্গে বিভক্ত একটি দীর্ঘ কাব্য। এর তৃতীয় ও চতুর্থ সর্গ রচিত হয় ১৮৬৩ সালে, প্রথম, দ্বিতীয় সর্গ ১৮৬৫ সালে ও ৫ম সর্গ রচিত হয় ১৮৬৭ সালে।

এই কাব্যগ্রন্থের ১ম, ২য়, ৩য় ও ৫ম সর্গ প্রকাশিত হয় ১৮৬৯

সালে ও ৪র্থ সর্গটি সহ সমগ্র কাব্যটি প্রকাশিত হয় ১৮৭০ সালে। কাব্যসংগ্রহে মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা আটাশ।

(৬) বঙ্গসুন্দরী—দশ সর্গে বিভক্ত কাব্য। এটির প্রথম রচনা কাল ও প্রকাশ কাল ১৮৬৭-৬৯। এটিও দীর্ঘকাব্য। এবং কাব্য-সংগ্রহে পৃষ্ঠা সংখ্যা চুয়ান্ন। দ্বিতীয়বার এটি প্রকাশিত হয় ১৮৮০ সালে।

(৭) সারদামঙ্গল—পাঁচ সর্গে বিভক্ত দীর্ঘ কাব্য। রচনারম্ভ ১৮৭০ সালে ও প্রথম প্রকাশ ১৮৭৪ সালে। সম্পূর্ণ রচনার প্রকাশ ১৮৭৯ সালে। কাব্যসংগ্রহে পৃষ্ঠা সংখ্যা চৌত্রিশ।

(৮) মায়া দেবী—একটি সঙ্গীত ও একটি দীর্ঘ কাবিতার সংকলন। প্রকাশ কাল ১৮৮২। কাব্যসংগ্রহে পৃষ্ঠা সংখ্যা নয়।

(৯) শরৎকাল—ছুটি সঙ্গীত ও চারটি কবিতার সংকলন। 'প্রভাত, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যা সঙ্গীত' প্রকাশিত হয় ১৮০২ সালে, 'নিশীথ ও নিশান্ত' সঙ্গীত প্রকাশিত হয় ১৮৯২ সালে। কাব্যসংগ্রহে পৃষ্ঠাসংখ্যা তেরো।

(১০) ধূমকেতু—১৪৫ পঙ্ক্তির একটি কবিতা (১৮৮২), প্রকাশিত হয় ১৮৯৯ সালে। পৃষ্ঠা সংখ্যা ছয়।

(১১) দেবরাণী—একটি সঙ্গীত ও একটি কবিতার সংকলন, প্রকাশিত হয় ১৮৮২ সলে। গ্রন্থাবলীতে পৃষ্ঠা সংখ্যা ছয়।

(১২) বাউল বিংশতি—একটি প্রস্তাবনা সহ কুড়িটি সঙ্গীতের সংকলন। এটি আংশিকভাবে প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ সালে। পৃষ্ঠা সংখ্যা আটাশ।

(১৩) নিসর্গ সঙ্গীত—দশটি সঙ্গীত ও ছয়টি কবিতার সংকলন, প্রকাশিত হয় ১৮৮১ সালে। ('গোধূলি' কাবতাটি ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কাব্যসংগ্রহে এগুলি কবিতা ও সঙ্গীত নামক অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।) মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা সাত।

(১৪) সাধের আসন—কয়েকটি কবিতা ও গীত সহ দশটি সর্গে

বিভক্ত একটি কাব্য (১৮৮৮-৮৯)। প্রথম চারটি সর্গ রচনার কালেই প্রকাশিত হয়। কবির বক্তব্য অনুযায়ী এর প্রথম তিনটি শ্লোক ১৮৮৪ সালের পূর্বেই লিখিত। সেই শ্লোকগুলি সহ প্রথম চারটি সর্গ কবির জীবিতাবস্থায় প্রকাশিত হয়। সম্পূর্ণ কাব্য প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পর। এটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ কাব্য এবং গ্রন্থাবলীতে মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা পঁচল্লিশ।

কবির রচনাগুলি প্রধানত যে সব পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলির মধ্যে পূর্ণিমা, সাহিত্য, সংক্রান্তি, অবোধবন্ধু, প্রয়াস, জন্মভূমি, আর্য দর্শন, ভারতী, কল্পনা, মালঞ্চ, প্রদীপ, বান্ধব, চিকিৎসাতত্ত্ব বিজ্ঞান ও সমীরণ, সোমপ্রকাশ, পুণ্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এগুলির মধ্যে পূর্ণিমা, সাহিত্য, সংক্রান্তি ও অবোধবন্ধু পত্রিকার সঙ্গে কবি সম্পাদনাসূত্রে জড়িত ছিলেন। উপরি উক্ত পত্রিকাগুলির বহু সংখ্যাই আজ দুর্লভ।

'সাহিত্য সাধক চরিতমালা' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে 'বিহারীলাল' শীর্ষক অধ্যায়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কতকগুলি পত্র [৫] সংকলিত করেছেন। এর মধ্যে কবিবন্ধু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত দুটি পত্রকবিতাও আছে।

আমাদের আলোচনা বিহারীলালের কবিস্বরূপ নিয়ে, তাই আমাদের আলোচনায় সেগুলির প্রাসঙ্গিক উল্লেখ আছে।

রচনাপ্রাচুর্য কবির শক্তিমত্তার অন্যতম লক্ষণ একথা আমরা স্বীকার করে নিয়েই বিহারীলালের রচনাপরিমাণ বিচার করেছি। কবি রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে এই পরিমাণ রচনা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অন্য যে কোন প্রথম শ্রেণীর কবির অবদানের তুল্য।

বাংলা সাহিত্যের প্রকৃতি বিচারে ১৮৫৮ থেকে ১৮৯৬ পর্যন্ত আটত্রিশ বছরের এই কাল পরিমাণকে কেউ কেউ 'বীরযুগ' নামে চিহ্নিত করেছেন [৬]। মধ্য ও আধুনিক যুগসন্ধিক্ষণের কবি ঈশ্বর গুপ্ত লোকান্তরিত হন ১৮৫৯ সালে, আর ঠিক তার আগের বছর রঙ্গলাল

বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'পদ্মিনী উপাখ্যান' আর বিহারীলাল চক্রবর্তীর গদ্য রচনা 'স্বপ্ন দর্শন' প্রকাশিত হয়।

'বীরযুগ' যাঁদের অবদানে সমৃদ্ধ তাঁরা হলেন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-৮৭), মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩), হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩) ও নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯)। এঁদের কাব্যসৃষ্টির কালপরিমাণ যথাক্রমে একুশ, চার, একুশ আর পঁচিশ বছর।

কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-৯৪) ছিলেন হেম-নবীনের অগ্রজ। কাব্যরচনার কালবিচার করে আমরা যে তালিকা উপস্থিত করেছি তাতে দেখা যাবে 'বন্ধুবিয়োগ' কাব্য ১৮৫৯ সালে রচিত হয়। এই হিসাবে বিহারীলালের কবিজীবনের দৈর্ঘ্য ছিল পঁয়ত্রিশ বছর। কবিজীবনের পরমায়ু বিচারে আমাদের মনে হওয়া স্বাভাবিক যে তাঁর অবদানের পরিমাণ স্বল্পই। তবু সে দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে শুধু মৌলিক কবিতার পরিমাণ-সঙ্গতি বিচার করলে বিহারীলালকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম শ্রেণীর কবিদের অন্যতম বলে স্বীকার করতেই হয়। প্রাক্ রবীন্দ্রযুগের রঙ্গলাল, মধুসূদন, বিহারীলাল, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র এই পাঁচজন কবির মধ্যে রঙ্গলাল ছাড়া বাকী চারজন নিঃসন্দেহে Major poet—ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক হরেন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত এঁদের Major poet হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন।[৭]

ইংরেজী সাহিত্যের পাঠক মাত্রেই জানেন যে, পোপ, ড্রাইডেন, কিট্‌স্ এমন কি হপ্‌কিন্স্-এর রচনার পরিমাণ এমন কিছু বেশী নয় অথচ এঁদের Major poet রূপেই দেখা হয়।[৮] এলিয়ট্ তাই এই বিচারকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য যে যুক্তি উপস্থিত করেছেন তা খুবই মূল্যবান বলে মনে হয়। বিহারীলাল রচিত দু' একটি কবিতা শুধুমাত্র বিভিন্ন কাব্যসংকলনের মধ্যে মুদ্রিত হয়েই ফুরিয়ে যায়নি, পৃথক পৃথক কাব্য গ্রন্থ ও তাঁরই রচনার সংকলনও প্রকাশিত হয়েছে। এই একটি তথ্যই প্রমাণ করে যে, বিশিষ্ট রচনার পরিমাণ-বিচারে বিহারীলাল উল্লেখযোগ্য কবি।

উল্লেখপঞ্জী

(১) বিহারীলাল রচনাসম্ভার : সম্পাদক : প্রমথনাথ বিশী, ১ম সংস্করণ, সম্পাদকীয় : পৃষ্ঠা ৺.

(২) T. S. Eliot : Selected Prose : T. Hayward, edition P. 17

(৩) Ibid " " " " P. 18

(৪) Ibid " " " " P. 116

(৫) সাহিত্যসাধক চরিতমালা : সম্পাদক : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড, ৫ম সংস্করণ, বিহারীলাল-পৃঃ ১৯

(৬) শশিভূষণ দাশগুপ্ত : বাঙলা সাহিত্যের নবযুগ, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পৃঃ ২২৬

(৭) H. M. Dasgupta : Studies in Western influence on 19th Century Bengali Poets : Preface P. XI

(৮) The Major Victorian Poets : Reconsiderations : Ed-I Armstrong-1969 Edn Introduction-pp. 1-6.

[খ] বৈচিত্র্য প্রসঙ্গ

গীতিকবি এবং রোমান্টিক কবি হিসেবে বিহারীলালের পরিচিতি ও স্বীকৃতি অবিসংবাদিত। এ নিয়ে তাই আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। প্রাসঙ্গিক উল্লেখ ছাড়া এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করিনে। বিহারীলালের কবিত্ব নিয়ে বিতর্ক নেই, বিতর্ক আছে কবিত্বের উৎকর্ষগত স্থান নির্দেশে। যাঁরা তাঁর কাব্য-ধারাকে প্রথম শ্রেণীর বলে স্বীকার করেননি, তাঁরা তা কেন করেননি, সে কারণ নির্দেশ করতে কিন্তু কুণ্ঠিত হননি। আমরা তুলনামূলক আলোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমেই দেখার চেষ্টা করব, বিহারীলাল রোমান্টিক গীতিকবি হিসেবে কতখানি সার্থক। সৃষ্টির পরিমাণ প্রসঙ্গটি আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি। এখন আমাদের কবির কাব্য-ধারার বৈচিত্র্য নির্ধারণেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করব।

বৈচিত্র্যনির্ধারণের ক্ষেত্রে আমরা রূপ ও ভাব উভয়দিকেই লক্ষ্য রাখব। যে কোনো কাব্যের মূল্য যে তার রূপবাদ ও ভাবের সার্থক সমন্বয়ের উপর নির্ভরশীল,—এই মতবাদে আমরা বিশ্বাসী। কিন্তু এ বিশ্বাসও আমাদের দৃঢ় যে, ভাব ও রূপ অভিন্ন। আঙ্গিকের দিকে লক্ষ্য রেখে যখন ভাষা, ছন্দ, অলংকার প্রভৃতির বিচার করা হবে তখনই বিশ্লেষণ করে দেখা যাবে, কবির ব্যক্তিমানসে সমুৎপন্ন বিভিন্ন ভাব, কাল ও পাত্রকে অতিক্রম করে কতখানি সমষ্টিমানসের উপযোগী হয়ে উঠতে পেরেছে। পরিশুদ্ধ ব্যক্তিমানসকে সর্বজনীন করে বক্তব্যাশ্রয়ী ভাবকে সর্বজনগ্রাহ্য করে তোলাই সার্থক কবিকর্ম। প্রকৃতপক্ষে রূপ আর রূপাতীতের, সীমা আর অসীমের, সৌন্দর্য আর কল্যাণের আনুপাতিক সংমিশ্রণটি বিশ্লেষণ করে দেখার চেষ্টা করা যাবে। এ কাজ নিঃসন্দেহে দুরূহ, কারণ আমরা জানি

রূপাতীতের ব্যঞ্জনাহীন রূপ যেমন দুর্লভ নয়, দুর্লভ নয় এমন সৃষ্টিও যেখানে কল্যাণধর্মহীন সৌন্দর্যের সীমিত প্রকাশটুকুই সব।

উনবিংশ শতাব্দীর গীতিকবিতা-ধারার আলোচনা অপ্রচুর নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিহারীলাল সম্পর্কে যথাযথ মূল্যায়ন হয়নি, বেদনার কারণ সেইখানে। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, বিহারীলালের কাব্যধারার যথাযথ মূল্যায়ন হয়নি শুধু নয়, বহু ক্ষেত্রে ভ্রান্ত ধারণারও সৃষ্টি হয়েছে। বিহারীলালের সর্বশেষ কাব্য-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে প্রায় একশ' বছর আগে, আর ইতিমধ্যে বাংলা সমালোচনার ধারাও যথেষ্ট পুষ্টি লাভ করেছে। তবুও যে বিহারীলালকে নিয়ে আমাদের সংশয় দূর হয়নি, এ নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর।

'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য'-গ্রন্থে গীতিকবিতাকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই বিভাগ দুটির প্রত্যেকটির একাধিক উপবিভাগ পরিকল্পিত হয়েছে। বর্গীকরণের পর ডঃ অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় বিভিন্ন কবির কাব্য গ্রন্থকে বা কবিতাকে ভিন্ন শ্রেণীতে স্থাপন করেছেন। বিহারীলালের 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যকে ইনি একবার 'প্রেমমূলক'[১] আর একবার 'প্রকৃতি কবিতা'[২] বলে উল্লেখ করেছেন। একইভাবে ইনি 'বন্ধুবিয়োগ' কাব্যটিকে 'প্রেমমূলক' আর 'বিষাদমূলক' কবিতা বলে চিহ্নিত করেছেন।

ডঃ মুখোপাধ্যায়ের এই বর্গীকরণ এবং এক একটি কাব্য গ্রন্থকে এক বা একাধিক শ্রেণীতে স্থাপন কতখানি যুক্তিযুক্ত তা ভেবে দেখা দরকার। ভাবগভীরতার যে অন্তরতম প্রদেশে লৌকিক রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শের জগত অলৌকিক রহস্যময়তায় সম্পূর্ণ ভাবে সৃজিত হয়, সেখানে সর্বদা লৌকিক কার্য কারণ সম্বন্ধে শৃঙ্খলা রক্ষিত হয় না। সে সৃষ্টির মধ্যে লোকোত্তর চমৎকারিতা আশা করতে পারি—লৌকিক শৃঙ্খলাবন্ধন নয়।

বস্তুত, বিহারীলালের কোনো কাব্যগ্রন্থকেই একটি বা দুটি বিশেষ-ভাবের ধারক ও বাহক হিসেবে গ্রহণ করা সমীচীন নয়। দীর্ঘ

কবিতাগুলির ভাববৈচিত্র্যই এক্ষেত্রে অনুভবনীয়। আর যে কাব্য-গ্রন্থগুলির মধ্যে বহু সংখ্যক ক্ষুদ্রগীত বা কবিতা সংকলিত, সেগুলির মধ্যে বিভিন্ন কবিতায় বিভিন্ন ভাবের প্রকাশও দুর্লক্ষ্য নয়।

কাব্যপাঠের প্রধান উদ্দেশ্য যেমনি রসাস্বাদন, সমালোচনারও মুখ্য উদ্দেশ্য তেমনি রসসংক্রমণ। ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে অতি সাম্প্রতিক কালের সমালোচকেরা বিহারীলাল সম্পর্কে কে কী বলেছিলেন—তা অবশ্যই স্মরণ করব এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সেগুলির ওপর নির্ভর করব কাব্যরসাস্বাদনে সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে। কিন্তু এজন্য প্রধানত নির্ভর করব আমরা—শ্রদ্ধাশীল আর অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে কাব্যপাঠের ওপর এবং রচনার যে কালানুক্রমিক তালিকা উল্লিখিত হয়েছে—অনুসরণ করব আমরা তাকেই।

১

বিহারীলালের সর্বপ্রথম রচনা 'বন্ধুবিয়োগ' কাব্যগ্রন্থটি। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা কবিতার উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটেনি। প্রকৃতপক্ষে সাময়িক পত্র-পত্রিকার আশ্রয়ে বাংলা গদ্য যে ভাবে আপনার পথ সন্ধান করে নিয়েছে, বাংলা কবিতা তা করতে পারেনি। এ যুগের যিনি প্রধান কবি—সেই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-৫৯) এই যুগ-ধর্মের দীক্ষা গ্রহণ করেও, এ যুগের কাব্যস্রোতোধারায় নতুন প্রাণের সঞ্চার করতে পারেননি। গুপ্ত কবির ইতিহাসচেতনা, স্বাদেশিকতা এবং বিচিত্র বিষয়কেন্দ্রিক চিন্তা আধুনিকতার অভ্যুদয় ঘটিয়েছে, যদিও এসবের সার্থক কাব্যিক প্রকাশ তাঁর মধ্যে ঘটেনি। তাঁর একাধিক শিষ্যের মধ্যে বরং এগুলি অনেকখানি সার্থকভাবে প্রকাশিত।

বাংলা কবিতার মধ্যে যথার্থ প্রাণের সঞ্চার ঘটেছে এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। এই দ্বিতীয়ার্ধেই রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, বিহারী-লাল প্রমুখ কবিবৃন্দ বাঙালীর নবজাগরণের স্বরূপটি আপন আপন

ভঙ্গীতে তুলে ধরেছেন। বলা যায়, গদ্য চর্চার সাহায্যে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙ্গালীর মানসপ্রস্তুতি আর সেইক্ষেত্রে দ্বিতীয়ার্ধে বহু বিচিত্র কাব্যের ফলোৎপত্তি ঘটেছে। বহু বাধা, বহু আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, সুদীর্ঘ সঞ্চিত পর্বতপ্রমাণ মানসিক জড়তা আর হীনমন্যতাকে জয় করে প্রকাশিত হোল—মহাকাব্য, আখ্যায়িকাকাব্য, তত্ত্ব ও যুক্তিপ্রধান কাব্য, আর সবশেষে অন্তর্মুখী গীতিকাব্য। গীতিকাব্যের ক্ষেত্রে যুগস্বীকৃতি মিলেছে বহু বিলম্বে।

যদিও গীতিকবিতার জন্মমুহূর্ত বিষাদচিহ্নিত, মধুসূদনের 'আত্মবিলাপ' কবিতা দিয়েই তার উদ্বোধন, তবু বিহারীলালের 'বন্ধুবিয়োগ' সম্পূর্ণ নতুন আস্বাদের এবং বাংলা গীতিকবিতার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে নবাগত। এই বিষাদ কবিজীবনের হতাশা আর ব্যর্থতার ক্ষতমুখ থেকে উৎসারিত নয়, উচ্ছ্বসিত হয়নি কবির রোম্যান্টিক বিষাদপ্রবণতার তাত্ত্বিক বিচার পদ্ধতি থেকে। 'বন্ধুবিয়োগ', বাল্যবন্ধু পূর্ণ, বিজয়, কৈলাস, আর রামচন্দ্র-এর স্মরণে রচিত। এই অশ্রু-তর্পণের মধ্যে কোনো অতিরঞ্জন নেই বা ভাবাতিরেক নেই। বহু-বিচিত্রকাহিনীর যথার্থ বর্ণনার মাধ্যমেই কবি তাঁর বন্ধুচর্যা সম্পাদন করেছেন। এই বন্ধুকৃত্য প্রসঙ্গে প্রথমা পত্নী অভয়াদেবীর অকাল মৃত্যুকেও স্মরণ করেছেন কবি। শোকগাথাবলীর মধ্যে অভয়াদেবীরও স্থান হয়েছে তাই স্বাভাবিক ভাবেই।

'বন্ধুবিয়োগ'-এর প্রথম সর্গের প্রথম ছত্রে পূর্ণচন্দ্র, কৈলাস ও বিনয়ের নামোল্লেখ থাকলেও কবি এই সর্গে পূর্ণচন্দ্র ও বিজয় সম্পর্কেই তাঁর বেদনা নিবেদন করেছেন। এই সর্গের ভূমিকা হিসেবে কবি গ্রে'র Elegy থেকে চার ছত্রের একটি স্তবক উদ্ধৃত করে দিয়েছেন। কবি-বন্ধুদের সম্পর্কে কবির মূল ভাবটি এই স্তবকটির দিকে তাকিয়েই বুঝে নেওয়া যায়। অনায়াসেই অনুমিত হয় যে, যথাযথ সামাজিক স্বীকৃতি আর মর্যাদা না পেলেও এই বন্ধুরা প্রত্যেকেই গুণবান ছিলেন। কবি বন্ধুদের মূল্যায়নে যে নিজের স্নেহপ্রীতিকেই যুক্তি আর

বিচারের উর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন, এ অভিযোগ করার কিন্তু অবকাশ মাত্রও নেই। বন্ধুদের সম্পর্কে উদ্ধৃত ঘটনাবলী লক্ষ্য করলে তাঁদের গুণবত্তা ও হৃদয়বত্তা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ মাত্র থাকে না। শুধু কি তাই? পারস্পরিক প্রীতি আর অকৃত্রিম সৌহার্দ্যের যে অপূর্ব চিত্র এই কাব্যগ্রন্থে অঙ্কিত হয়েছে, এ যুগে তা অকল্পনীয়।—

এক ধ্যান এক জ্ঞান, এক মন প্রাণ,
একের কথায় কেহ না করিত আন,
একের সম্পদ যেন সবার সম্পদ,
একের বিপদে বোধ সবার বিপদ। (১ম সর্গ)

বন্ধুপ্রীতির নিবিড়তা বা সমপ্রাণতার এই নিদর্শন আজ দুর্লভ, তাই এ কাব্যগ্রন্থের যথাযথ মূল্যায়নও দুষ্কর।

প্রথম সর্গের সূচনা হয়েছে বন্ধুত্রয়ী স্মরণে; কিন্তু দু'জন বন্ধুর স্মৃতি-চারণা লিপিবদ্ধ করেছেন এই কবিতায়। অবশ্য প্রসঙ্গক্রমে তিনজনের কথাও এসেছে কোথাও কোথাও। এদের মধ্যে পূর্ণচন্দ্র ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু। গঙ্গাস্নানে গিয়ে বিপন্ন ব্যক্তিকে নিজের পরিধেয় বস্ত্র দান করে শুধু গামছা জড়িয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন পূর্ণচন্দ্র। কথা প্রসঙ্গে একদিন কৈলাস সাধারণ ভাবে নারীদের সম্পর্কে কটূক্তি করে বলেছিলেন, বন্ধুত্বের মূল্য নারীরা বোঝে না। বন্ধুর বাড়ীতে নিশিযাপন করে ফিরে গেলে যে দৃশ্য দেখা যায়, তা হোল—

আলু থালু কেশ বেশ, আরক্ত-নয়ন,
ঘন ঘন বহিতেছে নিশ্বাস পবন।
বিকট ভুজঙ্গ যেন গহ্বর ভিতরে—
ফোঁপায়ে ফোঁপায়ে উঠে ফোঁস ফোঁস করে।

গৃহিণীদের একমাত্র দাবী—

টাকা আনা ছাড়া আর কিছু করোনাক,
সারাদিন সারারাত তার কাছে থাক।

যাহা কবে, সায় দিবে, ঠোনা খেয়ে হাস,
তবেত বুঝিবে তুমি তারে ভালবাস।

কৈলাস কিন্তু এখানেই থামলেন না। তাঁর নারীবিদ্বেষ প্রবলতর ভাবে প্রকাশিত হোল বন্ধুদের কাছে। তিনি বললেন—

যেমন আপন মন, ভাবিছে তেমন
ব্যাভিচারে তোমারে হেরিছে সর্বক্ষণ।
একবার একদণ্ড খোলা যদি পায়,
কি কাণ্ড করিবে বসে বলা নাহি যায়।
যে পুরুষ একবার ঠেকিল নজরে,
সেই যেন আঁকা হয়ে রহিল অন্তরে।
এইরূপ যাহাদের মন চমৎকার,
আরোপণ করিবে না কেন ব্যভিচার ?

প্রাণপ্রতিম বন্ধু হলেও কৈলাসের এই সাধারণীকরণ পূর্ণচন্দ্রের সমর্থন লাভ করল না। নারীজাতির প্রতি এই দোষারোপ তিনি সহ্য করলেন না। প্রতিবাদ করলেন পূর্ণচন্দ্র। স্মরণ করিয়ে দিলেন অত্যন্ত রূঢ় ভাবেই—

নিতান্ত নির্বোধমত একগুঁয়ে হয়ে
কেবল নারীর দোষ যাওয়া নয় কয়ে।
পুরুষ এমন আছে বলহে ক'জন,
না করে বেশ্যার টোলে যামিনীযাপন ?

সমাজে সাধুতার অভিনয় করে, ধার্মিকতার ছদ্ম আবরণে বহু তথাকথিত সম্মানিত ব্যক্তি যে 'মিট্‌মিটে, ভিৎভিতে, নাটের গোঁসাই, অন্তরে পর্বতে ঘা, মুখে রা নাই' তা স্মরণ করিয়ে দিলেন।

সহৃদয়দ্বয়ের দ্বন্দ্ব যখন চূড়ান্তরূপ নিয়েছে, তখন কবি-মীমাংসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। তাঁর বক্তব্যের মধ্যে নারী জাতির প্রতি শ্রদ্ধা অকৃপণভাবেই প্রকাশিত। সমকালীন সমাজে বারবনিতা সমস্যা সম্পর্কে কবির সহানুভূতিপূর্ণ যুক্তিগুলি স্মরণীয়।

তিনি বলেছেন—

গৃহসুখ মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ,
জনমের মত তারা সে সুখে বিমুখ।
যার তরে দিয়েছিল কুলে জলাঞ্জলি
উড়ে গেছে বাসি ফুল ফেলে সেই অলি।

অথচ আমাদের সমাজে অহরহ দেখা যায়—

ছেলেরা বেশ্যার সঙ্গে খেয়ে মদে ভাতে
সারা রাত পোড়ে থাকে মুখ দিয়ে পাতে,
প্রাতে ঘরে এলে আর দোষ নাহি রয়,
মেয়ে কিছু করিলেই সর্বনাশ হয়।

যে সমাজে—

অনা'সে ছুরাত্মা পুত্র গৃহে স্থান পায়,
পাপ স্পর্শ মাত্রে কিন্তু কন্যা ভেসে যায়।

সেই সমাজের কাছেই বারবনিতাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে কবির প্রশ্ন—

তাদের কি উদ্ধারের প্রয়োজন নাই ?
কেবল উদ্ধার হবে পুরুষ সবাই ?

এ গেল সমস্যার দিক। শুধু সমস্যার আলোচনায় ফলোদয় সম্ভব নয়, প্রয়োজন, সমাধানসূত্র উদ্ভাবনের। সেই সমাধানসূত্র নির্দেশ করলেন কবি—

অগ্রে চেষ্টা কর সেই পতন থামাতে,
কিছুই হবে না কিন্তু কেবল কথাতে।
সকলে একত্র হয়ে ছাতি পেতে থাক,
যে পড়িছে তাহাকেই বুক দিয়ে রাখ।
* * * * * * * *
তা হইলে তেজোমান চরিতার্থ হবে
যথার্থ বীরের ন্যায় মন সুখে রবে।
যেদিন এমন হবে সমাজ সংস্থান,
সেইদিন মুক্তি পাবে মানব সন্তান।

উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ নারীজাতির স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে আস্থায় উজ্জ্বল। দীর্ঘকালের কুসংস্কারের অন্তরালে নারীজাতির প্রতি যে অবহেলা আর অবিচার সঞ্চিত হয়ে উঠছিল, এই যুগের কাব্য-সাহিত্যে তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। প্রচলিত অর্থহীন সমাজসংস্কারের চাইতে মানবিক দাবী যে অনেক বড় এর স্বীকৃতি বিহারীলালের মধ্যেও স্পষ্টভাবেই পাওয়া গেল।

পূর্ণ আর কৈলাস যখন সমাজের এই সব সমস্যার আলোচনায় মগ্ন, বিজয় কিন্তু নীরব। তাঁর চিন্তা যেন অন্য কোন পথের সন্ধান পেয়েছে। রাত্রি প্রভাত হয়েছে। ফোর্ট উইলিয়ম থেকে সময়জ্ঞাপক তোপধ্বনি ইতিমধ্যেই শ্রুত হয়েছে। সম্পূর্ণ আকস্মিক ভাবেই বিজয় বলে উঠলেন 'বিদায় চাই নিকটে তোমার'। বিনয়ের জীবন্ত প্রতিমূর্তি এই বিজয়কে কবি 'বিনয়ী মিত্র' অভিধায় ভূষিত করেছেন। বন্ধুর এই বিদায় সম্ভাষণে কবি ব্যথিত আর বিস্মিত হলেন, কিন্তু কবি দেখলেন,

আকার লাবণ্যহীন, মলিন বদন,
অবিরল অশ্রুজলে ভাসে দু'নয়ন—

বিচলিত হলেন কবিও। যে প্রভাত 'বড় সুখময়' তখনই এই নিদারুণ দুঃখময় কথার অবতারণা কেন? বিজয় উত্তর দিলেন:

আর আমি বাঁচিব না, বুঝেছি নিশ্চয়,
ভেবে ভেবে এই ভাব হয়েছে উদয়।

বিদায় নিয়ে সেইদিনই বিজয় চলে গেলেন। বিজয়ের সঙ্গে কবির সেই দেখাই শেষ দেখা। উপসংহারে তাঁর উদ্দেশে কবির বক্তব্য:

ওরে ভাই বিজয় বিনয় বিভূষণ।
সেইদিন মম মনে জাগে অনুক্ষণ।

দ্বিতীয় সর্গ বন্ধু কৈলাসের উদ্দেশ্যে রচিত। বন্ধুর সদ্‌গুণাবলীর যে তালিকা কবি সযত্নে তুলে ধরেছেন তা থেকে বেশ বোঝা যায় যে, কৈলাসও অত্যন্ত গুণবান ব্যক্তি ছিলেন। কবি অবশ্য তাঁকে 'সর্বগুণময়' বলেই বর্ণনা করেছেন। একদিকে 'বীর্যবান বুদ্ধিমান', অন্যদিকে পরো-

পকারী ও দেশপ্রেমিক এই বন্ধুটির অপূর্ব বাণীচিত্র রচনা করেছেন কবি। বন্ধুর কর্তব্যপরায়ণতা পরদুঃখকাতরতা ইত্যাদির বর্ণনা করে তাঁর পরিবারিক জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন কবি। ইনি দ্বিপত্নীক ছিলেন। এঁর প্রথমা স্ত্রীর সম্বন্ধে কবির উক্তি—

প্রথম পক্ষের তব প্রেয়সী ভামিনী,
বুঝিত হৃদয়, ছিল হৃদয়-গ্রাহিণী।
সুশীলতা, কোমলতা, ধীরতা, নম্রতা,
শালীনতা, সরলতা, সত্য, পবিত্রতা,
যে সকল গুণ হয় প্রেমের আকর,
সে সকলে পূর্ণ ছিল তাহার অন্তর।

নিঃসন্দেহে বলা যায়, সর্বপ্রকারেই কৈলাসের প্রথমা পত্নী তাঁর যোগ্যা সহধর্মিনী ছিলেন। কিন্তু—

দ্বিতীয়া তেমন নয়, বিষম কারখানা,
রূপ গর্বে ডব্‌গা ছুঁড়ি ফেটে আটখানা।

শুধু তাই নয়। এই মহিলার দোষাবলী বর্ণনায়ও কবি পশ্চাদপদ হননি, বলেছেন—

চাপল্য, চাঞ্চল্য, ছল, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা,
যে সকলে ঘটে প্রেম বিষম ঘটনা;
সে সকল মালা গেঁথে পরেছে গলায়
ভাবিয়া দেখিলে মনে খেদে হাসি পায়।

কবির মনেও তাই প্রশ্ন জেগেছে, 'এমন নারীর সঙ্গে তোমার মতন, লোকের কি হয় প্রেম'? দ্বিতীয়া পত্নীর অনুচিত আচরণে কৈলাস কিছুদিন ম্রিয়মাণ অবস্থায় ছিলেন। তারপর 'সে দুখ তিমির শীঘ্র হল দূরগত'। বোধহয় জন্ম, মৃত্যু আর বিবাহ সম্পর্কে যে দৈবনির্দেশে হিন্দুদের বিশ্বাস তারই জোরে কৈলাস এই পারিবারিক দুর্ভাগ্যকে নিজের প্রাপ্য বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। ধীরে ধীরে কৈলাসের সমগ্রচিন্তা আধ্যাত্মিক জগতের দিকেই প্রসারিত হয়েছিল; ফলে

অনুতপ্তা পত্নী যখন এসে স্বামীর প্রেমভিক্ষা করেছেন, তখন আর কৈলাসের অন্য নারীপ্রেমের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেনি। কবি বলেছেন—

স্বর্গের সুধায় যার সুতৃপ্ত রসনা,
মৌচাকের মধুতে কি সে করে বাসনা?

এই বন্ধুটির চরিত্রচিত্রণ প্রসঙ্গে বিহারীলাল তাঁর অকৃত্রিম সাহিত্যপ্রীতির কথা বলেছেন, আর স্বাভাবিকভাবেই সৎসাহিত্য সম্পর্কে কবির চিন্তাটিও প্রকাশিত করেছে হয়েছে সংক্ষিপ্ত পরিসরে। আলংকারিকদের মতে সাহিত্যরস সহৃদয় হৃদয়সংবেদ্য। কবি বলেছেন, এই সহৃদয়তা কৈলাসের ছিল; তাই—

কাব্যের অমৃতরস কিরূপ সুরস
সত্যস্বাদ পেয়েছিল তোমার মানস।

কিন্তু তাই বলে সাহিত্য বিচারের সূক্ষ্ম ক্ষমতা কিছু কম ছিল না কৈলাসের। মূল্যহীন রচনা তাঁকে কোনোদিন আকৃষ্ট করতে পারেনি। প্রসঙ্গক্রমে কবি বলেছেন—

বড়ই জটিল হয় কুটিলের লেখা
বৃথা পরিশ্রম করে মাথা মুণ্ড দেখা।

কবি সাহিত্যিকের মধ্যে যদি গ্রন্থিবহুল বক্রচিন্তা লালিত পালিত হয়, তবে তাঁদের রচনায় সেই জটিলতা প্রকাশিত হবে, এ স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে শুধু একটি কথাই মনে রাখা আবশ্যক যে, গজে গজে যেমন মুক্তা থাকে না, প্রতিটি রচনায় তেমনি সাহিত্যগুণ থাকেনা।

এই পরমগুণবান বন্ধুও তাঁর দ্বিতীয়া পত্নী আর একমাত্র পুত্রকে ফেলে প্রিয় পরিজনকে শোকসাগরে নিমজ্জিত করে বিদায় নিলেন। বন্ধু তাঁর পত্নী-পুত্রের ভার কবির হাতে সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেলেন পরপারে। কিন্তু কবির বেদনাদীর্ণ অন্তরোৎসারিত প্রশ্নের জবাব কে দেবে?—'আমারে কাহারে দিলি ভাইরে এখন?'

তৃতীয় সর্গ কবি তাঁর প্রথমা পত্নী অভয়াদেবীর স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেছেন। কবিতায় কবি 'সরলা' এই কাব্য-নামটি ব্যবহার করেছেন। অনুমান নয়, কবিতার বর্ণনা থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, 'সরলা' নামটি কবি স্বীয় পত্নীর যোগ্য বিশেষণরূপেই বেছে নিয়েছিলেন।

কিভাবে কোথায় অভয়াদেবীর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হোল সেখান থেকে শুরু করে কবি সব কিছুরই নিপুণ বর্ণনা দিয়েছেন। কবিতা পাঠে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, কবি বিহারীলালের অন্তরে নারীঘটিত কোনো ভীরুতা কোনোদিনই ছিল না। তিনি অসংকোচেই স্বীকার করেছেন যে, তাঁর সুসংস্কৃত আর সুসংযত 'আর্যতম মনে' অভয়া দেবীর প্রতি প্রবল অনুরাগ সৃজিত হয়েছিল। এই মানসিক পরিবর্তনকে কিন্তু কবি 'বিধাতার লীলা' বলেই স্বীকার করেছেন। যাই হোক, প্রথমা পত্নীর সাহচর্যে কবির পারিবারিক জীবন যে আনন্দময় হয়ে উঠেছিল তার সরলস্বীকৃতি কবিতাটির ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত। বোঝা যায়, অভয়া দেবীর পুঁথিগত শিক্ষা বিবাহের পূর্বে কিছুই ছিল না। সেই কথায় তদানীন্তন যুগের যে সব কুসংস্কার নারীসমাজে প্রাধান্য লাভ করেছিল তার কয়েকটির সরস উল্লেখ কবিতার মধ্যে পাওয়া যায়। কবি পত্নীর মানসিকতা প্রসঙ্গে বলেছেন—

পড়িতে বলিলে বহি মনে পেত ভয়,
ভাবিত পড়িলে হব বিধবা নিশ্চয়।
খদ্যোত পড়িলে দীপে হ'ত চমকিত,
শুনিলে পেচক রব ভাবিত অহিত।

প্রথমা পত্নী একটি মৃতসন্তান প্রসব করে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এঁর জন্য কবির শোক গভীর আর্তনাদে ধ্বনিত হয়েছে—

হাহারে হৃদয় ধন সরলা আমার
কোথা গেলে ত্রিভুবন করি অন্ধকার।

উহু উহু বুক ফাটে হায় হায় হায়.
অকস্মাৎ বজ্রপাত হইল মাথায়।

* * * *

পরান কাঁদিয়ে ওঠে না দেখে তোমারে,
তোমা বই কে আমার আছে এ সংসারে।

এই জাতীয় রচনায় ভাষার কারুকার্য নেই কিন্তু নিখাদ আন্তরিকতা আছে। কবির বিষাদ আলংকারিক রীতিতে প্রকাশিত নয়, কিন্তু এমন প্রাণস্পর্শকারী আর্তনাদ কাব্য-জগতে ক্বচিত শ্রুত হয়। এই খানেই বিহারীলালের বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর সম্পর্কে বিরূপতার কারণও বোধ হয় এইখানে। বিহারীলালের অন্তরের ভাব তাঁর মুখের অনাড়ম্বর অনলংকৃত ভাষায় প্রকাশিত। আমাদের কাব্যসংস্কার ভিন্নতর। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য কাব্য সাহিত্য ও সমালোচনা পদ্ধতির সঙ্গে আমাদের যে পরিচয় তা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে যে বিশেষ ছাঁদে ফেলে গড়ে তুলেছে, তার সুনির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে এ কাব্যের বিহারীলালকে ধরা যায় না। তাই অনেকের মতে 'মেঘনাদবধ', 'পলাশির যুদ্ধ', 'বৃত্র সংহারের' তুলনায় বা পরবর্তীকালীন রবীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, জীবনানন্দের তুলনায় বিহারীলাল যেন বহুলাংশেই কবিত্ববর্জিত। প্রকৃতপক্ষে তাঁর কবিতায় 'আমরা ভাবনা অপেক্ষা ভাব, কল্পনা অপেক্ষা প্রীতি বিভোরতা, যাহা নাই তাহার উদ্ভাবন অপেক্ষা যাহা আছে, তাহা হইতেই আনন্দলোক বিরচন সাধনা লক্ষ্য করি।'[১] এই বক্তব্যের মধ্যেই বিহারীলালের কবিধর্মের অন্যতম পরিচয় নিহিত আর এরই মধ্যে বিধৃত তাঁর কবিকৃতির সার্থক মূল্যায়নের সূত্র।

'বন্ধু বিয়োগ' কাব্যের চতুর্থ সর্গটি কবিবন্ধু রামচন্দ্রের স্মৃতিভিত্তিক। ইনিও গুণবান এবং কাব্যপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। রামচন্দ্রের চরিত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি তাঁর মাতৃভূমির উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, জননী, জন্মভূমি আর মাতৃভাষা এ তিনের সেবা যত বেশী শ্রদ্ধানত চিত্তে দেশের মানুষ করতে পারে—

ততই প্রবোধসূর্য হইবে উদয়,
ততই জন্মভূমি হবে আলোময়।

বন্ধু রামচন্দ্র স্ত্রীশিক্ষা-প্রসারে আগ্রহী ছিলেন। তিনিও জানতেন,

স্বদেশের নারীদের অদৃষ্টের দোষে
পড়েছে তাহারা সবে বাগ্‌দেবীর রোষে।
মূর্খতা তিমিরে মন ঘোর অন্ধকার
চারিদিকে ভ্রান্তিসিন্ধু অকূলপাথার।

ক্ষুদ্র স্বার্থের কলহে মানুষ তার শক্তির অপচয় না ঘটিয়ে যদি জনসংঘের উন্নতিতে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে তবে দেশের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। কবি দ্রষ্টার ভূমিকায় এসে দাঁড়ালেন, ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে যে নারীশিক্ষার প্রচলন হবে এটুকু অনুমান করে নিতে তাঁর অসুবিধে হোল না। তিনি যেন দেখতে পেলেন—

কোথাও ললিত বালা অচল নয়নে,
নতমুখে শিল্প কর্মে আছে এক মনে।
কোথাও জননী লয়ে কুমারী কুমার,
শিখান সহজে কত কথা সার সার।
কোথাও যুবতী সতী প্রাণপতি সনে,
আছেন কবিতামৃত রস আস্বাদনে।
বিনোদিনী বিদ্যার হইলে অধিষ্ঠান,
আহা সেইস্থান কি যে হয় শোভমান।

যাই হোক, বন্ধু রামচন্দ্রের বিদ্যা, বুদ্ধি, নম্রতা প্রভৃতি অজস্র সদ্‌গুণাবলীর উল্লেখ করেছেন কবি, অপূর্ব ক'টি ছত্রে—

পাদপে ধরিলে ফল
নীরদে পুরিলে জল।
নত হয়ে বয় কিবে শোভা মনোহর
গুণ বিদ্যা ভার ভরে,

মানবে বিনম্র করে
হেরে তোরে সকলের জুড়ায় অন্তর।
এ হেন গুণবান বন্ধুর জন্য কবির আর্তনাদ শ্রুত হোল—
হায়রে মনের সাধ মনেই রহিল
বসন্ত মুকুল জাল আতপে দহিল।

'বন্ধু বিয়োগ' কাব্যপাঠের সময় বার বার কবির ওপর ধ্রুবদর্শনের প্রভাবের কথা মনে আসে। পরোপকারপ্রবণতা, নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা আর অন্যায়েব বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্পৃহা এ সব কিছুর মূলে স্পেন্সর, কঁৎ প্রভৃতির যে প্রভাব ছিল, তা অবশ্যই স্বীকার করতে হয়।

'বন্ধুবিয়োগ' যখন রচিত হয়, তখন একমাত্র রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পাদ্মিনী উপাখ্যান'খানি প্রকাশিত হয়েছিল। রচিত হওয়ার প্রায় দশ বছর পরে বিহারীলালেব কাব্য প্রকাশিত হয়। এই দশ বছরের মধ্যে কবির গীতসংগ্রহ 'সঙ্গীত শতক' প্রকাশিত হয়, যদিও এর রচনা 'বন্ধু বিয়োগ'-এর পরে। পরবর্তীকালে প্রকাশিত হলেও 'বন্ধু বিয়োগ'-এর মধ্যে সমকালীন কাব্যধারার অনুবর্তন প্রচেষ্টা প্রমাণিত হোল। ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ বিহারীলাল সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে এ তথ্যটি স্বীকার করেছেন।[২] কাহিনীমূলক কাব্যরচনা এবং তাতে চৌদ্দ মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দ ব্যবহার করে বিহারীলাল বীরযুগের ধারার অনুসরণ করবার চেষ্টা করলেও বিষয় নির্বাচনে তাঁর মানসিক বৈশিষ্ট্যটি লক্ষণীয়। পুবাণ বা ইতিহাসাশ্রিত কাহিনী সংগ্রহ না কবে কবি একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুদের ও পরলোকগত পত্নীর বাস্তব জীবনচিত্র অঙ্কন করে বাংলা সাহিত্যে শোকগাথামূলক কাব্যরচনাব একটি ধারা সৃষ্টি করলেন। একে শুধু বিষাদমূলক কবিতা হিসেবে চিহ্নিত করা যুক্তিযুক্ত হবে না। স্মৃতিতর্পণমূলক এই কবিতাগুলি প্রকৃতপক্ষে মিল্টনের Lycidas, শেলীর Adonis, টেনিসনের In Memorium প্রভৃতি Elegy বা শোকগাথার সমগোত্রীয়। 'বন্ধু

বিয়োগ' কাব্যের মধ্যে আখ্যানমূলক অংশ থাকায় তাকে সমকালীন বিদেশী কাব্যধারায় অনুকরণাত্মক বলে উল্লেখ করলেও সমলোচকেরা এর মৌলিকতা[২] অস্বীকার করেন নি। বিহারীলালের অনন্যসাধারণ স্বকীয়তার প্রাথমিক প্রকাশ এইখানে লক্ষ্য করা গেল।[৩]

উল্লেখপঞ্জী

১ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়: উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য, ১ম সংস্করণ পৃঃ ৫৮

২. প্রণবরঞ্জন ঘোষ: বিহারীলালের কাব্য পরিক্রমা, কল্যাণী ৪র্থ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ

৩, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 'সদ্ভাব শতক' যখন প্রকাশিত হয় (ঢাকা, ১৮৬১) তখনো বিহারীলালের 'বন্ধু বিয়োগ' রচিত হয়েও প্রকাশিত হয়নি। 'সদ্ভাব শতক'-এর মধ্যে 'বন্ধুবিয়োগে' 'প্রণয়ীর বিলাপ' শীর্ষক কবিতাটি নিতান্তই বিষাদমূলক। বিহারীলালের 'বন্ধু বিয়োগ' কাব্যের কোন কবিতার সঙ্গেই কৃষ্ণচন্দ্রের কবিতার সামঞ্জস্য নেই।

॥ ২ ॥

কবি বিহারীলালের 'প্রেমপ্রবাহিনী' দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ,—এটিতে পাঁচটি সর্গ আছে, আর সবগুলিরই আলোচ্য বিষয় প্রেম। 'পতন' নামক প্রথম সর্গে একটি ক্ষুদ্র কাহিনীর নাটকীয় উল্লেখ আছে। কাহিনীটির আংশিক বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায় কবির কোনো বিশিষ্ট বন্ধুর পারিবারিক কাহিনী এটি। বন্ধুপরিবারের পূর্বাপর বর্ণনায় পতনের যে রূপটি প্রকট হয়ে উঠেছে, সে সম্বন্ধে কিন্তু কৌতূহলী পাঠকের সামনে কবির তর্জনী উত্তোলিত—

ভিক্ষা চাই কৌতূহল করহে দমন,
জানিতে চেওনা তাই, ইহার কারণ।

যাই হোক, প্রেম সম্পর্কিত আলোচনার ভূমিকা হিসেবে কাহিনীটির সার্থকতা আছে। কবি স্বীকার করেছেন, এই বন্ধু ও তাঁর পত্নীর মধ্যে প্রেমের যে গভীর প্রকাশ এককালে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, তা অতুলনীয়। তাঁদের দাম্পত্য জীবনের প্রতি দৃষ্টি দিলে শুধু মাত্র তাঁদের প্রেম সম্পর্কে প্রত্যয়ই স্পষ্ট হোত না, সাধারণভাবে প্রেম সম্পর্কে একটা সশ্রদ্ধ মনোভাব গড়ে উঠতো। তাঁদের 'প্রেম তরুর ফল সব, ননীর পুতুল পুতুলী'-কে নিয়ে বন্ধুর সংসার ছিল শান্তি আর সৌন্দর্যের প্রতীক।

কিছুকাল পরে বন্ধু-গৃহে প্রবেশ করেই কবি যেন পরিবেশ-বৈপরীত্য অনুভব করলেন। মনে হোল, পূর্বের সে আনন্দ-নিকেতন তার আনন্দের সম্পদ হারিয়েছে।

আর সে ভবন সে ভবন নাই,
বিরাগ বিষাদময় যে দিকেতে চাই।

অনুভূতির তীক্ষ্ণতায় কবির কাছে গৃহপ্রবেশের মুহূর্তেই ধরা পড়ে

যায় যে পূর্বের ন্যায় এ গৃহের প্রাণস্পন্দন আপনার ছন্দে তালে প্রকাশিত হচ্ছে না। কবি অনুভব করেন—

হায়রে সাধের সুখ, তোমার সদ্ভাবে,
সব হয় আলো, কালো তোমার অভাবে।

কবি এরপর প্রথমে বন্ধু-পত্নীর সাক্ষাত পেয়েছেন। সেখানেও একটা ভাবান্তর অনায়াসেই কবির চোখে পড়ে। কবি এই আকস্মিক পারিবর্তনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কিছু পরিমাণে বিব্রত হন। 'মনের গৌরব' আর 'ভাবের সৌরভ' যাঁর কাছে মূল্যবান বস্তু বলেই স্বীকৃত ছিল, 'যাঁহারে দেখিলে হ'ত ভক্তির উদয়' তাঁর বেশবাস আর আকার প্রকার আজ সম্পূর্ণ নতুন মনে হোল কবির। 'শ্রী ছাঁদ রীতিনীতি চলন বলন' সবই যেন পরিবর্তিত হয়েছে আর এরই ফলে—

হর্ম্যের দুর্দশা হেরে তত কিছু নয়,
এর ভঙ্গী দেখে যত জন্মিল বিস্ময়।

যে বন্ধু-পত্নীর প্রসাধনহীন-রূপ কবির শ্রদ্ধা অর্জন করত, আজ তাঁরই সযত্ন প্রসাধিতরূপ ঘৃণার উদ্রেক করল। এর কারণ কিন্তু কবির কাছে অনাবিষ্কৃত রইল না। তিনি বুঝলেন, যে স্বর্গীয় প্রেমের স্পর্শে মানুষের অন্তর মনোহর রূপ ধারণ করে, তারই অভাবে আজ সবই আকর্ষণহীন। কবির মনে প্রশ্ন জাগে, পূর্বে যে প্রেমময়তার পরিচয় পেয়েছেন সে সব কি ছিল মিথ্যা অভিনয়?

হায়রে কোথায় সেই পতি-ভালোবাসা,
সাধিতে পতির প্রিয় অতৃপ্ত লালসা?
কেবল কি সে সকল বচন চাতুরী,
মধু মধু মধুমাখা মিছরীর ছুরী?

তবে কি সে প্রেম রচিত হয়েছিল দেহসম্ভোগের ভিত্তিভূমির ওপর? সম্ভোগ-শৈথিল্যে তারও মূল্যহানি ঘটেছে? এইসব নানা চিন্তা নিয়ে কবি গেলেন বন্ধু সন্দর্শনে। সেখানেও দেখা গেল সেই ভাব-

পরিবর্তন। সংসারের প্রতি বন্ধুর বিতৃষ্ণা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশিত হোল—

মনে হয় চলে যাই তেজিয়ে সকলে,
ব'সে থাকি গিয়ে কোন জনহীন স্থলে।
আর না দেখিতে হয় সংসারের মুখ,
আর না ভুগিতে হয় ডেকে আনা দুখ।

কিন্তু কেন? এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল না। বন্ধু অনুরোধ জানালেন, 'কৌতুহল করহে দমন।' তবে কবি এটুকু অনুমান করতে সমর্থ হলেন যে, বন্ধুর হৃদয় 'বনিতাবিরাগাঘাতে' কাতর।

প্রেমের সর্বগ্রাসী শক্তি সম্পর্কে কবি 'বিরাগ' নামক দ্বিতীয় সর্গে আলোচনা করেছেন। এখানে প্রতিপাদ্য বিষয় হোল এই যে, প্রেমময় অন্তরের অধিকারী যে মানুষ, তার কাছে এ পৃথিবী 'সুধার সাগর'। আবার কোন কারণে যদি সেই প্রেমময়তার অভাব ঘটে তখন 'সাধের স্বপন' ভেঙ্গে যায়, পৃথিবী নিরানন্দ মরুভূমিতে পরিণত হয়। যতদিন অন্তরে প্রেম আছে, স্নেহ ভালোবাসা প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তি-গুলি অটুট আছে, ততদিন পৃথিবী অপরূপ সৌন্দর্যনিকেতনরূপেই ধরা দেয়। প্রেমের 'মোহিনী মায়া' বহির্জগৎ আর অন্তর্জগতের মধ্যে এমনি এক হৃদ্য সম্পর্ক স্থাপন করে, যা ছিন্ন করা সহজ নয়। সে যেন 'জালে গাঁথা পাখী' তখন—

যে দিকে চাহিয়ে দেখি ভুলায় নয়ন,
মরি কিযে মনোহর সুখ ফুলবন।

কিন্তু পরিবর্তনশীল জগতে কোনো বস্তুই স্থায়ী নয়। পার্থিব প্রেমেরও তিরোধান ঘটে, আর তার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ 'প্রাণ ওষ্ঠাগত' হয়, আর মানুষ জীবন্মৃত হয়ে রূপরসহীন পৃথিবীতে কাল-যাপন করে।

রাগব্যাপ্তিতে যে সর্গের সূচনা, রাগহীনতায় তার পরিসমাপ্তি। সমাপ্তির দিকে দৃষ্টি রেখেই কবি সর্গের নামকরণ করেছেন 'বিরাগ'।

প্রেমের সর্বাত্মক শক্তি সম্পর্কে বিহারীলালের অনুভূতিটি এক্ষেত্রে বিশেষভাবেই লক্ষণীয়। কবি প্রেমকেই প্রশ্ন করেছেন—

হায়রে সাধের প্রেম কত খেলা খেল,
মানুষে কোথায় তুলে কোথা নিয়ে ফেল।

এই প্রেম যতদিন মানুষের অন্তরে তার সিংহাসনটিকে প্রতিষ্ঠিত রাখে ততদিন পৃথিবীর ধূলিকণাও তার কাছে মধুময়। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে তার প্রেমাঞ্জন-অঙ্কিত দৃষ্টি শুধু অবারিত সৌন্দর্যই দর্শন করে। প্রকৃতপক্ষে এ যে মানুষের আপন আনন্দময়তার বহিঃপ্রক্ষেপণ বা Selfprojection—সে বিষয়ে সন্দেহ নেই কবিরও। প্রেমের সর্বগ্রাসী শক্তির কথা কবি ভোলেন নি। কবির কাছে এ সত্য আজ আপন স্বরূপেই উদ্ভাসিত যে—

সূর্য্য বল, চন্দ্র বল, বল তারাগণ,
এরা নয় জগতের দীপ্তির কারণ,
প্রেমের প্রভায় বিশ্ব প্রকাশিত রয়,
তাইত প্রেমের প্রেমে মজেছে হৃদয়।

প্রেমস্বরূপ বর্ণনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে তৃতীয় সর্গেও। কিন্তু এখানে বর্ণনা আরও গভীরতা আর বৈচিত্র্য অর্জন করেছে। 'প্রীতিদেবী', 'বিজন কাননে' ক্রন্দনরতা। পৃথিবীও সেই সঙ্গে সৌন্দর্য বিরহিতা। এক্ষেত্রে পরিবর্তনশীলতার প্রশ্নটিই কবির মনে বড় হয়ে উঠেছে। এ জগতে স্থিতিশীল নয় কিছুই। নলিনীদলগত জলের মতই সবকিছু অস্থির। প্রেম-প্রীতি, স্নেহ-ভালবাসার ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম নেই। প্রেমময় অন্তর নিয়ে যে পৃথিবীকে মানুষ অসীম সৌন্দর্যের আকররূপে দেখেছে, প্রেমহীন অন্তরে সেই পৃথিবী কোনপ্রকার আকর্ষণই আর সৃষ্টি করতে পারছে না। রাগব্যাপ্তি আর রাগহীনতা বা বৈরাগ্যের মুহূর্তগুলিতে পৃথিবী সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী কী পরিমাণ বৈপরীত্য অর্জন করে, তার অপরূপ বর্ণনা এই সর্গে আছে। কয়েকটি ছত্র—

এই দেখি দিবাকর উদিত অম্বরে,
এই দেখি তমোরাশি গ্রাসে চরাচরে।
এই দেখি ফুলসব প্রফুল্ল হয়েছে,
এই দেখি শুকাইয়ে ঝরিয়ে পড়েছে।

যতদিন অন্তরে প্রেম আপন উদারতায় প্রতিষ্ঠিত ছিল, ততদিন—

নিত্য নিত্য নব নব করি নিরীক্ষণ,
বিস্ময় আনন্দরসে হইতে মগন,
ঝরনার জল আর পাদপের ফল,
শাখীর স্নিগ্ধছায়া, স্নিগ্ধ শিলাতল,
নানা জাতি বনফুল, পাখীদের গান,
সুমন্দ সুগন্ধ বায়ু জুড়াইত প্রাণ।

এ সত্য বিতর্কের বস্তু নয় যে—

প্রেমের বিচিত্রভাব স্নেহ সুধাময়,
স্বর্গভোগ হয় যদি চিরদিন রয়।

কবির কাছে প্রেমই জগতের সারবস্তু. 'তুমি প্রাণ, তুমি মন, তুমি ধ্যান জ্ঞান' কিন্তু এই প্রেমিক জীবনে যখন আঘাত আসে, জীবন-মন্থনজাত ব্যথা বেদনাব হলাহল যখন আকণ্ঠ পান করতে হয় কবিকে, অভিমানে তিনি ঘোষণা করেন—

স্থিরতর প্রতিজ্ঞা করেছে নিজ মনে,
দেখিবে না প্রেমমুখ আর এ জীবনে।

প্রেমের ফলশ্রুতি যদি বিষাদেই ঘটে, তবে একথা অবশ্যই বলতে পারেন—

জলভ্রমে মৃগ আর যাইবে না ছুটে,
তপ্ত বালুকায় আর পড়িবে না লুটে।

কিন্তু এ ধরনের মোহভঙ্গ ঘটে মানব-মানবীর প্রতি প্রেমময়তার পঞ্চম অঙ্কে। জীবন-নাট্যের প্রথম অঙ্কে যে কূলপ্লাবী প্রেমতরঙ্গ কবির অন্তরকে উদ্বেলিত করে তুলেছিল, পঞ্চম অঙ্কের শেষ দৃশ্যে এসে তার

স্পর্শ মাত্রও অনুভূত হয় না। তবু বিশ্ব-পৃথিবীতে প্রেমের সন্ধান করে চলেন কবি। সংসারে মানুষের প্রেম-প্রবণতায় বিশ্বাস হারিয়ে হ্যামলেটের মত ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন,—তবু তাঁর রোম্যাণ্টিক চরিত্র অক্ষুণ্ণ থাকে। বিশ্বে প্রেম-সন্ধান থাকে অব্যাহত। বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে, প্রেমের ক্ষেত্রে মানুষ শুধু চঞ্চলই নয়, নিষ্ঠুরও বটে।

চপলমতি মানব-মানবীর মধ্যে এ পরিবর্তন স্বাভাবিক হলেও, বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে কিন্তু চাপল্য নেই। কবি তাই ঘোষণা করেন—

প্রকৃতি পবিত্র প্রেমে হইয়ে মগন,
হেরিবে হৃদয়ে প্রেমময় সনাতন।
* * * *
প্রকৃতির পুত্র সব হবে অনুকূল,
আকাশের তারা আর কাননের ফুল ;
ফুলগুলি ঝ'রে ঝ'রে পড়িবে মাথায়,
তারকা কিরণ দিবে চোকের পাতায়।

চতুর্থ সর্গে প্রকৃতির বিভিন্ন দিকে কবির প্রেম অন্বেষণ। প্রেম কি প্রকৃতির নির্জন-স্নিগ্ধ রূপরাশির মধ্যে ?

যেথায় শান্তির মূর্তি সর্বত্র প্রকাশ,
সেই স্থানে তুমি কিহে করিতেছ বাস ?

কবির দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় প্রকৃতির শান্ত পরিবেশে যোগ-সমাহিত যোগিবৃন্দের মুখমণ্ডলে, প্রশ্ন করেন—

তাঁহাদের অন্তরের আনন্দের মাঝে,
আলো কবি তোমারি কি মুরতি বিরাজে ?

না কি প্রেমের গুপ্তরাজ্য পাখীর কলকাকলীতে, সরোবর-বক্ষে ক্রীড়ারত সমীরণে, গোলাপের অতুলনীয় শোভা-সৌরভে, চন্দ্রের সুধা-সৌন্দর্যে ? এমনি করে প্রশ্ন করতে করতে কবি এসেছেন কাব্যের জগতে। সে জগতের বর্ণনায় মেতেছেন

কবিদের সুধাময়ী সরলা লেখনী,
জগতের মনোহরা রতনের খনি।
যখন যে পথে যায়, সেই পথ আলো
যখন সে কথা কয় তাই লাগে ভালো।

এরপরে আবার সেই প্রশ্ন—

সেই বিশ্ব বিনোদিনী লেখনী-অধরে,
সুধার সাগরে বুঝি আছ বাস করে?

কাব্যের প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই বিহারীলাল মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূত'-এর কথা স্মরণ করেছেন। 'মেঘদূত'-এর মধ্যে 'হিমালয় শৃঙ্গে কুবেরের অলকায়' যেখানে নানা সৌন্দর্যের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে, প্রেম কি সেখানেই অবস্থিত? যেখানে—

প্রণয় কলহ ভিন্ন দ্বন্দ্ব নাই আর,
প্রেম-অশ্রু ভিন্ন নাহি বহে অশ্রুধার।

কবির প্রশ্ন—

তথায় কি প্রেম সেই আমোদেতে মিশে,
বসি বসি হাসি খেলি করিছ হরিষে?

এরপরে কবি স্মরণ করেছেন স্বর্গের কথা। সেখানে 'দেবেন্দ্রের ক্রীড়া উপবনে—'

যথায় অপ্সরী নারী অমরের সনে,
হাসে খেলে নাচে গায় আপনার মনে।
সেইস্থান তোমার কি মনের মতন?
অপ্সরীর পাছু পাছু কর কি ভ্রমণ?

নাকি প্রকৃত প্রেম এমন কোনো অলৌকিক জগতেই আছে, যেখানে কালের গতি স্তব্ধ; যেখানে বিরাগ, কপটতা, পাপ অকল্পনীয়; যে জগতে পবিত্রতা, বিনয় আর ধার্মিকতাই নিত্যপ্রতিষ্ঠিত আর যে জগতে,

বরফের মত স্বচ্ছ প্রণয়ের ভাব
ইন্দ্রিয়ের বিন্দু তাহে নাহি আবির্ভাব।

এই জগতে তাহলে সারাজীবন ধরে আমরা তার 'বৃথা করি অন্বেষণ'?

এই চতুর্থ সর্গাশ্রিত অন্বেষণের নিবৃত্তি ঘটেছে পঞ্চম সর্গে। এখানে এসে কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—

কে বলেগো প্রেম নাই এই ধরাতলে
কেমনে জীবিত তবে রয়েছি সকলে?

কবি স্বীকার করেছেন যে,

প্রথমে যখন বুদ্ধি ছিল অভিভূত,
হ'ত না তোমার কোন ভাব অনুভূত।

এখন,—

কিন্তু জলে, স্থলে, শূন্যে যে দিকেতে চাই,
বিরাজিত তব ছবি দেখিবারে পাই।

কবি পৃথিবীর রূপবৈচিত্র্যের মধ্যে প্রেম ও প্রীতি-বৈচিত্র্যের সন্ধান পেয়েছেন এবার। তিনি এই যুক্তিসিদ্ধ প্রত্যয়ে উপনীত হয়েছেন যে, দুঃখ-বেদনায় ক্লিষ্ট জীবনধারণ মানুষের পক্ষে কখনোই সম্ভব হ'ত না, যদি সে প্রেমের আশ্রয়ে দাঁড়িয়ে প্রাণ জুড়াবার সুযোগ এই পৃথিবীতে না পেত।

পঞ্চম সর্গের প্রথমার্ধে ও দ্বিতীয়ার্ধে স্বদেশ-চিন্তা কবিকে বিচলিত করেছে। তথাকথিত সভ্যতার স্পর্শরহিত আদিম অধিবাসীরাও এককালে যে এই ভারতবর্ষে বসবাস করত, কবি সে কথা স্মরণ করে তাদের জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন,—অতীতের বীর, প্রজানুরঞ্জক রাজা, মহাকবি এবং অন্যান্য জ্ঞানী-গুণিগণের জন্যও।

'প্রেম প্রবাহিনী' কাব্যগ্রন্থের এই পঞ্চম সর্গটিতে কবির আত্ম-বিশ্লেষণ লক্ষণীয়। বিভিন্ন প্রকার ভাবের আবির্ভাব তিরোভাবের পর কবি যে 'ব্রহ্মজ্ঞান' বা সত্যজ্ঞানের অধিকারী হতে পেরেছেন, তার স্বীকৃতি আছে এই সর্গে। কিন্তু বুদ্ধির এই নতুন চেতনার সঙ্গে হৃদয়ের অনুভূতিপ্রবণতার কোন বিরোধ ঘটেনি। বিশেষভাবে

লক্ষণীয় এই অবস্থাটিই। মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের গুণাবলী সমপরিমাণে যদি বর্ধিত হয়, তাহলেই মানুষ প্রকৃত অর্থে শক্তিমান হয়ে ওঠে; এবং শক্তিমান কবির জীবনে এই তুই গুণের যে সার্থক সমন্বয় প্রয়োজন তা অস্বীকার করার জো নেই। আনন্দস্বরূপকে 'হৃদা মনীষা মনসা' গ্রহণ করতে হয়। কবি তাই 'কল্পনা সুন্দরী'কে সম্বোধন করে বলেছেন—

যদিও রাখিনা আমি ইন্দ্রপদে আশ,
মাগি নাক পারত্রিক শূন্য সহবাস,
কিন্তু কবি হ'তে সদা জাগিছে বাসনা,
তোমা বিনে কে ঘটাবে এ হেন ঘটনা?

এরপর পুনরায় পূর্বালোচিত কথারই পুনরাবৃত্তি করে কবি বলেছেন যে, আবিলতাপূর্ণ নাগর-সভ্যতার লীলাকেন্দ্র শহরে,—প্রেমের কোনো প্রকার স্পর্শই অনুভূত হয় না; প্রেমের অকৃপণ প্রকাশ বিশ্বপ্রকৃতিতে। রামধনুর বর্ণবিন্যাসের মধ্যে চন্দ্রালোকিত রাত্রিতে এই প্রেমেরই অনলঙ্কৃত প্রকাশ দেখা যায়। কবিও দেখেছেন—তার প্রকাশ প্রান্তর-লগ্ন তৃণরাশির মৃদুহিল্লোলে, সরোবরের বুকে, চন্দ্রালোকিত তরঙ্গভঙ্গে আর সুরধুনীর বিচিত্র কলকল সঙ্গীতে। বহিঃপ্রকৃতি আর কবির অন্তঃপ্রকৃতি মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে।

ভাবতরঙ্গে উদ্বেলিত হয়ে কবি একসময় মানুষের মরণশীলতার কথা চিন্তা করেন, চিন্তা করেন,—জন্ম-মৃত্যুর নির্দিষ্ট গণ্ডীতে আবদ্ধ নিজের জীবনের কথা। ভাবেন—'একদিন এই আমি, আমি নাহি রব'। এত খুবই স্বাভাবিক। দৈহিক মৃত্যুতে কবির ক্ষোভ নেই, ক্ষোভ শুধু তাঁর স্মৃতি বিলুপ্ত হবে এই চিন্তায়। যেদিন কবি এই মর্ত্যকায়ায় থাকবেন না, বন্ধুরা আর সমালোচকরা তাঁর সম্বন্ধে কি বলবেন?

কবি Gray যেমন করে তাঁর Elegyতে নিজের কথা বলেছিলেন, কবি বিহারীলাল তেমনি করেই সবিনয়ে বললেন—

এমন কি আছে গুণ, যাহার কারণ
ভাবুকে কখন তবু করিবে স্মরণ?
মিত্রেরা দু দিন হন্দ সাধক-স্বরূপ,
বলিবেন আমার প্রসঙ্গে এইরূপ,—

এর পরেই আত্মবিশ্লেষণ আর আত্মচিত্রণ। এ সম্পর্কে এখানে এইটুকু বলাই বোধ হয় যথেষ্ট যে বিহারীলালের জীবনী যেটুকু বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত আকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে তার সঙ্গে এই আত্ম-চিত্রণের সামঞ্জস্য আছে। কবিতার মধ্যে সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয়মূলক Epitaph রচনা করে গিয়েছিলেন কবি Gray তাঁর Elegy-র মধ্যে। বিহারীলালের কবিতার উপযুক্ত অংশের সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে। অবশ্য সমাধিলিপি অনুরূপভাবে রচনা করেছিলেন। হরেন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত বিহারীলালের এইসব অংশের মধ্যে Shelley-র 'high talk with the departed dead' আর Hamlet-এর Suicide Soliloquy-র ছায়া লক্ষ্য করেছেন।[১] আপনার কবিকর্ম সম্পর্কে চিন্তা করতে গিয়ে তথাকথিত সমালোচকদের সম্পর্কে কবির সরস মন্তব্যটি কিন্তু স্মরণীয়। তিনি বলেছেন—

পরের পাতড়াচাড়া, আপনার নাই,
মতামতকর্তা তাঁরা বাঙ্গালার চাঁই।
মন কভু ধায় নাই কবিত্বের পথে
কাবরা চলুক তবু তাঁহাদের মতে।

এই সহজ সত্যটি কবি বিস্মৃত নন যে, সমালোচনাও সৃষ্টি। প্রকৃত সমালোচকরা তাই প্রতিভাবান স্রষ্টারূপেই স্বীকৃত। সমকালীন দুর্বল এবং আক্রোশমূলক সমালোচনার ধারাকে নিন্দা করে কবি এই আশা প্রকাশ করেছেন যে, মৃত্যুতেই তাঁর কবি-জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে না। তিনি মহাকালের 'সোনার তরী'তে যে কিছু সোনার ফসল তুলে দিয়ে যাচ্ছেন, সেই সোনালী ফসলের মধ্যেই তাঁর স্মৃতি অক্ষয় হয়ে থাকবে। কবির ভাষায়—

মরিতে তিলার্দ্ধ মম ভয় নাহি করে,
ডুবিতে না মনে খেদ বিস্মৃতি সাগরে।
রেখে যাব জগতে এমন কোন ধন,
নারিবে করিতে লোকে শীঘ্র অযতন।

সর্গান্তে আবার প্রেমময়তায় প্রত্যাবর্তন ঘটেছে কবির। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড প্রেমময় আর সেই প্রেমময়তার প্রভাবে কবির অন্তরও প্রেমাবিষ্ট। এই চরম অবস্থার চিত্রণে 'প্রেমপ্রবাহিনী' কাব্যের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

'প্রেমপ্রবাহিনী' কাব্যের মধ্যে, বিশেষ করে তৃতীয় ও পঞ্চম সর্গের মধ্যে ডঃ উজ্জ্বল কুমার মজুমদার Wordsworth এর Tintern Abbey[২] আর Shelley-র Alastor কবিতার ছায়া[৩] লক্ষ্য করেছেন। Wordsworth-এর প্রকৃতিসম্ভোগে তৃপ্তি ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে। শেষ পর্যন্ত তিনি জীবন সত্য খুঁজে পেয়েছিলেন,—প্রকৃতির মধ্যে, যেখানে স্রষ্টা আর দ্রষ্টার মিলনক্ষেত্র রচিত হয়।

বিহারীলালও প্রকৃতিকে দেখেছেন সেই দৃষ্টিতে—

এঁকে দিল বিশ্বময় তোমার স্বরূপ,
আমার চক্ষেতে তাহা ধরিল এরূপ,
কি স্থলে জলে শূন্যে যেদিকেই চাই,
বিরাজিত তব ছবি দেখিবারে পাই। (পঞ্চম সর্গ)

পঞ্চম সর্গের উপসংহারে কবি যখন আত্মবিভোরভাবে বলে ওঠেন—

মন যেন মজিতেছে অমৃত সাগরে,
দেহ যেন ফাটিতেছে সমাবেগ ভরে।
প্রাণ যেন উড়িতেছে সেইদিক পানে,
যথার্থ তৃপ্তির স্থান আছে যেইস্থানে।
অহো, অহো, আহা, আহা কি ভাগ্যোদয়,
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আজি প্রেমানন্দময়।

Wordsworth-এর একই অনুভূতির কথা শুনি—

> We are laid asleep
> In body, and become a living soul,
> While with an eye made quiet by the power
> Of harmony, and the deep power of joy,
> We see into the life of things.
> (Tintern Abbey, L. 95-99)

বিহারীলালের প্রেমচেতনা সম্পর্কে দুটি বিশেষ কথা এই কাব্যের আলোচনাপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এঁর প্রেমচেতনা তীক্ষ্ণ নীতি-বোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ; তার বিশুদ্ধি,—প্রশ্নাতীত স্তরে উন্নীত। নারীর ক্ষেত্রে সে প্রেম একান্তই স্বকীয়া, বিবাহিত জীবনে আপন পত্নীকে আশ্রয় করেই তার উদ্ভব আর বিকাশ। এই প্রেম ধীরে ধীরে ব্যাপকতর হয়ে সমগ্র মানবসমাজকে আপন সান্নিধ্যে আকর্ষণ করেছে বটে, তার কেন্দ্রবিন্দু থেকে কখনও তিনি বিচ্যুত হননি। প্রিয়তমা পত্নীর প্রেমময় উৎসে বার বার তাঁর প্রত্যাবর্তন ঘটেছে। কিন্তু এ তথ্যটিও অবশ্য স্মরণীয় যে, এই প্রেম পত্নীআশ্রয়ী হলেও দেহসর্বস্ব নয়, ভোগ-লোলুপ নয়। কবি প্রশ্ন করেছেন

> যৌবনে সম্ভোগ জন্যে বিবাহিতে নয়,
> প্রেম করে এই বই আর কিছু নয় ?
> মনের সম্পর্ক তার কিছুমাত্র নাই ?
> তার সুখ আশা কিরে শুধু আমোদ-নাই ? (প্রথম সর্গ)

কবির প্রেমচেতনার এই বৈশিষ্ট্যটি বারে বারেই স্মরণ করতে হবে পরবর্তী কাব্যগুলির আলোচনাপ্রসঙ্গে।

দ্বিতীয় যে বৈশিষ্ট্যটি উল্লেখযোগ্য তা হোল, এই প্রেমচেতনার সঙ্গে প্রকৃতিকেন্দ্রিক সৌন্দর্যচেতনার নিগূঢ় সম্পর্ক। তিনি বলেছেন—

> হৃদয়ে বিরাজ করে প্রেমের প্রতিমা,
> শ্রবণে সঞ্চরে সদা প্রেমের মহিমা।
> পূর্ণিমার মনোহর পূর্ণ সুধাকরে,
> প্রেমের লাবণ্য যেন আছে আলো ক'রে। (দ্বিতীয় সর্গ)

আসলে 'প্রেমের প্রভায় বিশ্ব প্রকাশিত হয়' এই সত্যটিকে কবি ঘোষণা করেছেন নানাভাবে। প্রকৃতিকে 'প্রীতিদেবী' বলে সম্বোধন করে তৃতীয় সর্গে যে কবিতাটি রচনা করেছেন, তা মূলত প্রেমচেতনার সঙ্গে নিসর্গ-চেতনার এই অপরিবর্তনীয় সম্পর্কটিকেই প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে। এই 'প্রীতিদেবী' প্রকৃতপক্ষে সৌন্দর্যেরই দেবী ; কিন্তু তার সৌন্দর্যের স্বর্গীয়-সুষমা উপভোগের জন্য হৃদয়ে আদর্শায়িত প্রেমের পবিত্র প্রদীপটিকে প্রজ্জ্বলিত রাখতে হয়। প্রেমচেতনা ও সৌন্দর্যচেতনার এই বৈশিষ্ট্য দুটি বিশেষ ভাবেই স্মরণীয়।

'বন্ধুবিয়োগ' কাব্যের মত এখানেও চৌদ্দমাত্রার পয়ার রীতি অনুসরণ করেছেন কবি। আগেই বলেছি, এর পোষণ শক্তিকে কাজে লাগিয়ে কবি যুক্তব্যঞ্জনধ্বনির বৈচিত্র্য আনতে চেয়েছেন এগুলিতে প্রাকৃত কথ্যভাষার ব্যবহার এ কাব্যগ্রন্থে অত্যন্ত সীমিত। প্রেমহীন কুৎসিৎ পৃথিবীর বর্ণনায় কবি অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। চলভাষার শব্দভাণ্ডার থেকে আহৃত এমন সব শব্দ কবি ব্যবহার করেছেন যা পাঠ করা মাত্র উল্লিখিত ক্ষেত্রের কদাকার চিত্রটি মানসপটে পরম্পরাক্রমে চিত্রিত হয়ে যায়। প্রাকৃত বাংলার অমার্জিত ভাষা এই অমসৃণ বীভৎস চিত্রাঙ্কনে অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে।

বিহারীলালের কাব্যগ্রন্থগুলি থেকে পারম্পর্যহীন দু'চার ছত্র উদ্ধৃত করে তা যে কবিতাবাচ্য নয়, এইটি প্রমাণ করার জন্য বহু সমালোচক আগ্রহী। 'প্রেমপ্রবাহিনী' কাব্য থেকে দুটি ছত্র উদ্ধৃত করে কোন সমালোচক বলেছেন ওগুলো 'অন্তর্দাহীন', এমন কি 'আগের ছত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেখলেও তেমনি নিরুত্তাপ মনে হয়'।* কোনো দীর্ঘ কবিতার অংশাবশেষ উদ্ধৃত করে এই ভাবে কিছু বলা খুবই সহজ। বিহারীলালের প্রথম যুগের কাব্যাংশ উল্লেখ করে বিরূপ সমালোচনা করা সহজতর। 'বন্ধুবিয়োগ' এবং 'প্রেমপ্রবাহিনী'—কাব্য দুটির মধ্যে বহুক্ষেত্রে দুর্বলতা আছে নিঃসন্দেহেই।

কাব্যটিতে ভাবসমুন্নতি সর্বত্র রক্ষিত হয়নি, আর প্রাকৃত ভাষা এখনো কখনো বক্তব্যকে বাচ্যাতীতের ব্যঞ্জনাদান করতে পারেনি, কিন্তু ঐ অংশগুলিকে আশ্রয় করে কবির সামর্থ্য বিচার বা কাব্যের রসবিচার সঙ্গত নয়।

পাঁচসর্গে বিভক্ত এই কাব্যগ্রন্থটির প্রথম সর্গেই একটি কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। সেই কাহিনীকে আশ্রয় করে কবির যে প্রেমচিন্তার উদ্ভব ঘটেছে তা-ই বিবিধরূপে অন্য চারটি সর্গে প্রকাশিত। 'বন্ধুবিয়োগে'র মধ্যে যে পরিমাণ বস্তুনিষ্ঠা ছিল 'প্রেমপ্রবাহিনী'র মধ্যে, তা বহুল পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। এর ফলে সমান্তরালভাবে অমার্জিত তীক্ষ্ণ প্রাকৃত-ভাষার ব্যবহারও হ্রাস পেতে শুরু করেছে। কবিকল্পনাও আত্মমগ্নভাবে জগতের সুষমায় অভিনিবিষ্ট হতে শুরু করেছে।

—উল্লেখপঞ্জী—

(১) Harendra Mohan Dasgupta: Studies in Western Influence on 19th Century Bengali Poetry. 1969 Edition. P.185

(২) উজ্জ্বল কুমার মজুমদার: বাংলা কাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব, ১ম সংস্করণ পৃঃ ১৫৭।

(৩) ঐ ঐ পৃঃ ১৫৯

(৪) হরপ্রসাদ মিত্র: কবিতার বিচিত্র কথা, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ১৩৮

॥ ৩ ॥

'সঙ্গীত শতক' এই নামকরণের মধ্যেই কবিকর্মের চরিত্রটি স্পষ্ট-ভাবে প্রকাশিত। এই সঙ্গীতগুলির প্রত্যেকটির শিরোভাগে রাগ-রাগিণী ও তালমানের নির্দেশ আছে। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, বিহারী-লালের জীবনীলেখকেরা তাঁর সঙ্গীত-প্রীতির উল্লেখ করেছেন। 'সঙ্গীত শতক'কে একত্রে 'প্রেমমূলক' কবিতা হিসেবে কেউ কেউ উল্লেখ করলেও এগুলির মধ্যে ভাববিভিন্নতার প্রকাশ দুর্লক্ষ্য নয়।

বিহারীলালের 'সঙ্গীত শতক' প্রকৃতপক্ষে তাঁর বহুমুখী রোমান্টিক চিন্তার সার্থক সাক্ষ্য বহন করছে। জগৎ ও জীবনের বিভিন্ন ভাব ও বস্তুকে আশ্রয় করে কবির ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য অভিজ্ঞতা কীভাবে কবির বাসনালোকে গিয়ে সত্যান্বিত হয়ে উঠেছে—তার সার্থক প্রকাশ অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বল্পাক্ষর এই কবিতাগুলির মধ্যে। কবির সত্যোপ-লব্ধির প্রকাশ কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রৌঢ়োক্তির মর্যাদা যে অনায়াসেই দাবী করতে পারে, বিশ্লেষণপ্রসঙ্গে সেটিও আমরা লক্ষ্য করব।

'সঙ্গীত শতক'-এর উপসংহার-মূলক কবিতাটিকে গ্রহণ করলে, কবিতার মোটসংখ্যা দাঁড়ায় একশ একটি। এর প্রথম কবিতাটিতে সঙ্গীতাবস্থার গুণবত্তা আলোচিত হয়েছে। জাগতিক শোকতাপ নিরসনে সঙ্গীতের অতুলনীয় অবদানের কথা প্রকাশ করে কবি বলেছেন যে, সঙ্গীতশ্রবণ অরসিককেও রসবেত্তা করে তোলে। সঙ্গীত মূর্তিমতী সরস্বতী। এই ভাবের ক্রমিকতা দ্বিতীয় কবিতায় ভিন্ন-চিন্তাশ্রয়ী হয়ে দেখা দিয়েছে। এখানে কবি বলেছেন যে, বিশ্বসৌন্দর্য দর্শন আর পিতা পত্নী প্রভৃতি প্রিয় পরিজনের স্নেহ প্রেম লাভ মানবজীবনকে অর্থবান করে তোলে। প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন, তিনি এই সব আনন্দলাভের চেষ্টাই আজীবন করেছেন, ধনসম্পদের কামনাকে সযত্নে পরিহার করে।

'সঙ্গীত শতক'-এর বহুকবিতাই প্রকৃতিপ্রেমমূলক। প্রকৃতি কখনো অপূর্ব নারীমূর্তিতে, কখনো তার স্বাভাবিক রূপবিভিন্নতায়—কবি-কল্পনাকে উদ্বেলিত করেছে। সমুদ্র ও পর্বত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত, ঝড় ও চন্দ্রকিরণোজ্জ্বল রাত্রি, মেঘমেদুর সন্ধ্যা—'নিস্তব্ধ গম্ভীর ঘোর নিবিড় গহন' বন প্রভৃতিকে আশ্রয় করে বর্ণনামূলক কবিতাগুলি স্বল্পায়তনের মধ্যেই স্বয়ংসম্পূর্ণ। একটি দীর্ঘ প্রকৃতিপ্রেমমূলক কবিতা (৯৯) সঙ্গীত হিসেবে সংকলিত। এই কবিতাটির প্রথম স্তবক বিহারীলালের ভাবুক সমালোচক উদ্ধৃত করে তাঁর প্রকৃতিপ্রেমিকতার অকৃত্রিম রূপটি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। স্তবকটি

প্রণয় করেছি আমি
প্রকৃতি রমণী সনে,
যাহার লাবণ্য ছটা
মোহিত করেছে মনে

(৯৯)-এর পরের স্তবকের রমণী মূর্তিটি প্রকৃতিরই প্রতীক। সেই প্রকৃতি-রমণীর ইঙ্গিত-ধর্মী সঙ্কেত রূপবর্ণনাটি লক্ষনীয়।

মুখ— — —পূর্ণ সুধাকর,
কেশজাল————জলধর
অধর— ——পল্লব নব
রঞ্জিত যেন রঞ্জনে।

—এই অসীম সৌন্দর্যময়ী প্রকৃতির সঙ্গে কবির সম্পর্কটি এমন গভীর যে, তারপরই কবি বলেছেন—

যখন যথায় যাই
প্রকৃতিতো ছাড়া নাই,
ছায়া সমা প্রিয়তমা
সদা আছে সনে সনে।

কবির প্রকৃতি-প্রাণতার পরিচয় 'সঙ্গীত শতক'-এর প্রথম দিকে

কবিতা থেকেই পাওয়া যায়। প্রথমেই সঙ্গীতের সর্বব্যাপী প্রভাব সম্পর্কে উল্লেখ করে কবি বলতে শুরু করেছেন 'সদা আমি আছি সুখী'। এ সুখ প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য উপভোগের মধ্যে আর প্রিয় পরিজনের অপরিমেয় প্রেমপ্রীতিলাভের মধ্যে কবি অনুভব করেছেন।

প্রসঙ্গত লক্ষণীয় যে, কবি এখানে 'অনুরাগী প্রমদার অমায়িক ব্যবহার' আর 'কৃপানয় জনকের স্নেহ ছায়াবলম্বন' এই দুটির উল্লেখ করেছেন অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই। বাল্যে মাতৃহারা কবি মাতার অভাব সম্পর্কে তাঁর অন্তরের বেদনা বোধটিকেও বহু কবিতায় বহুভাবে ব্যক্ত করেছেন। আমরা একটু সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করলে দেখব যে, কবির এই বক্তব্য তাঁর কবিজীবনের শেষ অধ্যায় পর্যান্ত অবিকৃতই থেকেছে। কবিপত্নীর রূপটি কিভাবে একাধিক ভাবসম্মিলনে বৈশিষ্ট্য পেয়েছে সেটিও বিশেষ যত্ন সহকারে লক্ষ্য করা প্রয়োজন।

'সঙ্গীত শতক'-এর মূলভাব মানবপ্রেম ও প্রকৃতিপ্রীতি। এই মানব প্রেম যেমনি আপন পরিবারের আশ্রয়ে বর্ধিত হয়ে উঠেছে, প্রকৃতি-প্রীতিও প্রাথমিক পর্য্যায়ে তেমনি দৃষ্টি শ্রুতিগ্রাহ্য পরিধির মধ্যেই সীমিত থেকেছে।

কবির অন্তরে প্রেমের বিকাশ নতুন পথের সন্ধান পেতে চেয়েছে ঠিক এর পরেই। সেখানে তিনি বলেছেন—

কোথায় রয়েছ প্রেম
দাও দরশন।
কাতর হয়েছি আমি
কোরে অন্বেষণ। (৪)

এই 'অন্বেষণই' বড় কথা। রোম্যান্টিক কবিজীবনে এই অন্বেষণের পরিসমাপ্তি নেই। কবির অন্তরে প্রেমের যে চিন্ময়রূপ সৃজিত হয়েছে, তার অনুসন্ধানেই ব্রতী তিনি। সে চিন্ময়রূপ দর্শনে তৃপ্তি নেই, বাস্তব জগতে সে অপরূপের প্রকাশ নেই, তাই রোম্যান্টিক কবির অন্বেষণ ব্রতেরও উদ্‌যাপন নেই। কবি যথাকথিত যে প্রেমের প্রকাশ

সংসারে আর সমাজে লক্ষ্য করছেন, তাতে তাঁর অন্তরতৃপ্ত নয়। আদর্শ প্রেমের প্রতিষ্ঠা তিনি করলেন 'সারল্যের স্বচ্ছ জলে' আর 'প্রত্যয়ের শতদলে', কিন্তু তার উৎস সন্ধান করতে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলেন কবিপ্রিয়ার ওপর।

প্রাণ প্রেয়সি আমার
হৃদয় ভুষণ,
কত যতনের হার।
হেরিলে তব বদন,
যেন পাই ত্রিভুবন,
অন্তরে উথলে ওঠে
আনন্দ অপার। (৬)

অন্যদিকে প্রকৃতির সঙ্গেও কবির সমপ্রাণতা। প্রকৃতিপ্রীতিতে তাঁর অন্তর পরিপূর্ণ। অজস্র সঙ্গীতে সেই প্রীতি বর্ণিত হ'ল।

সঙ্গে সঙ্গে এই অনুভূতিও প্রকাশ হোল যে, প্রেমময়ী প্রেয়সীর সান্নিধ্য লাভ করলে কবি ত্রিভুবনের অধিপতি হবার আনন্দ পান। এই কথাই 'সারদামঙ্গল'-এর শেষে 'শান্তিগীতি'র মধ্যে কবি বলেছেন—

মরুময় ধরাতল
তুমি শুভ্র শতদল
করিতেছ ঢল ঢল সমুখে আমার।
ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে রাখি,
ভোর হয়ে বসে থাকি,
নয়ন পরান ভোরে দেখি অনিবার
তোমায়, দেখি অনিবার
তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী
আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি
হোগ্‌গে এ বসুমতী যার খুসি তার।

আনন্দের কেন্দ্রে বিষাদ, মিলনের পূর্ণতার মধ্যেই বিরহের সৃষ্টি-

এ সত্য প্রশ্নাতীত। তার সঙ্গে রোম্যান্টিক বিষাদের কোন বিরোধ নেই। আনন্দ বা মিলনের রূপটি রোম্যান্টিক কবির কল্পনায় এমন এক উচ্চ আদর্শের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত থাকে, যার প্রাপ্তি বাস্তব জগতে সম্ভব নয়। সাধ আর সাধ্যের—এই বিবাদকে কেন্দ্র করেই একটা বিষাদ রোম্যান্টিক-কাব্যের ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে পড়ে।

বিহারীলালের 'সঙ্গীত শতক'-এর সঙ্গীতগুলিতে আনন্দ বেদনা, মিলন বিরহের এই সুর ওতপ্রোত হয়ে আছে।

কবিপত্নী কোনো কারণে বিষণ্ণ, (৮) তাই কবি তাঁকে আহ্বান করেন প্রকৃতির উদার সৌন্দর্যের মধ্যে। বলেন—

ওই দেখ শস্যভূমি
কিবা শোভা পায়।
তেজে জল যেন স্থলে
তরঙ্গ গড়ায়।
নূতন মঞ্জরী ভরে
আছে ঘাড় হেঁট কোরে
নতমুখী নববধূ
সরমের দায়। (১১)

Wordsworth প্রকৃতির মধ্যে যে সান্ত্বনার সন্ধান পেয়েছিলেন, যাকে কেউ কেউ healing effect বলে অভিহিত করেছেন, এখানে বিহারীলাল তারই সন্ধানী। প্রথম পর্যায়েই প্রকৃতি কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভূমির বিষাদের মধ্যেই ফুরিয়ে গেল না। সে সমপ্রাণ দ্রষ্টার জন্য বিপুল আশ্বাস বহন করে নিয়ে এলো। ইংরেজী কবির সঙ্গে এ পার্থক্যটি আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না।

উক্ত সঙ্গীতটিতে কবি যে বাক্-প্রতিমা নির্মাণ করেছেন, সেটি দৃষ্টি এড়ায় না। হিল্লোলিত শস্যক্ষেত্রে সমুদ্রতরঙ্গ দর্শন করলেন কবি। আবার এই শস্যশীর্ষের ভারে অবনতমুখী শস্যে 'লজ্জানত-মুখী' নববধূর চিত্র দর্শন করলেন। বলাবাহুল্য দুটিই সুন্দর।

কিন্তু বার বার সেই রোম্যান্টিক বিষাদ ছায়াপাত ঘটায়। প্রিয়া ও প্রকৃতির রূপে মুগ্ধ কবি বলেন—

হেরে প্রিয় চন্দ্রানন
যখন মোহিত মন,
তখনি অমনি হৃদে
জাগে অদর্শন ভয়। (১২)

এর সঙ্গে 'দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া'র কোন পার্থক্য নেই। রোম্যান্টিকতার প্রাণধর্মই এই। এই ধর্মই প্রেমিক-প্রেমিকাকে 'মুখোমুখী' রেখেও 'দুখে দুখী' করে তোলে।

কবির রোম্যান্টিক প্রাণ-ধর্ম যেমনি সুস্পষ্ট, তেমনি সুস্পষ্ট তাঁর বাস্তব সচেতনতা। এখন থেকেই কবির এই বিশেষ গুণটির পরিচয় নেওয়ার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। যিনি আবেগবাহুল্যের জন্য সুচিহ্নিত, তাঁর মধ্যে বাস্তবচেতনার সন্ধান বহু পাঠকের কাছেই কৌতূহলজনক মনে হবে কবি যখন প্রেমের কথা ভাবতে গিয়ে তাকেই প্রশ্ন করেন—

কপটতা-ক্রূরমতি,
বিষময়ী, বক্রগতি
দংশিয়ে তোমারে বুঝি
করেছে নিধন? (৪)

বা নিজেই ভাবেন,

বটে মানুষের মন
চায় নব আস্বাদন
তা বোলে প্রণয়ও কিরে
নববসনয়? (২১)

তখন অনায়াসে বুঝতে পারি কবির বাস্তববোধ অত্যন্ত প্রখর। প্রেম... প্রেমের অধিকারী হবার পথে মানুষের বাধা কোথায় তার সে বাধা

কতখানি তারই আপন চরিত্রের মধ্যে নিহিত, এর অপূর্ব বিশ্লেষণ পাই উপরিস্থ স্তবকগুলিতে।

'সঙ্গীত শতক'-এর মধ্যে ঝড়ের রাতের বর্ণনা (২৩) আর ঝড়ের পরদিন প্রভাতের যে দৃশ্য দেখেছেন তার বর্ণনাও (২৪) আছে। এ ছাড়া একটি সঙ্গীতে (২৯) সমুদ্রের বর্ণনাও পাই 'গুলিকে বীজ বা ভূমিকা হিসেবে গ্রহণ করাই সঙ্গত। এই তিনটি প্রাকৃতিক দৃশ্য অবলম্বনে রচিত তিনটি দীর্ঘ কবিতা পরবর্তীকালে 'নিসর্গ সন্দর্শন' কাব্যের মধ্যে পাওয়া যায়।

কবির বন্ধুপ্রীতির জীবন্ত নিদর্শন তাঁর 'বন্ধুবিয়োগ' কাব্যগ্রন্থ। এই বন্ধুপ্রীতির ইঙ্গিত 'সঙ্গীত শতক'-এর মধ্যেও পাওয়া যায়। কবি বলেছেন—

বন্ধুর নিকটে দুখ
জানালে কমিয়া যায়,
কিন্তু হায় হেন বন্ধু
কোথা বল পাওয়া যায়! (২৬)

আর এর পাশের বিপরীত ধর্মী চিত্রটিও সুন্দর। বন্ধু বলে গ্রহণ করার মত মানুষ সংসারে দুর্লভ সুলভ যে মানুষগুলি তার বর্ণনা আছে একটি সঙ্গীতে (৩০)। এদের সম্বন্ধে কবির বক্তব্য—

জগতে মানুষ চেনা
দেখি বড় দায়।
বিবিধ বেশেতে ফেরে
বিবিধ মায়ায়। (৩২)

একটি সঙ্গীতে 'গিরি'-বর্ণনা আছে—

দূরে থেকে দেখি গিরি
যেন ঠিক মেঘোদয়,
আকাশে মেঘের সঙ্গে
অঙ্গে অঙ্গে মিশে রয়। (৩৩)

এই সঙ্গীতটি 'সারদা মঙ্গল'-এর হিমালয় বর্ণনার ভূমিকা হয়ে রইল। এখানকার বর্ণনার একটি অংশের সঙ্গে ওখানকার বেশ মিল লক্ষ্য করা যায়। এখানে আছে

তরঙ্গিত মেখলায়
নির্ঝরের ধারা ধায়
শৃঙ্গে শৃঙ্গে বেগে ঠেকে
ঠিকরিয়া পড়ে।

ওখানে 'সারদামঙ্গল'-এর তৃতীয় সর্গে আছে—

ফেনিল সলিল রাশি
বেগ ভরে পড়ে আসি,
চন্দ্রালোক ভেঙে যেন পড়ে পৃথিবীতে
সুধাংশু প্রবাহ পারা
শত শত ধায় ধারা,
ঠিকরে অসংখ্য তারা ছোটে চারিভিতে।
অসংখ্য শিখরশিলা ছোটে চারিভিতে। (১৩)

কল্পনাপ্রিয়তা রোম্যান্টিক কবির পক্ষে অন্যতম প্রধান লক্ষণ। প্রকৃতপক্ষে একদিকে বিজ্ঞ-দার্শনিকরা জড়জগৎ আর মনোজগতের মধ্যে ঐক্যসূত্র ঘোষণা করলেন অন্যদিকে কবি-মানসে বিশ্বজগৎ অপূর্ব রূপে রসে প্রতিবিম্বিত হোল। জীবনবোধের গভীরতার সঙ্গে মানব প্রেম ও প্রকৃতিপ্রীতির সম্পর্কটিও ঘনিষ্ঠ হয়ে গেল। কিন্তু তাই বলে কবির চিন্তা শুধু বর্তমানকে আশ্রয় করেই তৃপ্ত হোল না। সে সুদূর অতীতে গিয়ে যেমনি স্মৃতিরোমন্থনের বিলাসে লিপ্ত হোল, তেমনি আবার অনাগত ভবিষ্যতের দিকে স্বপ্নাভিসারেও প্রবৃত্ত হোল। আপন কবিসত্তাকে বর্তমানের সঙ্গে সম্পৃক্ত রেখেই অতীত স্মৃতিচারণ আর ভবিষ্যতের কল্পলোক সৃজন করে কবির রোম্যান্টিক কবিধর্ম প্রতিপালিত হ'ল।

এই রোম্যান্টিক কবিধর্ম যখন বুদ্ধিবৃত্তিকে আশ্রয় করে প্রকাশিত

হয়, তখনই তা শ্রেষ্ঠ কাব্যসৃষ্টির শক্তি অর্জন করে। তাই একথা বলা সঙ্গত যে, শ্রেষ্ঠ কাব্য মাত্রেই একই কালে রোম্যান্টিক ও ক্লাসিক লক্ষণাক্রান্ত। বিহারীলাল বিশ্বাস করেন যে, 'চলিলে কল্পনা পথে, পড়িবে ভ্রমের হাতে' অতএব 'প্রতিভা সতীর' সঙ্গে 'জ্ঞান প্রাণপতি'কে নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। পরবর্তী কালে 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যগ্রন্থের প্রথম সর্গেই বলেছেন—

বুদ্ধি আর হৃদয়ে মিলন,
বড় সুশোভন, সুঘটন,
বুদ্ধি বিদ্যুতের ছটা
হৃদয় নীরদ ঘটা,
শোভা পায়, জুড়ায় দুজন।

বিহারীলালের এই বিশেষ শক্তিটিকে এখান থেকেই লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃতপক্ষে তাঁর আত্মবিভোরতা তাঁকে কোনদিনই বাস্তব-বিস্মৃত করেনি এবং তাঁর ভাববাদও ভাবাতিরেক নয়।

'Morning shows the day'—কবির কথায় 'পরে যাহা হবে তাহা প্রথমেই জানা যায়' (৩৬)। 'যামিনী যখন আসে, অন্ধকার হয়ে আসে, উষার আসার আগে, শুকতারা দেখা দেয়'-এ সব উপমাশ্রিত উক্তি তীক্ষ্ণ বাস্তববুদ্ধির পরিচায়ক।

যতই খুঁজিবে হিত
তত হবে বিপরীত,
জলেতে ডুবিয়া রয়ে
অনলে হবে দাহন। (৩৭)

—প্রভৃতি স্তবকে কবির জাগতিক অভিজ্ঞতা যেন উজ্জ্বল মুক্তার মত দীপ্তিলাভ করেছে। রূঢ় জীবনসত্য এমনি বহু সঙ্গীতে অভিব্যক্ত।

'সঙ্গীত শতক'-এ প্রেমকবিতার সংখ্যাই অধিক, যদিও অন্যান্য বিষয় নিয়ে রচিত সঙ্গীতও এই সঙ্কলনের মধ্যে আছে। বিহারী-লালের প্রেমচেতনা রূপজ নয়, ধ্যানজ। আবার প্রকৃতিচেতনা বা

সৌন্দর্য্যচেতনাও ধ্যানজ। এই কবি যে নিরন্তর ধ্যানমগ্ন থাকতেন আর সে ধ্যান যে 'প্রশান্ত, প্রগাঢ় এবং পবিত্র' সেকথা ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ও স্বীকার করেছেন।[২] এই ধ্যানমগ্নতার স্বীকৃতিও কবিকণ্ঠে শোনা যায়—

যাইব নির্জন স্থলে,
নাইব পবিত্র জলে,
দেখিব হৃদি কমলে
প্রেমময় সনাতন। (৫০)

আবার কখনো বলেন—

সরল পবিত্র মনে
কর প্রেমের সাধনা।
হৃদয় সন্তোষে পূর্ণ
হবে, রবে না যাতনা। (৫৪)

সম্ভোগ নয়, কল্যাণের আদর্শেই উদ্বুদ্ধ কবির প্রেমচেতনা। তিনি তাই আদর্শ পুরুষ আর আদর্শ নারীমূর্তিকল্পনা করেছেন। আদর্শ প্রেমের অধিকারিণী যে-নারী তাঁর প্রেমের সার্থকতার জন্যে আদর্শ পুরুষেরই প্রয়োজন। প্রথমেই আদর্শ পুরুষের বর্ণনায় বলেন—

কপোল প্রফুল্ল পদ্ম
শান্তি সুধারস সম
বয়ে বয়ে অশ্রুধারা
পড়িছে কেমন? (৬৮)

আবার আদর্শ নারী-বর্ণনায় বলেন—

প্রগাঢ় প্রসন্ন ভাব
মুখ পদ্মে আবির্ভাব
উজ্জ্বল মধুর হাসে
অধর শোভন। (৬১)

'সারদামঙ্গল' কাব্যের মধ্যে ভবিষ্যতে এই আদর্শ নায়ক-নায়িকা

কল্পনা আবার দেখা যাবে। এখানে সেই বৃহত্তর চিন্তার ভূমিকা সূচনা করলেন কবি।

কবির প্রকৃতিচেতনা, যা সৌন্দর্যচেতনারূপে এই আলোচনায় চিহ্নিত হয়েছে, মূলত দু'ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কখনো প্রকৃতি আপন স্বাভাবিকতায় স্বভাবোক্তি-অলংকারের রূপ নিয়ে এসেছে, আবার কখনো বা আরোপিত-চেতনা নিয়ে অপরূপা নারীমূর্তিতে প্রকাশিত হয়েছে।

বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানবমনের মিলন ঘটেছে বহু প্রাচীন কাল থেকেই। এই মিলনের পর্বটি যখন নিবিড় হয়ে উঠেছে তখনই কল্পনাপ্রবণ মানুষ প্রকৃতিতে প্রাণের আরোপ করেছে। 'জগতের মাঝে কত বিচিত্র' যে প্রকৃতি, সে কিন্তু প্রাণময়ী হয়ে কবির অন্তরে সৌন্দর্যসত্তার একক মূর্তিতে আসীনা হয়েছে। 'সঙ্গীত শতক'-এর মধ্যে কবি বিহারীলাল প্রকৃতির মধ্যে যখন প্রেমময় নারীসত্তার উপস্থিতি কল্পনা করেন আর বলেন—'প্রণয় করেছি আমি প্রকৃতি রমণী সনে', তখন স্বীকার করতে হয় যে প্রাচ্য আর পাশ্চাত্ত্য এই উভয় প্রকার প্রকৃতিচেতনা কবির মধ্যে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হয়েছে।

বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আমাদের আশৈশব সম্পর্ক এমন নিবিড় যে প্রকৃতির মধ্যে কোনো রহস্য সন্ধানের আকুলতা আমাদের অন্তরে সৃজিত হয় না বা তাকে প্রণয়িণী কল্পনা করে তার কাছে প্রেম নিবেদনের আকাঙ্ক্ষাও জাগে না। একই পরিবারভুক্ত ভ্রাতা ভগ্নীর মত আমাদের সহাবস্থান বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য দেশের স্বাতন্ত্র্যধর্মী ব্যক্তিচেতনা ও নাগর সভ্যতা সে দেশের মানুষকে প্রকৃতি থেকে দূরেই রেখেছে চিরদিন। এর ফলে পাশ্চাত্ত্য মানুষের মধ্যে প্রকৃতি সম্পর্কে কৌতূহল, প্রকৃতির সঙ্গে রোম্যান্টিক সম্পর্ক স্থাপনের আগ্রহ এত প্রবল। অত্যন্ত সহজেই চোখে পড়ে যে, বিহারীলালের মধ্যে উভয়বিধ চেতনার সমন্বয় ঘটেছে।

কবির সৌন্দর্যচেতনা প্রকৃতিচেতনারই নামান্তর। এই কাব্যগ্রন্থের

বহু সঙ্গীত অবলম্বনে সেই মনোভঙ্গীটির স্বরূপ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। নারীসৌন্দর্য সম্পর্কে কবি সচেতন বটে, কিন্তু তিনি আপন বিবাহিতা পত্নীর সৌন্দর্য্যেই নিবদ্ধদৃষ্টি। এ ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তা বিশেষের মধ্যেই গণ্ডীবদ্ধ, সামান্যের স্তরে উন্নীত নয়। এযে কেন নয় তার কারণ কবি 'বন্ধুবিয়োগ' কাব্যের মধ্যেই প্রকাশ করেছেন। আপন প্রথমা পত্নী অভয়াদেবীর স্মৃতি-তর্পণ প্রসঙ্গে কবি বলেছেন, নারীকেন্দ্রিক চিন্তায় তাঁর মন নিতান্তই 'আর্য', নীতিবোধের প্রবল অনুশাসনে সংযত। এই তীক্ষ্ণ নৈতিকচেতনা কবির নারীচেতনাকে আপন শ্রেয়সীর সন্ধান এনে দিয়েছে। এই মনোভঙ্গী পরিপূর্ণতা লাভ করেছে 'সাধের আসন' কাব্যগ্রন্থের সমাপ্তিপর্বে। বিহারীলালের প্রেম, সৌন্দর্য ও অধ্যাত্ম-চেতনা আপন প্রেয়সীরই লৌকিক আধারে বিলীন হয়ে গিয়েছে। বাংলা-সাহিত্যের এই নূতন দিগন্ত বিহারীলালের সৃষ্টি।

কবি আপন প্রেয়সীর রূপদর্শনে মুগ্ধ হন আর বলেন, 'হেরিলে তব বদন যেন পাই ত্রিভুবন'।

তবু এই রূপদর্শনে তৃপ্তি নাই---

যত দেখি, ততই যে
দেখিবারে বাড়ে সাধ,
নির্মল লাবণ্য রসে
না জানি কি আছে স্বাদ!

এ যেন বৈষ্ণব কবিতারই দোসর---'জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ, নয়ন না তিরপিত ভেল।' কিন্তু এযে রূপমোহ নয় তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। কবি আগেইবলে রেখেছেন—

প্রেম প্রেম করে লোকে
কে জানে প্রেম কি ধন?
সকলে রূপের করে
অনায়াসে সঁপে মন। (৫০)

নিষ্ঠায় আর গভীরতায় যে প্রেম এক-লক্ষ্যাভিমুখী এবং অতলস্পর্শী, আন্তরিক আনন্দ সৃষ্টির মূল্যে তা অতুলনীয়। প্রেম আর একাত্মতা এ ক্ষেত্রে সমার্থক। কবির কথায়—

প্রণয় পরম সুখ
যদি চিরদিন রয়,
তাহলে তাহার কাছে
কিছুই তো কিছু নয়।
এক ধ্যান, এক জ্ঞান,
এক মন, এক প্রাণ,
জীবনে জীবন রহে,
মরণে মরণ হয়।

'সঙ্গীত শতক'-এর সমাপ্তিসূচক কবিতাটিও কবিপত্নীর উদ্দেশ্যে রচিত। একটির বক্তব্য অনুসরণে এই কথাই মনে হয় যে এই কাব্যগ্রন্থের গীতগুলি কবিপত্নীর চিত্ত বিনোদনের উদ্দেশ্য রচিত হয়েছিল। কবি এই কবিতায় আশা প্রাকাশ করেছেন যে সঙ্গীতগুলির ভাবগভীরতায় কবিপত্নী যদি অবতরণ করতে পারেন তাহলে—

বুঝিলে ইহার ভাব,
পাইবে আমার ভাব,
প্রেম, ধর্ম, প্রকৃতির
হবে উদ্দীপন।

আর সুখের প্রত্যাশা যদি থেকে থাকে তাহলে তা প্রাপ্তব্য কেবল মাত্র প্রেমমূল্যেই। অকৃত্রিম প্রেমই মানুষকে সুখী করতে পারে, বিহারীলালের কাছে এ শুধু কথার কথা নয়, এ উপলব্ধির আলোকে উজ্জ্বল জীবন-সত্য।

'সঙ্গীত শতক'-এর এই ছত্রগুলি আলোচনা প্রসঙ্গে ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ বলেছেন 'এই কবি সত্তা 'আমি' নিঃসংশয়ে আধুনিক মনের

প্রকাশ। রোম্যান্টিক কবিতার মূল বিষয় প্রেম, ধর্ম (অসীমানুভূতি) প্রকৃতিকে অবলম্বন করে কবিসত্তার বিকাশ।'[২] প্রকৃতপক্ষে কবি যাকে ধর্ম আর প্রকৃতি বলেন তা হ'ল যথাক্রমে অধ্যাত্ম এবং সৌন্দর্য-চেতনা। প্রেমচেতনার সঙ্গে এই দুই চেতনা একত্রে অসীমানুভূতিরই নামান্তর। সান্তমানুষের সীমানায় অসীমেরই চিরন্তর সাধনা। রবীন্দ্রনাথের কথায়—

ওদিকে, অসীম যিনি তিনি স্বয়ং করেছেন সাধনা
মানুষের সীমানায়,
তাকেই বলে 'আমি'। (শ্যামলী : 'আমি')

কবি বিহারীলালের প্রেমচেতনা সম্পর্কে কোনো সমালোচক বলেছেন যে ইনি বাংলা প্লেটোনিক কবিতার প্রথম কবি। তিনি 'সারদামঙ্গল' আর 'সাধের আসন'-কে প্লেটোনিক প্রেমের উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

প্লেটোর মতে, ইন্দ্রিয় সুখ আর নৈতিক ধর্ম এ দুয়ের মধ্যে বিপুল পার্থক্য। ইন্দ্রিয়সুখের পরিমাণ নির্ধারণ নির্ভরযোগ্য উপায়ে করা সম্ভব নয়, তাই তার ভিত্তিতে নৈতিক ধর্মের পরিমাণ নির্ধারণও সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে নৈতিক ধর্মের ভিত্তি মানবিক দৃষ্টিসম্পন্ন প্রজ্ঞা যা কিছু সুন্দর, সুসমঞ্জস আর শৃঙ্খলাবদ্ধ তারই যথোচিত বোধ আর সংযত সুখ প্রভৃতিই মানবজীবনকে সর্বোত্তম মঙ্গলের অভিমুখী করে। প্লেটোনিক প্রেমকল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে তাই পরিবর্তনশীল বিশেষের স্থান নেই। তার মূলে অপরিবর্তনীয় নিত্যবস্তু বর্তমান এবং সে নিত্যবস্তু বুদ্ধিগ্রাহ্য বা প্রজ্ঞানির্ভর, ইন্দ্রিয়নির্ভর নয়। প্রেম সেক্ষেত্রে অশরীরী, লৌকিক জীবনের অতীতে চিন্ময়ী চিরন্তনীর উদ্দেশ্যে সেই আদর্শায়িত প্রেম উৎসৃষ্ট হয়।

প্লেটোনিক প্রেমের এই স্বরূপলক্ষণ বিহারীলাল জানতেন এবং তার প্রমাণ কাব্যসংগ্রহের মধ্যেই আছে। তিনি বলেছেন,

ধিক্‌রে অধম ধিক
ভালোবাসা 'প্লেটোনিক'
ছদ্মবেশী রসিক মধুর 'মিয়ু মিয়ু'।

(নিশিথ সঙ্গীত, শরৎকাল ৩১)

প্লেটোনিক প্রেমকল্পনার যাঁরা ধারক তাঁদের 'ছদ্মবেশী' বলে ধিক্কার দেওয়ার পিছনে বিহারীলালের প্রেমসম্পর্কিত ব্যক্তিগত প্রত্যয়টিই প্রকাশিত।

দ্বিপত্নীক কবির বহু কবিতাই পত্নীদের উদ্দেশ্যে রচিত। যে 'সারদামঙ্গল' আর 'সাধের আসন' কাব্যগ্রন্থ দুটিকে অবলম্বন করে বিহারীলালকে প্লেটোনিক প্রেমধারার কবি বলা হয়েছে, ঐ দুটি কাব্য-গ্রন্থের বিশ্লেষণপ্রসঙ্গে দেখা যাবে যে ঐ গুলিতে বিভিন্ন কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরা 'airy nothing' নন। তাঁরা আর দশজন নারীর মতই রক্তমাংসের দেহধারিণী। তাঁদের কেউ মাতা, কেউ পত্নী, কেউ বা কন্যা, অথবা প্রেরণাদাত্রী—কবির কাব্যধারার অনুরাগিণী পাঠিকা। কবির প্রেম-চিন্তা বিশেষকে আশ্রয় করে আবর্তিত হতে গিয়ে সামান্যে পরিণত হয়েছে, আইডিয়া বা ভাবে পরিণত হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই প্রেম শাশ্বত মূল্য পেয়েছে কবিপ্রেয়সীর মধ্যে প্লেটো ঐ বিশেষণের সঙ্গে সম্পর্কটিকেই অস্বীকার করেছেন।

আগেই বলেছি, বিহারীলালের প্রেমকল্পনা ইন্দ্রিয়াশ্রিত, কিন্তু ইন্দ্রিয়সর্বস্বতায় অবসিত নয়। এর ফলে প্রেমচিন্তা কবির মানসলোকে প্রেরণার শক্তি-উৎসে পরিণত হয়েছে, আর তারই অবিসংবাদিত ফলশ্রুতি তাঁর কাব্যকৃতি। এই উৎসমুখ থেকেই আমরা বিচার বিশ্লেষণ করে দেখতে চেষ্টা করব, সত্যিই বিহারীলাল কতখানি প্লেটোনিক প্রেমচেতনার ধারক আর কতখানিই বা তাঁর মিষ্টিক দৃষ্টিভঙ্গী এই বৈশিষ্ট্য সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে।

কবি বলেছেন, প্রেমময়ভাব অঞ্জনে যদি দৃষ্টি রঞ্জিত হয় আর সারল্যের 'স্বচ্ছজলে প্রেভাবের শতদল' প্রস্ফুটিত থাকে তাহলেই মানুষ

অমেয় আনন্দের অধিকারী হতে পারে। শুধু তাই নয়, কবি এও আবার বলেছেন যে কুটিলতা আর জটিলতার আবর্তে পৃথিবী থেকে প্রেমের অস্তিত্ব বিলোপের উপক্রম দেখে তাঁর মর্মবেদনার অন্ত নেই। বার বার এ নিয়ে তাঁর কণ্ঠে বিষাদের সুর ধ্বনিত হয়েছে, বেহাগ-রাগিণীর বেদনাময় পরিবেশে কবির হৃদয়োৎসারিত শোক শতধারে ছড়িয়ে পড়েছে।

পার্থিব বস্তু ও ভাবসমূহের মানস-মূল্যায়ন নিতান্তই যে প্রাতিস্বিক সে ধারণা কবির আছে। তিনি জানেন ব্যক্তিমনের পরকলায় এই বস্তু বা ভাবের যে বর্ণ বিচ্ছুরিত হয়, ব্যক্তিবিশেষের কাছে সেই বর্ণের মূল্যেই তাদের মূল্য। এসব ক্ষেত্রে প্রথাসিদ্ধ মূল্যবোধের প্রশ্ন অবান্তর।

তবু বেদনাবোধ থেকে মুক্তি নেই কবির। মানুষের বিকৃত মানাসকতা, কবির সংবেদনশীল অন্তরকে আলোড়িত করে, কবি বলেন 'মানুষের মনে মুখে অনেক অন্তর', 'ধর্মের কঞ্চুক পরি, মুখেতে মুখোষ ধরি, ছদ্মবেশে পাষণ্ডেরা ফেরে নিরন্তর।'

বৈশিষ্ট্য এইখানে যে মানুষের এই শঠতা আর প্রবঞ্চনা কবিকে মানবদ্বেষী করে তুলতে পারেনি। কুটিলতার কুৎসিৎ অথচ প্রাণবন্ত চিত্র অঙ্কন করেছেন, তবু শেষে বলেছেন—

মানুষ আমার ভাই,
বড় প্রিয় জন,
মানুষ মঙ্গল সদা
করি আকিঞ্চন।

এর কারণ অত্যন্ত সহজ, কবি বলেন—

জন্মেছি মানুষ অঙ্গে
বেড়েছি মানুষ সঙ্গে
মানুষের সম্মুখেই
হইবে মরণ।

তাছাড়া একথাও কি ভোলবার ?

মানুষের খাই পরি
মানুষের কর্ম করি
মানুষেরই তরে ধোরে
রয়েছি জীবন।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে বিহারীলাল স্পেন্সার, কোঁৎ প্রভৃতির দার্শনিকের মতবাদ সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। কোঁতের Positivism বা ধ্রুবদর্শন যে তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল, তার কথা কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন।[৪] কোঁতের দার্শনিক চিন্তার কেন্দ্রে ছিল মানবপ্রেম আর পরোপচিকীর্ষা। 'সঙ্গীত দশক'-এর বহু কবিতায় এই সব নব্যভাব প্রকাশিত হয়েছে। একে আধুনিক মনোভঙ্গী বলে গ্রহণ করাই সঙ্গত।

কখনো আবার মানুষের আচরণে উত্যক্ত হয়েও কবি প্রকৃতির সান্নিধ্যে শান্তি পেতে চেয়েছেন, প্রকৃতির গাঢ় আলিঙ্গন লাভ করে 'তাঁর প্রেমে মগ্ন হয়ে, দ্রবীভূত প্রায় রয়ে' কিছুদিন 'আনন্দে যাপন' করতেও চেয়েছেন তিনি। কিন্তু

পরে ভাল নাহি লাগে,
কেবলই মনেতে জাগে
প্রিয়তম মানুষের—
মোহন আনন।

কবির দ্রুত প্রত্যাবর্তন ঘটে প্রকৃতি রসিকতার জগৎ থেকে মানবরসিকতার জগতে। কবিজীবন যে শুধু 'জগতের তরে', জগতের উপকার সাধনই যে তাঁর একমাত্র কর্তব্য। পৃথিবীর জলবায়ু আর খাদ্য 'ক্ষয়' করাই যে তাঁর জীবনধারণের লক্ষ্য নয়, এ বোধ তাঁর তীব্রভাবেই ছিল। এই মনোভঙ্গী যে কোঁৎ প্রবর্তিত ধ্রুবদর্শন পাঠে জেগেছে তা অনায়াসেই অনুমান করা যায়। একদিকে এই কর্তব্য-বোধ আর অন্যদিকে নিজের অক্ষমতা কবিকে নিদারুণভাবেই ব্যথা

দিয়েছে। নিজের অপদার্থতার কথা স্মরণে রেখেও বলেছেন যে 'চরাচর ত্রিসংসার' সবই তাঁর আপনার আর মানুষের প্রতি অকৃত্রিম প্রেমের অপরিমেয়তায় তাঁর আপন জীবনমূল্য। মানবপ্রীতির গভীরতাই শুধু নয় সেই প্রীতির মূল্যে নিজের জীবনমূল্য নির্ধারণ করার আন্তরিকতায় বিহারীলাল উনিশ শতকের যুগপ্রতীক।

রোম্যান্টিক বিষাদের স্পর্শ 'সঙ্গীত শতক'-এর সর্বাঙ্গে একটি করুণ কোমল ছায়া বিস্তার করেছে। এ সেই 'Infinite passion and the pain of the finite heart that yearns'—সীমাহীন আকাঙ্ক্ষার বাস্তবজগতে ব্যর্থতা জনিত বিষাদ। ডঃ উজ্জ্বল কুমার মজুমদার Wordsworth, Coleridge, Shelley, Keats ইত্যাদির কবিতা উল্লেখ করে বলেছেন, এই সব রোম্যান্টিক কবিদের প্রভাব বিহারীলালের 'সঙ্গীত শতক'-এ সুস্পষ্ট।

'সঙ্গীত শতক' নবোদিত প্রতিভাসূর্যের কিরণমালা। সেই কিরণমালার বর্ণাঢ্যতায় সযত্নে লক্ষ্য নিবদ্ধ রেখে অগ্রসর হলে কাব্য পরিক্রমার শেষে তার সঠিক মূল্যায়ন অবশ্যই সম্ভব হবে। একথা কিন্তু বিস্ময়কর হলেও সত্য যে আনুমানিক সাতাশ বছর বয়সের মধ্যে রচিত এই সঙ্গীতগুলির মধ্যে সমাজচেতনা, ধর্মচেতনা, সৃষ্টিরহস্য, প্রকৃতিরসিকতা, মানবপ্রেম, প্রিয়পরিজন সম্পর্কে অকুণ্ঠ মমত্ববোধ ও বিভিন্ন প্রকার মূল্যবোধ পরম গভীরতায় প্রকাশিত হয়েছে। এই যে তত্ত্বাশ্রয়ী অথচ বাস্তব-জীবন-কেন্দ্রিক অপূর্ব দৃষ্টিভঙ্গী, এর উৎসমুখ কবির সুনির্ভর উদার শিক্ষার মধ্যেই নিহিত। এই উদারশিক্ষা বা Liberal education সম্পর্কে কবির বক্তব্য—

গ্রন্থ আলোচনা যতনে করিলে
উদার জ্ঞানের উদয় হয়। (বঙ্গ সুন্দরী, চিরপরাধিনী স্তবক—৩০)

'সঙ্গীত শতক'-এর বহু কবিতাই তত্ত্বাশ্রয়ী কিন্তু তা পূর্বসূরিগণের বিভিন্ন বক্তব্যের পুনরুচ্চারণ মাত্র নয়, উচ্চকোটির উপলব্ধিসঞ্জাত নিগূঢ়

সত্যের স্বল্পাক্ষর গীতিময় প্রকাশ। আবার সামগ্রিক ভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে, বিহারীলালের পরবর্তী কাব্যগুলিতে যে সব বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে তার প্রায় সব কটিই স্মিতভাষণের আধারে সঙ্গীতের আকার নিয়ে এই কাব্যে স্থান পেয়েছে। তাঁর সর্বাধিক পরিচিত সরস্বতীচেতনা বা সারদাচেতনারও সন্ধান 'সঙ্গীত শতক'-এর মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে তিনি সর্বপরিচিত বীণাবাদিনী বিদ্যাদায়িনী সরস্বতীই। তাঁর উল্লেখ প্রথম সঙ্গীতেই রয়েছে। 'সারদা মঙ্গলে'ই তিনি কবির মৌলিক চিন্তার স্পর্শে সম্পূর্ণ নূতন মূর্তিতে আবির্ভূতা। এই একশ' একটি কবিতার মধ্যে শুধু কাব্যরস বা গীতিরসই যে পরিবেশিত হয়েছে তা নয়, বস্তুত কবির বহু বক্তব্য প্রৌঢ়োক্তির মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সূর্যের উজ্জ্বল আলো
পেঁচারে লাগে না ভালো।

অথবা

কেবল বিশ্বাসে শ্রদ্ধা
রয়েনা কখন।

অথবা

যেখানে দেখিবে ছাই
উড়াইয়া দেখ তাই
পেলেও পেতে পার
লুকান রতন।—

প্রভৃতি অংশগুলির অর্থমূল্য আলোচনার অতীত। এগুলি সন্দেহাতীত ভাবেই অভিজ্ঞতা আর গভীর মননশীলতার ফসল।

কাব্যমূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে চিত্রকল্প সম্পর্কে আলোচনাও অপরিহার্য। কারণ কবি যে রস-সংবাদ পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে চান তা তাঁকে করতে হবে বস্তু-নিষ্ঠ সার্থক বাকপ্রতিমার সাহায্যে। এই বাকপ্রতিমা বা রূপকল্প রস-সংবাদকে পাঠকের রূপানুভূতিতে

পরিণত করে। অবশ্য এই বাকপ্রতিমা নির্মিতির জন্য বিভিন্ন মত ও পথ আছে। কোথাও তা ধ্বনিনির্ভর, আবার কোথাও বা তা রূপকাশ্রিত। যাই হোক, আমরা 'সঙ্গীত শতকে' ব্যবহৃত রূপকল্পগুলির কয়েকটি নিয়ে আলোচনা করব। কতকগুলি বিচ্ছিন্ন উদাহরণ—

(১) কাল মেঘ-কেশ-মাঝে
সাদা মেঘ-সিঁথি সাজে
তার মাঝে জ্বলে মণি
তারকা সুন্দর।

(২) নূতন মঞ্জরী ভরে
আছে ঘাড় হেঁট কোরে
নতমুখী নববধূ
সরমের দায়।

(৩) হেলিয়ে স্তবক ভরে
মরি কত লীলা করে
পয়োধরভার ভরে
ঢলে পড়ে ক্ষণে ক্ষণে।

উদাহরণ না বাড়িয়েও একটা জিনিষ স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে যে প্রতিটি ক্ষেত্রেই উপমেয় প্রকৃতি আর উপমান নারীমূর্তি। নারীমূর্তির অতি-পরিচিত আধারে কবি-প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্যকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন প্রত্যেকটি স্তবকে। এ বাকপ্রতিমা ধ্বনিনির্ভর নয়। এ মূলত দৃষ্টি-গ্রাহ্য হলেও প্রখর অনুভূতির পরিচায়ক।

'সঙ্গীত শতক'-এর সমকালীন পাঠকসমাজ তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানাননি বটে, কিন্তু সারস্বত পরিবারে তাঁর সম্বন্ধে অপরিসীম কৌতূহল জাগ্রত হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সঙ্গীত শতক' পাঠ করার পর বিহারীলালের সঙ্গে বন্ধুত্বস্থাপনে প্রয়াসী হন। বিহারীলাল যেভাবে বন্ধুত্বের আহ্বান স্বীকার করেন তার প্রমাণ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় তাঁর 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা'র—'বিহারীলাল'

গ্রন্থে পত্রাংশ উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন"। ঠাকুরপরিবারের সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠতা যে কবির কবিত্ববিকাশের অনুকূল হয়েছিল তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

প্রসঙ্গত স্মরণীয়, সাহিত্যসাধনার ক্ষেত্রে এই দুই বন্ধুর প্রবেশ প্রায় একই সঙ্গে।

'পূর্ণিমা' পত্রিকায় ১৮৫৯-৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বিহারীলাল ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ১৮৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দে 'মেঘদূতের' অনুবাদ করেন এবং তা প্রকাশিত হয় ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে। 'সঙ্গীত শতক' প্রকাশিত হবার পর এঁদের বন্ধুত্ব-বন্ধন নিবিড় হয়ে ওঠে ও উভয়ে পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হন।

'সঙ্গীত শতক' সম্পর্কে আলোচনায় আরও একটি বিষয় স্মরণীয় প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে সঙ্গীতেরই প্রাধান্য ছিল। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের মৃত্যু হয়। তখন থেকে শুরু করে গুপ্ত কবি ঈশ্বরচন্দ্রের তিরোধানকাল ১৮৫৯ পর্যন্ত যে একশ' বছর—এর মধ্যেও সঙ্গীতের আয়োজন কম ছিল না, যদিও তার আস্বাদ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। কবিগান, যাত্রা, ঝুমুর, টপ্পা, তরজা, পাঁচালী প্রভৃতির মধ্যেই সেই একশ' বছর বাঙ্গালী তার মনের খোরাক সংগ্রহ করেছে। নিধুবাবু আর শ্রীধর কথকের আদিরসাত্মক সঙ্গীত, দাশরথি রায়ের পাঁচালী, রাম বসু, হরুঠাকুর প্রভৃতির গান এই কালেরই রচনা। কেউ কেউ এই যুগকে 'কবিওয়ালাদের যুগ' বলে চিহ্নিত করেছেন।

যে নামেই চিহ্নিত হোক না কেন, এই সঙ্গীতধারা যে সম্পূর্ণরূপেই পাশ্চাত্য প্রভাববর্জিত তা বিশেষ করেই মনে রাখা দরকার।

সঙ্গীতধারার মধ্যে সঙ্গীত-মুখ্য, আর আখ্যান-মুখ্য এই দুটি ধারাও দেখা গিয়েছে। বাউল, মালসী প্রভৃতি রচনাগুলি সঙ্গীত-মুখ্য, কিন্তু কবি, টপ, পাঁচালী প্রভৃতি আখ্যায়িকা-মুখ্য রচনা। গীতি-মুখ্য রচনা বিশিষ্ট রাগ-রাগিণী-নির্ভর। তাই তার রূপ ও আয়তন সুনির্দিষ্ট।

আখ্যান-মুখ্য ধারা গীতিধর্মী কিন্তু নমনীয়, তাই রূপ ও আয়তনের জন্য অনুসরণীয় প্রথাসিদ্ধ কোন রীতি নেই।

আদি ও সম্পূর্ণ দেশীয় সঙ্গীতধারা তার উভয়শাখা নিয়ে যেদিন পাশ্চাত্য ভাবধারার সাহচর্য লাভ করল, সেদিন দেখা গেল গ্রহণ-বর্জন রীতির স্বল্পকালীন দ্বন্দ্বের শেষে তদানীন্তন কবিগোষ্ঠী আখ্যান-মুখ্য ধারার দিকেই আকৃষ্ট হয়েছেন। শ্রীরামপুর মিশন আর ফোর্টউইলিয়াম কলেজ এই নবদিগন্ত সৃজনে সাহায্য করলেন, রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক বিপুল পরিবর্তনের সঙ্গে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই বাঙালীজাতির মানসিকতার পরিবর্তন সাধিত হ'ল, বাংলাকাব্যধারায় সম্পূর্ণ নবযুগ সৃজিত হ'ল মহাকবি শ্রীমধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ কাব্য' (১৮৬১) প্রকাশের মুহূর্ত থেকে আখ্যানকাব্য ধারার জয় লাভ ঘটল। ... দিকে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে যে গীতাত্মক রচনার বাহুল্য দেখা গিয়েছিল, তার ধারাটিও স্তব্ধ হয়ে গেল না। সামাজিক রুচিপরিবর্তন ও পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার সংস্পর্শে গীতি-মুখ্য রচনাগুলির কেন্দ্র-চেতনায় পরিবর্তন সূচনা করল। দেখা গেল কেন্দ্রীয়-ভাব সমষ্টিগত ভাবনার বিন্দু থেকে ব্যষ্টিগত ভাবনার বিন্দুতে প্রত্যাবৃত্ত হয়েছে। উনিশ শতকের ষষ্ঠ দশকে যখন বিহারীলাল বাংলা সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হলেন তখন দেখা গেল যে সমকালীন বাতাবরণকে স্বীকার করে নিয়েও তিনি আত্মভাবে তন্ময় হয়ে রয়েছেন

বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস রচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গীত সাহিত্যের আলোচনামূলক যে সুবৃহৎ অধ্যায়ের অবতারণা করেছেন তার সূত্রপাতেই তিনি একটি মূল্যবান কথা বলেছেন। বিহারীলাল প্রসঙ্গে সে উক্তিটিকে প্রমাণ্য হিসাবে অবশ্যই গ্রহণ করা যায়। শিল্পসৃষ্টি প্রায় যুগাতিচারী হতে পারে না, এই কথা বলতে গিয়ে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে, 'এমন কি, দুর্ধর্ষ ধরনের গীতিকবি, যিনি আত্মচেতনার গিরিচূড়ায় স্বেচ্ছাবন্দী,

তিনিও বস্তুতন্মাত্রের বাইরে যেতে পারেন না।'[৬] আর বিহারীলাল যে তা যাননি সে কথা এই কাব্যগ্রন্থের সঙ্গীতগুলির আলোচনায় প্রমাণিত হয়েছে।

সঙ্গীতচর্চা এবং এই বিদ্যায় অধিকার চিরদিনই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে এসেছে। এর ঐতিহ্যটি সুদূর অতীতে সামগান করার রীতি থেকেই গড়ে উঠেছে। এই গীতিরীতির সুর, ছন্দ, ও লয় তিনটি প্রধান অংশ। সঙ্গীতে সুরের প্রাধান্য, ছন্দ ও লয় তার অনুগামী। যিনি একাধারে কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ তিনি ঐ সঙ্গীতের সঙ্গে কথাবস্তুর মিলন ঘটান। এতে কোন কোন ক্ষেত্রে সঙ্গীতের শুচিতা ও স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয়, কিন্তু সাধারণ শ্রোতার মনে বাণী-নির্ভর সঙ্গীতের প্রভাব অধিকতর।

এই বাণীনির্ভর আত্মভাবনামূলক ধারাকে সম্পূর্ণ নূতন পথে পরিচালিত করার কৃতিত্ব বিহারীলালের, আর সেই ধারাকে মহাসমুদ্রের সঙ্গে মিলিত করে দেবার কৃতিত্ব রবীন্দ্রনাথের। প্রেম-চেতনা, সৌন্দর্য-চেতনা এবং অধ্যাত্ম-চেতনার বিচিত্র দিগন্তের কথা বিহারীলাল বলেছেন গানে। বলেছেন নিধুবাবু, দাশরথি, রামপ্রসাদ প্রভৃতি কবিরাও। কিন্তু বিহারীলালের গান অন্য ধারায় এক পথে গিয়েছে। সেখানে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক সত্তা বিভিন্ন প্রকার ঐশ্বর্যদীপ্তিতে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তা-ই প্রকাশ পেয়েছে অজস্র সঙ্গীতে ও কাব্যে। অনির্বচনীয় চেতনার গভীরে পশে আবার সুরের মধ্যে তা মুক্তি পেয়েছে। ভূমার উপলব্ধি তাই গানের মধ্যে। বিহারীলাল সেই ভূমার বা অসীমানুভবের ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন—

> বুঝিলে আমার ভাব
> পাইবে আমার ভাব
> প্রেম, ধর্ম, প্রকৃতির হবে উদ্দীপন। (৪৯)

রবীন্দ্রনাথও প্রার্থনা জানিয়েছেন—

> তোমার কাছে এ বর মাগি
> মরণ হতে যেন জাগি গানের সুরে।

সঙ্গীতের মধ্যেই বিহারীলাল তাঁর ধ্যানের জগৎ সৃজন করেছিলেন তাই তাঁর বক্তব্য ছিল—

কবিগণ পদ্মবনে
রাগিণী সঙ্গিনীসনে
মূর্তিমতী সরস্বতী
সুধা বরিষয়,
নিতান্ত কাতর জন
শোকে তাপে দগ্ধ মন
শ্রবণে করিলে পান
তৃপ্ত হয়ে রয়। (৫০-৫১)

উল্লেখপঞ্জী

(১) সমালোচনা সাহিত্য : সম্পাদক : শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রফুল্ল পাল, (২য় সংস্করণ), পৃঃ ২৭৬

(২) প্রণবরঞ্জন ঘোষ : বিহারীলালের কাব্যপরিক্রমা, কল্যাণী : ৪র্থ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৮, পৃঃ ৩৭৩

(৩) অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় : উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য, (১ম সংস্করণ), পৃঃ ১৪৪

(৪) বিপিন বিহারী গুপ্ত : পুরাতন প্রসঙ্গ, ২য় বিদ্যাভারতী সংস্করণ, পৃঃ ৯

(৫) উজ্জ্বল কুমার মজুমদার : বাংলা কাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব, (১ম সংস্করণ,) পৃঃ ১৫১

(৬) অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৪র্থ খণ্ড (১ম সংস্করণ), পৃঃ ৩১

॥ ৪ ॥

'নিসর্গসন্দর্শন' কাব্যের প্রথম সর্গ 'চিন্তা' কবিতাটি নানাদিক থেকেই মূল্যবান। এটিকে কবির আত্মবিশ্লেষণমূলক কবিতা হিসেবে আবার তদানীন্তন সমাজ-চিত্র-মূলক কবিতা হিসেবেও গ্রহণ করা যায়। এই কবিতায় কবি বলেছেন 'বিমুখ ব্রহ্মাস্ত্র আসি অস্ত্রীকেই মারে' কথাটি শুধু মূল্যবানই নয় এটিকে কবির ব্যক্তিগতজীবনের পটভূমিতে গ্রহণ করলে তার একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ পাওয়া যায়। উদারহৃদয় প্রেমপ্রবণ বিহারীলাল সমাজ আর সংসারের সবকিছুকেই আপন করে নিতে চেয়েছিলেন, উন্মুক্ত হৃদয়ের মধ্যে স্থান দিতে চেয়েছিলেন সংসার আর সমাজ-কেন্দ্রিক মানবচিন্তাকে। কিন্তু তাঁর সেই আন্তরিক স্নেহ প্রেমের মূল্য দেয়নি কেউ। কবিও পারেননি সমাজের গতানুগতিক স্রোতপ্রবাহে নিশ্চিন্তে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে। যে গভীর আবেগের সঙ্গে কবি বহির্জগৎকে আপনার করতে চেয়েছিলেন তিনি, তেমনি প্রবঞ্চনা থেকেই তিনি আঘাত পেয়েছেন। আর তা পাবার পর নিজের অন্তর্জগতে সত্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়েছেন তিনি।

এককালে মানুষের অকৃত্রিম প্রীতি ও সারল্য কবির পক্ষে পরম প্রীতিদায়ক ছিল। কিন্তু কালক্রমে যেন সেই সব চিত্তবৃত্তি তিরোহিত হয়েছে। স্নেহ ভালোবাসা অর্জনের চাইতে প্রায় প্রতিটি মানুষের কাছে অর্থার্জনই পরম মূল্যবান কর্তব্য বলে পরিগণিত হয়েছে। মানুষের এই স্বভাব-পরিবর্তন কবির পক্ষে অসহ্য। আবাল্য কাব্য-সাধনায় ব্রতী কবি তাই সেই সাধনার মধ্যে নিজেকে নিমগ্ন রেখে সমস্ত দুঃখ বিস্মৃত হতে চান। অবশ্য পরাধীন দেশে শিল্প-সাহিত্য সৃজনের ক্ষেত্রে বাধার অন্ত নেই। স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রাচীন কাব্য-কলার যুগটিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছেন কবি। প্রশ্ন করেছেন—

তব বীণা-বিগলিত অমৃতলহরী,
আর কি খেলিবে এই পরাধীন দেশে ?
আর কি পোহাবে এই ঘোরা বিভাবরী ?
আর কি সে শুভদিন দেখা দিবে এসে ? (১৪)

প্রকৃতপক্ষে প্রাচুর্য আর পরিবেশ-প্রসন্নতা ব্যতীত প্রতিভার স্ফুরণ সম্ভব নয়। এদিক থেকে স্বাধীন দেশের নাগরিকরা কিছু পরিমাণে ভাগ্যবান। পরাধীনতা-রূপ 'যে বাধা বিষম বাধা' তার সম্মুখীন হতে হয় না তাঁদের। 'এদেশেতে বুদ্ধিমান যাঁহারা জন্মান, তাঁরাই পড়েন এসে বিষম বিপদে'—সমকালীন সমাজচিত্রের এই সংক্ষিপ্ত রূপটি অপূর্ব। যাঁরা চিন্তাশীল আর সৃজনধর্মী শক্তির অধিকারী, বিরূপ পরিবেশে তাঁরাই বেশী পরিমাণে কাতর হন। একদিকে প্রকাশোন্মুখ শক্তির আকুলতা, অন্যদিকে দুরতিক্রম্য বাধা—এ দুয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের কল্পনা নিয়েই 'চিন্তা' শীর্ষক কবিতাটি রচিত

দ্বিতীয় সর্গের নাম 'সমুদ্রদর্শন' সমুদ্রের প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি বিহারীলালের চিন্তা এখানে দৈর্ঘ্যে ও বোধে অপূর্ব বিস্তৃতি লাভ করেছে। একদিকে সমুদ্রের পৃথিবী-বেষ্টনকারী সীমাহীন রূপ, অন্যদিকে কবির অন্তরের মধ্যে সেইরূপের বিচিত্র প্রকাশ একইকালে ধরা পড়েছে। ভারতবর্ষের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে কবি মুহূর্তের মধ্যেই একে নিসর্গের এক বিচিত্র দর্পণ রূপেই দেখেছেন।

বিহারীলালের সমুদ্রপ্রীতি বাংলা কাব্যধারায় একটি নবীন সংযোজন। সমুদ্রের ভ্রূক্ষেপহীন সমাধিস্থ অবস্থাই বিহারীলালের কাছে সব চাইতে বড় আকর্ষণ। কবির সঙ্গে এই ধ্যানমগ্নতার সূত্রেই সমুদ্রের একাত্মতা। সমুদ্র সম্বন্ধে কবির উক্তি—

আহা সদাশয় সাধু উদার অন্তরে,
থাকেন আপনভাবে আপনি মগন।
জনতার কলকলে তাঁহার কি করে ?
প্রয়োজন জগতের মঙ্গলসাধন।

প্রকৃতির সঙ্গে কবির এই আত্মিক সম্পর্কটি প্রকৃতপক্ষে তাঁর সৌন্দর্যচেতনা এবং সমুন্নত ভাবুকতরাই সাহায্যে স্থাপিত হয়েছিল। 'সর্বজয়ী মহাবল কাল, যার নামে চরাচর কাঁপে থরহরি' সেও কিন্তু এই মহাবুদ্ধির কাছে হতবল। কবির ভাষায়—

সত্যযুগে আদি মনু যেমন তোমায়
হেরেছেন, হেরিতেছি আমিও তেমন,
কাল তব সনে শুধু গড়ায়ে বেড়ায়,
জাহির করিতে নারে বিক্রম আপন। (৩৮)

কালজয়ী এই বিপুলায়তন মহোদধি রত্নাকরও বটে। আজ যদি অগস্ত্যমুনি এসে 'সহসা সকল জল শোষেন চুম্বুকে' তাহলে কী ঘটে, সে বিষয়েও কবি চিন্তা করেন। কিন্তু যখনি জলহীন সমুদ্র গর্ভে জলচর প্রাণীরা কষ্ট পাচ্ছে বলে কল্পনা করেন, তখনি ব্যস্ত হয়ে বলেন 'ফেরো গো ও পথ থেকে কল্পনা সুন্দরী'। কবিজনোচিত ঔদার্যে তখনি কামনা করেন 'সেই মহান জলরাশি আন ত্বরা করে... শান্ত হোক শীতল হোক, সকল সংসার'।

এই কবিতাটিতে কবির ভাববৈচিত্র্যও লক্ষণীয়। কবি মহাসমুদ্রের বহু বিচিত্র রূপের কথা যেমনি ভাবছেন, তেমনি প্রসঙ্গক্রমে অজ্ঞাত দ্বীপ ইংল্যাণ্ডের কথা ভাবতে গিয়ে ভারতবর্ষের পরাধীনতার কথা স্মরণ করে ব্যথিত হয়েছেন। 'বাঙালীদের স্বাধীনতা সাধ' প্রসঙ্গে যেমন রামায়ণের কাহিনী স্মরণ করেছেন কবি, তেমনি স্মরণ করেছেন শকুন্তলা নাটকের কথা। এখানে অবশ্য এসেছে অপহৃত স্বাধীনতার উপমান হিসেবে।

'সমুদ্র দর্শন' কবিতার ওপর কবি বায়রনের প্রভাব সর্বস্বীকৃত। Childe Harold-এর Canto IV এর বেশ কিছু ছত্রের প্রতিধ্বনি বিহারীলালের এই কবিতার মধ্যে পাওয়া যায়।[৭] তবে একথা স্বীকার করতেই হয় যে এই প্রভাব অনুবাদ বা অনুকরণের মধ্যে সীমিত নেই। এ ক্ষেত্রে এক কবির ভাব অন্য কবির ধ্যানগভীরতার

মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে নবতর সৃষ্টির প্রেরণায় পরিণত হয়েছে। দু'একটি শব্দের প্রয়োগ-সামঞ্জস্যকে অবলম্বন করে এই প্রভাব-প্রসঙ্গ আলোচ্য নয়, আলোচ্য উভয়কবির ভাবসঙ্গতি। কিন্তু এই ভাবসঙ্গতি বহু ক্ষেত্রেই সমান্তরাল চিন্তা থেকেও যে উদ্ভূত হতে পারে, এই সত্যটি বিস্মরণযোগ্য নয়। বাংলা কাব্যজগতের উনবিংশ আর বিংশ শতাব্দীর বহু রচনা উদ্ধৃত করে এই বক্তব্য প্রমাণিত করা যায়।

উনবিংশ শতকের প্রায় প্রথমার্ধ থেকেই পাশ্চাত্য সাহিত্যের ও দর্শনের আলোচনা শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যাঁরা প্রথানুগ শিক্ষাধারার মধ্য দিয়ে এই সাহিত্য-দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হননি, তাঁদের অনেকেও বিভিন্ন প্রকার আলোচনা চক্রে যোগ দিয়ে এইসব ভাবধারার সঙ্গে সুপরিচয় স্থাপন করেন। কালক্রমে জগৎ ও জীবন সম্পর্কিত কিছু পাশ্চাত্ত্য ধ্যানধারণা বাঙ্গালী জীবনরসধারার অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে এবং পরে আমাদের সাহিত্য সংস্কারেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে। আর এটি এতই স্বাভাবিক যে এর জন্যে কোন কবি সাহিত্যিকের কাছে 'ঋণ প্রমাণের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক মনে হয়। এই 'ঋণ গ্রহণ'[২] আলোচনাটি বাঙ্গালী কবি সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের মৌলিক অবদানকে যেন বহুল পরিমাণে ক্ষুণ্ণই করে। উত্তরকালের কবিদের ওপর বিহারীলালের প্রভাবপ্রসঙ্গ আলোচনার সময়, এ নিয়ে বিস্তৃততর আলোচনার অবকাশ পাওয়া যাবে।

সমুদ্রবর্ণনার মধ্যে যে বিশেষ নবাগত দৃষ্টিভঙ্গীটি লক্ষণীয় তা হল গতানুগতিক নীরস প্রকৃতিবর্ণনার অর্থহীন পরিসরে কবির শক্তি অপচয়িত হয় নি। সম্পূর্ণ সংস্কারহীন দৃষ্টি দিয়ে বিশ্ব প্রকৃতির রহস্যময়তার গভীরে ধ্যানদৃষ্টি প্রেরণই বিহারীলালের মৌলিকতা। এই ধ্যানদৃষ্টি কোন রহস্যেরই সূত্র আবিষ্কার করতে পারেনি। তাই বিস্ময়ের সঙ্গে কবির প্রশ্ন 'যতই তোমার ভাব ভাবিহে অন্তরে, ততই বিস্ময়রসে হই নিমগন' (৪১)। প্রকৃতপক্ষে রোম্যান্টিক আনন্দ-বিষাদের ক্ষেত্র থেকে বিশ্বসত্য সম্পর্কিত মিষ্টিক উপলব্ধির ক্ষেত্রে

উত্তরণ প্রচেষ্টা বাংলা প্রকৃতিমূলক কাব্যের মধ্যে এইখানেই প্রথম দেখা গেল। :

বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে বিস্ময়রসের উৎসসন্ধানও রোম্যাণ্টিক মনোবৃত্তির অন্যতম লক্ষণ। পাশ্চাত্য সমালোচকেরা একে স্বাভাবিক সৌন্দর্যের সঙ্গে বিস্ময়রসের সমন্বয় বা addition of strangeness to beauty বলে উল্লেখ করেছেন। কল্পনা-প্রবণতারই একটি দিক এটি, আর এরই বলে উনিশ-শতক পূর্ববর্তী শতক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী। যাইহোক, বিহারীলালের মধ্যে এই নব্যভাবের উদাহরণ অতিপ্রত্যক্ষ করে তুলেছে তাঁর 'নিসর্গ সন্দর্শন' কাব্যের 'সমুদ্র দর্শন' সর্গটি। স্বাভাবিক আর অস্বাভাবিক চিন্তার অপূর্ব মিলন এ ক্ষেত্রে ঘটেছে।

তৃতীয় সর্গের 'বীরাঙ্গনা' একটি কাহিনী কাব্য। 'অযোধ্যানিবাসী এক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ কাশীতে ছিলেন এসে জীবিকার তরে।' সঙ্গে ছিল বাড়ীর 'নফর' একজন। একদিন ব্রাহ্মণের মনে হোল পিতৃগৃহ থেকে পত্নীকেও কাশীতে আনিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি চাকরটিকে বাড়ী পাঠালেন। কাশী থেকে ব্রাহ্মণের গ্রামটি 'সপ্তাহের পথ'। যাই হোক কর্ত্রীকে নিয়ে ভৃত্য যখন 'পৌঁছল আসি কাশীর সীমায়' তখন তাঁরা ঝড়-বাদলের মধ্যে পড়লেন। আশ্রয় হিসেবে বহু চেষ্টার পর তাঁরা এসে পৌঁছলেন একটি 'থানা ঘরে'। সেখানে প্রচণ্ড দৈহিক পরিশ্রমের পর একটি কক্ষে যখন ব্রাহ্মণী নিদ্রিতা, 'থানার নচ্ছার'রা তাঁর ওপর অত্যাচার করতে উদ্যত হোল। এই রমণী তখন আপন সতীত্ব রক্ষার জন্য কীভাবে ভক্ষকরূপী রক্ষকদের হত্যা করলেন তারই বর্ণনা আছে কবিতার শেষাংশে। এরপর পতি পত্নীর মিলন হোল সেই ঘটনাস্থলেই।

সেকালে পদব্রজে যাতায়াতের পথে এ ধরনের বিপদ প্রায়ই ঘটত। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে কবিও পদব্রজে বহু তীর্থ ভ্রমণ করেছেন। তাঁর জীবনীকার এ কথা উল্লেখ করেছেন যে তিনি

পদব্রজেই পুরী যাত্রা করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও ভ্রমণের জন্য গিয়েছেন। অতএব এ ধরনের কোন দুর্ঘটনার কাহিনী কবির কর্ণগোচর হয়েছিল এ ধারণা অমূলক নাও হতে পারে।

পতিব্রতা সতীর আত্মরক্ষার জন্য বীরত্ব প্রদর্শন যেমনি বিস্ময়কর, সাধারণ একটি ভৃত্যের কর্তব্যনিষ্ঠার উদাহরণটিও তেমনি প্রশংসণীয়।

কর্ত্রীকে লইয়ে সাথে কৃতজ্ঞ নফর
পথে করি যথাযোগ্য শুশ্রূষা তাঁহার,
পদব্রজে চলি চলি অষ্টাহের পর
দিনান্তে পৌঁছিল আসি কাশীর সীমায়। (১১)

এখন উভয়েই আনন্দিত 'এত যে পথের ক্লেশে, শ্রান্ত, ক্লান্ত, ক্ষীণ, তবুও যেন বাড়ে বল প্রতিপদার্পণে'। একজন কর্তব্য পালনের জন্য আর অন্যজন আশু পতিসন্দর্শনের জন্য আনন্দিত।

সার্থ কাহিনী অবলম্বনে রচিত কবিতা বিহারীলালের এই একটিই। অথচ স্মরণীয় যে 'বীরযুগ' রূপে চিহ্নিত কালসীমার মধ্যেই বিহারীলালের কবিপ্রতিভা বিধৃত। রঙ্গলাল থেকে মধুসূদনের মধ্য দিয়ে যে কাহিনীকাব্যের ধারা বীরযুগ সৃষ্টি করেছিল, তারই সময়-সীমার মধ্যে আত্মমগ্ন কবির গীতি-গুঞ্জন শোনা গেল। ঋতু পরিবর্তনের মধ্যেও অপসৃয়মান ঋতুর স্পর্শ অনায়াসেই উপলব্ধি করা যায়। 'বীরাঙ্গনা' কবিতাটির মধ্যেও সেইরকম অবসিতপ্রায় বীরযুগের স্পন্দন অনুভব করা গেল। বঙ্গনারীর বীরত্ব প্রতিপাদনই এ কবিতার একক উদ্দেশ্য। বলাবাহুল্য পরবর্তীকালে সুপ্রতিষ্ঠিত গীতিকবিতার যুগেও এ ধারার পরিচয় পাওয়া যায়।

চতুর্থ কবিতা 'নভোমণ্ডল' শীর্ষক। গভীর রাত্রে কবি অন্তহীন আকাশের দিকে তাকিয়ে তার বিরাটত্ব উপলব্ধি করেছেন পরম বিস্ময়ের সঙ্গে। কৃষ্ণপক্ষের রাত। আকাশে দেখা যাচ্ছে 'অসংখ্য

তারা'। 'শিব আভরণ' চাঁদের অভাব যেন তারকারাই পূর্ণ করার জন্য বদ্ধপরিকর। আর আকাশের বিভিন্ন রূপই বা কি বিচিত্র! পূর্বাহ্ণের আকাশ অপরাহ্ণে নবতর রূপ পরিগ্রহ করেছে। মধ্যাহ্নের আকাশে লঘু পক্ষ মেঘের সঞ্চরণও কী অপূর্ব! তার সেই বিচিত্র ও বিরাট রূপের কাছে 'মহা মহা সমুদ্র সকলও' তুচ্ছ। শুধু কি তাই? মহাবুদ্ধিমান মানুষের বুদ্ধিও তাতে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে। অনন্ত আকাশের ঊর্ধ্বে তার ওঠার শক্তি নেই।

সব চাইতে আশ্চর্য লাগে বিহারীলাল যখন এই নভোমণ্ডলকে 'বিশ্বব্যাপী, বিশ্বাধার, বিশ্বের কারণ' বলে বর্ণনা করেন। সৃষ্ট প্রকৃতি আর স্রষ্টার সঙ্গে মানুষ যখন নিজেকে নিয়ে একটি অখণ্ড বৃত্তের পরিপূর্ণতা বা সমগ্রতা কল্পনা করে তখনই বুঝি সৃষ্টিরহস্যের চাবিকাঠি সে খুঁজে পেয়েছে। যতদিন এ মহাসত্য অনুভূত না হয়, ততদিন চলে তার ব্যাকুল পরিক্রমা। তবে এও দেখা গিয়েছে যে কখনো কখনো মানুষ ধর্মতত্ত্বের আশ্রয়ে এই সত্যোপলব্ধিতে এসেছে। শিল্পী সাহিত্যিকের ক্ষেত্রে তা আসে রূপতত্ত্বের আশ্রয়ে। তাই বিস্তৃততর পটভূমিতে একে সত্যোপলব্ধি না বলে বলতে পারি রসোপলব্ধি। যোগী যোগমগ্ন আর ভোগী ভোগমগ্ন এই রসেরই সন্ধানে। কবিও রসসন্ধানী। দীর্ঘকাল নিরলস সন্ধানের শেষে তার সন্ধান মেলে। রসসত্য একটি পরমলগ্নে কবির মনোমন্দিরে মূর্ত বিগ্রহের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এর উদ্বোধনে সহায়তা করে বোধি। একে মিষ্টিক দৃষ্টি বলাই সঙ্গত।

'নিসর্গ সন্দর্শন'-এর মিষ্টিক কবি প্রকৃতিকেই দর্শন করে নিয়েছেন। তারই আধারে তাঁর আত্ম ও বিশ্বদর্শন। দার্শনিকের মতে প্রকৃতিরূপ 'দর্পণে মানুষ নিজেকে সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পায় না। চিন্ময় না হইলে চিন্ময়কে ধারণ করিবে কে?'[৩] কিন্তু এও তাঁরা স্বীকার করেছেন, প্রিয়জন সান্নিধ্যে নিসর্গসৌন্দর্যানুরাগ রসোপলব্ধির তীর্থসঙ্গমে পরিপূর্ণতা লাভ করে। আর বিহারীলাল স্বীয় চিৎ বা জ্ঞানময়

সত্তাকে আবেগের কাছে বিসর্জন দেননি, তাই বিশ্বপ্রকৃতি তাঁর সার্থক দর্পণ হতে পেরেছে। প্রথম থেকেই আমরা শুনে আসছি প্রিয়জন-সান্নিধ্যের কথা। পারিবারিক আবেষ্টনীর মধ্যে যা ছিল 'অনুরাগী প্রমদার' প্রেম, কালে ব্যাপ্তি লাভ করে তাই উদার প্রকৃতিপ্রীতিতে পরিণত হয়েছে। নীল আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে তাকেই বিশ্বসৌন্দর্য আর বিরাট প্রাণের আধার কল্পনা করা বিজ্ঞানসম্মতও বটে। 'ঈশ্বরের ন্যায় সব ঐশ্বর্য তোমার, অথচ কিছুই নও ঈশ্বর যেমন', কবির এই বক্তব্যটিকে নিম্নোক্ত রবীন্দ্র উদ্ধৃতির মধ্যে আরও স্পষ্টভাবে ধরা যাবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

'লোকালয়ের হাটে ভূমি বিক্রি হয়, আকাশ বিক্রি হয় না। কিন্তু পৃথিবীর বস্তুপিণ্ডকে ঘেরিয়া যে বায়ুমণ্ডল আছে, জ্যোতির্লোক হইতে আলোকের দূত সেই পথ দিয়াই আনাগোনা করে। পৃথিবীর সমস্ত প্রাবণ্য ঐ বায়ুমণ্ডলে। ঐখানেই তাহার জীবন।'[৪]

পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম সর্গের বিষয়বস্তুর মধ্যে ঘটনা ও কালগত ঐক্য আছে। বলা যায়, একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করেই কবিতা তিনটি রচিত। শীর্ষকগুলি যথাক্রমে 'ঝটিকার রজনী', 'ঝটিকা সম্ভোগ' আর 'পরদিনের প্রভাত'।

বাংলা ১২৭১ সালের আশ্বিন আর ১২৭৪ সালের কার্তিক মাসে যে দুটি ঝড় কলকাতার ওপর দিয়ে বয়ে যায়, তারই ভীষণরূপের বর্ণনা প্রথম দুটি কবিতায় করেছেন কবি। তৃতীয় কবিতাটি ১২৭৬ সালের ১৬ই কার্তিকের ঝড়ের পরদিন অর্থাৎ ১৭ই কার্তিক সকাল-বেলার বর্ণনা। ঝড়ের ভয়াবহতা বর্ণনামূলক দু'টি এবং ঝড়ের পরবর্তী বর্ণনামূলক একটি এই তিনটি কবিতাকে একই বিষয়বস্তুর আধারে ধরা যায়।

প্রকৃতিবর্ণনায় বিহারীলাল যে রীতির পরিচয় দিয়েছেন এই তিনটিতেই তা অনায়াসে চোখে পড়ে। সে বৈশিষ্ট্যটি হোল, প্রকৃতির রুদ্র আর শান্তরূপের বর্ণনা। এ কেবলমাত্র বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য

তুলনামূলক আলেখ্য অঙ্কনই নয়, এরই মধ্যে নিহিত আছে প্রকৃতির বাস্তবস্বরূপ। এই বাস্তবধর্মী চিত্রাঙ্কন আধুনিক মনোভঙ্গীর অন্যতম লক্ষণ।

পঞ্চম-সর্গের 'ঝটিকা রজনী' শীর্ষক কবিতায় প্রকৃতির বিপরীত রূপবর্ণনাটি সুন্দর। বাতাস 'জগতের প্রাণ' সে মৃদুমন্দ গতিতে কুসুমের সুবাস বহন করে নিয়ে যায়, শোকার্তের দেহ পরম সহৃদয়তায় স্পর্শ করে তার 'তপ্ত অশ্রু' মুছিয়ে দেয়। এই বাতাস আবার 'ছেলেদের ঘুমের বেলায় ঘুমপাড়ানী মাসী পিসি' গানও গেয়ে যায়। কিন্তু আজ তার মূর্তি 'দুর্দান্ত মাতাল'। তার 'প্রচণ্ড প্রতাপে' আজ 'ধরাধাম যায় রসাতল'। কবি ঠিকই বলেছেন যে 'ভয়ে আর বিস্ময়ে' সেকালের লোক 'পূজেছে পবন'। প্রকৃতির ভয়াবহতা আর রক্তলোলুপতাকেই আদিযুগের মানুষ পরম বিস্ময়ে লক্ষ্য করেছে। অনুমান করে নিয়েছে কোনো কোনো দেবতাকে, এই শক্তির উৎস হিসেবে। নিতান্ত প্রাণেরই দায়ে তাই সেইসব দেবতাকে তুষ্ট রাখার চেষ্টা করেছে সে যুগের মানুষেরা। বিশ্বপ্রকৃতিতে নরাত্মারোপের সূচনা সেইখানে। সেরূপের রুদ্র অংশটিই সেদিন আদিম মানুষের চোখে পড়েছিল। প্রকৃতির শান্ত স্নিগ্ধ রূপটি মানুষের কাছে ধরা পড়েছে এর অনেক পরে, আত্মরক্ষার যুগ পেরিয়ে আত্মপ্রসারের যুগে।

ষষ্ঠ-সর্গের 'ঝটিকা সম্ভোগ' পূর্বতন ঘটনারই অন্তিম অংশ। এ কবিতাটির নাট্যধর্ম স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথনের মধ্যে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। কবি-স্বামীর বক্তব্য সাধারণ ভাবেই লিপিবদ্ধ হয়েছে। স্ত্রীর বক্তব্য কিন্তু লিপিবদ্ধ হয়েছে উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে। জ্যেষ্ঠপুত্র অবিনাশ সম্পর্কে বা আপন পত্নী সম্পর্কেই শুধু উৎকণ্ঠা প্রকাশিত হয়নি, প্রকাশিত হয়েছে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের জন্যও অপরিসীম উদ্বেগ।

সপ্তম-সর্গের উপজীব্য বিষয় 'পরদিনের প্রভাত'। দুরন্ত ঝড়ের উন্মত্ত নৃত্যে বিশ্বপ্রকৃতির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গিয়েছে। মাতা

বসুন্ধরা ক্লিষ্টা। ঝড় থেমে যাবার পর মাতা বসুন্ধরার সেই ক্লিষ্টরূপটি কবিতায় বর্ণিত। কবি বলছেন—

ধরা অচেতন হয়ে প'ড়ে পদতলে,
ছিন্ন ভিন্ন কেশ বেশ, বিকল ভূষণ,
লাবণ্য মিলায়ে গেছে আনন কমলে,
বুঝি আর দেহে এর নাহিক জীবন। (৩)
... ...
ওই সব বিশীর্ণ প্রাসাদ পরম্পরা
দাঁড়াইয়ে ছিল কাল প্রফুল্ল বদনে,
আজ ওরা লণ্ড ভণ্ড, চুরমার করা,
হাতী যেন দলে গেছে কমল কাননে। (৭)

সর্বশেষ স্তবকে বাতাসের উদ্দেশ্যে যে মৃদু ভর্ৎসনাটি উচ্চারিত হয়েছে সেটি সুন্দর: কবি বলেছেন—

এখনো ধাইছ দেব অশান্ত পবন,
দয়া মায়া নাই কিগো তোমার হৃদয়ে।
স্থির হও, খুলে দাও মেঘ আবরণ,
বাঁচুক ধরার প্রাণ অরুণ উদয়ে। (১২)

'নিসর্গ সন্দর্শন' কাব্যগ্রন্থের মধ্যে কবি-প্রতীতির একটি দিক বারে বারেই প্রকাশিত হয়েছে। প্রকৃতি রমণীয় এবং আকর্ষণীয়, সন্দেহ নেই। কিন্তু তার শক্তিমত্তার কাছে মানুষ অত্যন্ত অসহায়। এই অসহায়তা সমুদ্রের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অনুভব করেছেন, আবার অনুভব করেছেন ঝড়ের রাতেও। 'সমুদ্র দর্শন' কবিতার মধ্যে বলেছেন—

কলের জাহাজ চোড়ে মানব সকলে,
দম্ভ ভরে চোকে আর দেখিতে না পায়,
মনে করে তোমারে এনেছে করতলে,
যা খুশি করিতে পারে, কিছু না ডরায়। (৩২)

কিন্তু তব ভ্রুক্ষেপের ভর নাহি সয়,
একমাত্র অবজ্ঞার কটাক্ষ ইঙ্গিতে,
একেবারে ত্রিভুবন হেরে শূন্যময়,
কাত হয়ে শুয়ে পড়ে জাহাজ সহিতে। (৩৩)

'বীরাঙ্গনা' শীর্ষক কবিতার মধ্যেও এ ধরনের বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। কবি বলেছেন—

যতই হইছে ক্রমে যামিনী গভীর,
ততই বাদল বেগ যাইতেছে বেড়ে,
তোলপাড় ত্রিভুবন, ধরিত্রী অধীর,
প্রকুপ্ত নিয়তি যেন আসিতেছে তেড়ে। (২৩)
মানুষের বুকে আর কত ধাক্কা সয়,
যুঝে যুঝে এলাইয়ে পড়িল তাহারা,
নির্ভর হৃদয়ে হ'ল ভয়ের উদয়,
ক্ষণপরে সেইস্থানে প্রাণে যাবে মারা। (২৪)

'নভোমণ্ডল' কবিতার মধ্যে 'মানুষের বুদ্ধিবেগ বিদ্যুতের ছটা' বলে স্বীকার করেছেন। কিন্তু তারও সীমা আছে। সেই বুদ্ধি নভোমণ্ডলের রহস্য ভেদ করার জন্য যখন সচেষ্ট হয় তখন 'পুনঃ পুনঃ ধাক্কা খেয়ে আসে পাছু হোটে'। নিসর্গকে জয় করার চেষ্টা তার ব্যর্থ হয়।

'ঝটিকা রজনী' কবিতার মধ্যে মানুষের অকিঞ্চিৎকর শক্তির কথাও যথেষ্ট পরিহাসের সঙ্গেই ব্যক্ত করেছেন। কবি বলেছেন,—

শোলার মানুষগুলো কম ঠেঁটা নয়,
ফানুষ ছুটাতে চায় তোমার হৃদয়ে,
কোথা তারা? আসুক বাহিরে এ সময়,
দাঁড়ায়ে দেখুক চেয়ে হতবুদ্ধি হয়ে। (৭)

সমকাল ও পরিবেশ সচেতনতা বিহারীলালের যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। 'ঝটিকা সম্ভোগ' কবিতার ১৮শ স্তবকের সর্বশেষ ছত্রে কবি বলেছেন, সরস্বতী স্বজাতির পক্ষপাতী বড়। হেমচন্দ্র, বিহারীলাল

ও নবীনচন্দ্রের সমকালীন কাব্যজগতে বহু মহিলা কবি আত্মপ্রকাশ করেছিলেন তাঁদেব অনেকেরই কবিতা-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। যাঁদের রচনা গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়েছে তাঁদের সংখ্যাও কম নয়। ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় যে কাব্য তালিকা[৬] প্রকাশ করেছেন, সেটিকে প্রামান্য হিসেবে গ্রহণ করলে কবির এ মন্তব্যকে বাস্তব সচেতনতার অভ্রান্ত সাক্ষ্য বলে স্বীকার করতেই হয়।

'বন্ধু বিয়োগ', 'প্রেম প্রবাহিনী' ও 'নিসর্গ সন্দর্শন' কাব্যগ্রন্থগুলি সম্পর্কে ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়-এর মত, 'বিহারীলালের এই কাব্য দুইখানিতে (বন্ধুবিয়োগ ও প্রেম প্রবাহিনী) কোথাও কবির শক্তির অস্ফুটতম প্রকাশ ও লক্ষ্য করা যায় না।'[৭] 'নিসর্গ সন্দর্শন' কাব্যেও কবির বিষয়ের গভীর প্রবেশ ক্ষমতা আয়ত্ত হয় নি। সমুদ্রদর্শন, নভোমণ্ডল, ঝটিকাসম্ভোগ প্রভৃতি কবিতাগুলিতে কবির অনুভূতি গভীরভাবে উদ্রিক্ত হইয়াছে এমন লক্ষণ পাওয়া যায় না।'[৮] কিন্তু তারাপদ বাবু 'সমুদ্র দর্শন' কবিতাটির জায়গায় উপমার সৌন্দর্য লক্ষ্য করেছেন।'[৯]

সফলতার সঙ্গে উপমা ব্যবহার করেছেন অথচ কবির ভাবানুভূতি গভীর নয়, এই মতবাদের মধ্যে স্বতোবিরোধিতা আছে। প্রকৃতিতে নীতিবাদ বা গুরুতর কোন চিন্তা আরোপের যে পথ হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি কবিগণ গ্রহণ করেছিলেন, বিহারীলাল সে পথ পরিত্যাগ করেছেন। অন্তরের স্বতোৎসারিত আনন্দের সহস্রধারায় তিনি প্রকৃতিতে অভিসিঞ্চিত করেছেন। বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে অন্তঃপ্রকৃতির ঐক্য সূত্রটি অনায়াসে আবিষ্কার করে বিশ্বব্যাপ্ত আনন্দযজ্ঞে আপনার স্থানটি সুনির্দিষ্ট করে নিয়েছেন। যেমন নিয়েছেন পরবর্তীকালে বিহারীলালের ভাবশিষ্য রবীন্দ্রনাথ। এ যদি সত্যিই সম্ভব না হোত তা হলে সার্থক উপমার ব্যবহারও কবির পক্ষে সম্ভব হোত না। এ বিষয়ে Caroline F.E. Spurgeon এর একটি বিখ্যাত প্রবন্ধের অংশ বিশেষ লক্ষণীয়।

তিনি বলেছেন—

'We know that, roughly speaking, it is, as I have already said, the little word-picture used by a poet or a prose-writer to illustrate, illuminate and embellish his thought. It is a description or an idea, which by comparison or analogy, stated or understood with something else, transmits to us through the emotions and associations it arouses, something of the 'wholeness', the depth and the richness of the way the writer views, conceives or has felt what he is telling us. The image thus gives quality, creates atmosphere, and conveys emotion in a way no precise description, however clear and accurate, can possibly do'.[১০]

কবি প্রথমে দ্রষ্টা তার পর রসস্রষ্টা। এই রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর প্রচেষ্টা যতবেশী আন্তরিক উপমার প্রয়োগের প্রচেষ্টা ততবেশী তীব্র। আবার একথাও স্মরণীয় যে, দ্রষ্টা হিসাবে কোথাও যদি ফাঁক থেকে যায় তাহলে বাক্‌প্রতিমা বা উপমাসৃষ্টিতে সাফল্য অসম্ভব। প্রকৃত পক্ষে রূপকল্প কবিমনের প্রতিরূপ। অনুভূতির গভীরতা যেখানে যত বেশী, উপমাসৃষ্টির প্রয়াস সেখানে তত সফল।

কবি বিহারীলালের প্রকৃতি-প্রেমিকতা বিস্ময়ও সৌন্দর্য-প্রীতিতে পরিপূর্ণ। নিসর্গ-সন্দর্শন মূলক কবিতাগুচ্ছের মধ্যে এই দু'টি বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবেই প্রকাশিত। 'নভোমণ্ডল' কবিতাটির—

অসংখ্য অসংখ্য তারা চোকের উপর,
প্রান্তরে খদ্যোত যেনচ্ছলে দলে দলে,
স্থানে স্থানে দীপ্তি দেয় নক্ষত্রনিকর,
কতস্থানে কত মেঘ কতভাবে চলে। (১৪)

অথবা

শূন্যে শূন্যে মেঘমালে নাচিয়ে বেড়ায়,
চঞ্চলা চপলা মালা তব নৃত্যকরী
যেন মানসরোবর লহরী লীলায়
উল্লাসে সন্তরে সব অলকা সুন্দরী। (৬)

অথবা 'সমুদ্রদর্শন' কবিতায়—

আপনার মনে ওহে উদার সাগর
গড়ায়ে গড়ায়ে তুমি চলেছ সদাই,
প্রাণীদের কলরবে গোরা চরাচর
কিন্তু তব কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই। (৮)
আহা সদাশয় সাধু উদার অন্তরে,
থাকেন আপন ভাবে আপনি মগন,
জনতার কলকলে তাঁহার কি করে?
প্রয়োজন জগতের মঙ্গল সাধন। (৯)
কেন তুমি পূর্ণিমার পূর্ণ সুধাকরে
হেরে যেন হয়ে পড় বিহ্বলের প্রায়?
ফুলে ওঠে কলেবর কোন্ রস ভরে,
হৃদয় উথুলে যেন চারিদিকে ধায়? (১০)

অথবা 'ঝটিকার রজনী' কবিতার—

বিচিত্র হে লীলা তব জগতের প্রাণ!
তুমিই না গুড়ি গুড়ি কুসুম কাননে
পশিয়ে রসিয়ে গাও প্রণয়ের গান,
চুম্বি চুম্বি ফুল ফুল প্রফুল্ল আননে? (১১)
তুই না শোকার্তের বিজন কুটীরে,
কাতর করুণস্বরে শোক গান গাও,
সদয় হৃদয়ে তার অতি ধীরে ধীরে
নয়নের তপ্ত অশ্রু মুছাইয়ে দাও। (১২)—

প্রভৃতি অংশ পাঠ করার পর 'কবির বিষয়ের গভীর প্রবেশ ক্ষমতা

হয় নাই' বা 'কবির অনুভূতি গভীরভাবে উদ্রিক্ত হইয়াছে এমন লক্ষণ পাওয়া যায় না' প্রভৃতি উক্তি স্বীকার্য নয়। কবিতার দুর্বল অংশ থেকে ইতস্তত: উদ্ধৃতি সংগ্রহ করে 'একটি লাইনও কবিতার রূপ পায় নাই'[১১] বলা সহজ। বোধ হয়, এভাবে যশস্বী যে কোন কবি সম্পর্কেই বিরূপতা প্রকাশ করা হয়। কিন্তু সাহিত্য সমালোচনা কোন সাহিত্যেরই আংশিক বিচার নয়। সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সম্পূর্ণ সাহিত্যের বিচারই সমালোচকের কর্তব্য। সমগ্রভাবে 'নিসর্গ সন্দর্শন' কবির অনুভূতিগভীরতাই প্রকাশ করে, যেমন প্রকাশ করে প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর বহু বিচিত্র চিন্তার ধারা। বিহারীলালের কাব্য ধারায় প্রেম থেকে প্রকৃতি-প্রীতিতে উত্তীর্ণ হওয়া আর প্রকৃতি-প্রীতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আমরা ইতিমধ্যেই বহুবার আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, প্রকৃতি-প্রীতির মধ্যে যথেষ্ট গভীরতাই শুধু নয়, তাকে আশ্রয় করে জগৎ ঐক্য সম্পর্কে একটা মিষ্টিক দৃষ্টিও কবির গড়ে উঠেছে। যাকে mighty sense experience বলে, বিহারীলালের তা যথেষ্ট পরিমানেই ছিল তাই তাঁর রচনায় নির্বিশেষের ব্যঞ্জনা অনায়াসে ধরা পড়ে। অবশ্য একথা আমরা স্বীকার করি যে কবি বিহারীলাল বক্তব্যের মধ্যে পারম্পর্য রক্ষা করে চলতে পারেন না। কিন্তু সেই অসংলগ্নতাও ভাব গভীরতারই একটি দিক।

আগেই বলেছি যে, বিহারীলালের কবিসত্তার প্রকৃত মূল্যায়নে যে অল্পসংখ্যক সমালোচক কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন তাঁদের মধ্যে ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় অন্যতম। কবির বক্তব্য প্রকাশের ক্ষেত্রে অসংলগ্নতা সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'কবি গোপনে, অল্পাধিক পরিমানে, এই প্রকৃতির গীত গাইতেন, কখনও কখনও অশরিরী স্বরূপের শরীর ছন্দোবদ্ধ দ্বারা গঠিতও করিতেন। যাহা গঠিত হইত, তদীয় গীতস্বরূপের সর্বাঙ্গগঠনে তিনি সমর্থ ছিলেন এমনও বলিতে পারি না। গান শান্ত সংকীর্ণ, ধ্যান অসীম অনন্ত। অসীম সৌন্দর্য সসীম দ্বারা সুব্যক্ত করিতে কে কবে পারিয়াছে'?[১২]

কবি বিহারীলালের নিসর্গসন্দর্শন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'নভোমণ্ডল' শীর্ষক চতুর্থ সর্গ থেকে 'ঝটিকা সম্ভোগ' শীর্ষক ষষ্ঠ সর্গ পর্যন্ত তিনটি দীর্ঘ কবিতার মধ্যে কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 'আকাশ' ও 'বৈকালিক ঝড়' কবিতাদ্বয়ের ছায়া দেখা যায়। 'নিসর্গ সন্দর্শন' প্রকাশের বহু পূর্বেই 'সদ্ভাব শতক' কাব্যগ্রন্থে 'কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের এ দু'টি কবিতা প্রকাশিত হয় ফলে বিহারীলালের কবিতার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের প্রভাব এসে পড়া অসম্ভব নয়।

'নিসর্গ সন্দর্শনে' কবি অক্ষরমাত্রিক ১৪ মাত্রায় পয়ারকে তাঁর বাহন করেছেন, যুক্ত-ব্যঞ্জনধ্বনির সদ্ব্যবহারের উদ্দেশ্যেই। এই শ্রেণীর পয়ারের যে শোষণ ক্ষমতা রয়েছে তার যথাযথ ব্যবহার করে যুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনির দ্বারা বৈচিত্র্য সৃষ্টিই এ ক্ষেত্রে কবির উদ্দেশ্য। এখানে তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি যেভাবে এ ছন্দকে কাজে লাগিয়েছেন, তার কিছু উদাহরণ নিম্নোক্ত ছত্রগুলিতে দেখা যায়-

'বিষণ্ণ গম্ভীর মূর্তি বিভ্রান্ত উদাস' (১।২২)
'উজ্জ্বল করিবে মুখ প্রতিভা প্রভায়' (১।২৪)
'দেবের দুর্লভলঙ্কা ভূস্বর্গ দ্বারকা' (২।৩৭)
'প্রলয় প্রলুপ্ত সেই মূর্তি ভয়ঙ্কর' (২।৪০)
'ঝঞ্ঝা ঝটিকারে করি অতিতুচ্ছজ্ঞান' (৩।১৮)
'ব্রহ্মের অণ্ডের অর্ধ খণ্ড অবিকল' (৪।১)

এইভাবে বহু ছত্র উদ্ধৃত করে কবির ৮৬ মাত্রার ছন্দোরীতি ব্যবহারের যুক্তিযুক্ততা প্রমাণ করা যায়। এ কথা কিন্তু প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না যে যুক্ত-ব্যঞ্জন ধ্বনির সুমিত ব্যবহার 'নিসর্গ সন্দর্শন'কে অনেক বেশী পরিমাণে বৈচিত্র্যপূর্ণ করে তুলেছে।

বিহারীলালের ভাষা সম্পর্কে পূর্ববর্তী গ্রন্থালোচনায় স্বীকার করে নিয়েছি যে কোলকাতার কথ্য ভাষার কিছু শব্দ ব্যবহৃত হওয়ার দরুন স্থান-গরিমা বৃদ্ধি পেলেও কোন কোন ক্ষেত্রে তা অবশ্যই শ্রুতিকটু এবং পীড়াদায়ক হয়েছে। একথা কিন্তু স্বীকার করতেই হয় যে

বিহারীলাল অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গেই মধুসূদনের ভাষারীতির নৈর্ব্যক্তিকতাকে পরিহার করেছেন। মগ্নময়তা মুখ্য গীতিধর্মী কবিতার জন্য কবির চিন্তাজগতে ব্যবহৃত মাধ্যম যে ভাষা, তারই ব্যবহার সুসঙ্গত। কবি এই রীতির প্রবর্তন করে গীতিকবিতার সুস্থ সুন্দর একটি আভিজাত্য সৃষ্টি করেছেন। চিন্তা ও প্রকাশ এক্ষেত্রে অভিন্ন। এই অভিন্নতা বজায় রেখেও কিঞ্চিৎ 'গৃহিনীপনার' সাহায্যে অবশ্যই শ্রুতিকটু অংশগুলির মার্জনা করা যেত, যথাযথ বিন্যাসের সাহায্যে ভাষা কাব্যমূল্য আরও বর্ধিত করতে পারত। সঞ্জীবচন্দ্র সম্পর্কে উক্তিটি এক্ষেত্রে বিহারীলাল সম্পর্কেও প্রযোজ্য, 'এঁর প্রতিভা ধনী, কিন্তু গৃহিনী নহে।'[১৩]

বিহারীলাল সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। প্রাকৃত ভাষার পরিবর্তে সংস্কৃতানুসারী ভাষা ব্যবহার তাঁ পক্ষে ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু আত্মমগ্ন কবির ভাবপরিমণ্ডল রচিত হয়েছিল স্বতোৎসারিত মাতৃভাষায় এবং তাও বিশুদ্ধ কেতাবী ধরনের ভাষা-ভঙ্গীতে নয়, নিতান্তই নিত্য ব্যবহার্য কথ্য ভাষায়। আর কবি বিহারীলালের ক্ষেত্রে কাব্যের বহিঃকরণ আর অন্তঃকরণ দুটি পৃথকবস্তু নয়, এক এবং অভিন্ন। আভিজাত্য বর্জিত আটপৌরে কথ্য ভাষার ব্যবহারে বিহারীলাল যে নব্য ধারার প্রবর্তন করলেন, পরবর্তীকালে তারই মার্জিত আর পরিশীলিত রূপ রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর উত্তরপুরুষদের মধ্যে দেখা গিয়েছে। বিহারীলালের ভাষা সম্পর্কে ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের মতটিও স্মরণীয়। তিনি বলেছেন, 'ভাষা ভাবের অভ্যন্তর হইতে স্বতঃনির্মিত হইয়া আসে। ভাবের সহিত তাহা অবিচ্ছিন্নভাবে সংমিলিত, যে কাব্যে তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব তাহা শাব্দিক কবির কবিতা।'[১৪]

কবিতার ভাষারীতিকে পরিত্যাগ করে গদ্যে ভাষার মধ্যেই কবিতার সঞ্চার করবার চেষ্টায় বিহারীলালের উত্তরসূরী রবীন্দ্রনাথ। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের স্বল্পায়তন ভূমিকাটি স্মরণীয়।

'নিসর্গসন্দর্শন' কাব্যগ্রন্থের মধ্যেও অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক প্রবাদ ধর্মী ছত্রাবলীর অভাব নেই। যে ছত্রগুলি বিশেষভাবেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা হোল—

'হায়, সে সুখের কাল রহে অল্পক্ষণ' (১।৪)

'সফরী গণ্ডুষজলে ফর্ফরি বেড়ায়' (১।৮)

'ভালোবাসা এ জগতে কারে না মাতায়

সুখের সামগ্রী হেন কি আছে ভুবনে? (২।১১)

'বিধবা-যৌবন যেন বিফলেতে যায়!' (২।১১)

উল্লেখপঞ্জী

১. উজ্জ্বল কুমার মজুমদার : বাংলা কাব্যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব, পৃঃ-১৬২

২. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অরুনকুমার মুখোপাধ্যায় : উনবিংশ শতাব্দীর গীতিকবিতা সংকলন, ১ম সংস্করণ, ভূমিকাংশ, পৃঃ ১।

৩. গোপীনাথ কবিরাজ : সাহিত্য চিন্তা, ১ম সংস্করণ, পৃঃ-৬৭

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : আষাঢ়, রবীন্দ্র বচনাবলী (পঃ বঃ সরকার), ১৪শ খণ্ড, পৃঃ-৭৬২

৫. শ্রীঅবিনাশ চক্রবর্তী : ইনি পিতার রচনাবলী দুইখণ্ডে প্রকাশ করেন। কবির বংশ লতিকাটি গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে দ্রষ্টব্য। ইনি কবি ছিলেন।

৬. অরুনকুমার মুখোপাধ্যায় : উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য, ১ম সংস্করণ, পরিশিষ্টাংশের '(খ) কাব্য তালিকা' দ্রষ্টব্য।

৭. তারাপদ মুখোপাধ্যায় : আধুনিক বাংলাকাব্য, ৪র্থ মুদ্রণ, পৃঃ-১৪৪

৮. " " " " " পৃঃ-১৪৫৬

৯. " " " " " পৃঃ-১৪৫

১০. Coroline F. E Spurgeon : Shakespeare's Imagery and what it tells us : Cambridge University Press, Reprint 1968, Page 9

১১. তারাপদ মুখেপোধ্যায় : আধুনিক বাংলাকাব্য : ৪র্থ মুদ্রণ, পৃঃ ১৪৪

১২. সমালোচনা সাহিত্য-সম্পাদক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রফুল্লচন্দ্র পাল, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ২৭৭

১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সঞ্জীবচন্দ্র, রবীন্দ্র রচনাবলী (পঃ বঃ সরকার), ১৩শ খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃঃ-৯১৬

১৪. সমালোচনা সাহিত্য-সম্পাদক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রফুল্লচন্দ্র পাল, ২য় সংস্করণ, পৃঃ-৩০৩

বিহারীলালের 'বঙ্গসুন্দরী'কে প্রেমমূলক ও প্রকৃতিমূলক কাব্য বলে উল্লেখ করেছেন সমালোচকরা। এটি মোট দশসর্গে বিভক্ত কাব্য। এই কাব্যে কবি বঙ্গরমনীর যে রূপ বিভিন্নতার বর্ণনা করতে চেয়েছেন, কবির বক্তব্যে তা হোল—

এ বঙ্গসুন্দরী মাঝে,
আটজন নারী রাজে,
স্নেহ প্রেম করুণা আধার। (১।৫০)
সুরবালা, চিরপরাধিনী,
করুণা সুন্দরী, বিষাদিনী,
প্রিয়সখী, বিরহিনী
প্রিয়তমা, অভাগিনী,
এই অষ্ট বঙ্গ সীমন্তিনী। (১।৫১)

এই আট রকমের ভাবকল্পনায় কবি বঙ্গসীমন্তিনীদের দেখেছেন। এর সঙ্গে সাধারণ ভাবে যুক্ত হয়েছে 'নারী বন্দনা' শীর্ষক একটি সর্গ। এরপর এই ন'টি সর্গকে সূত্রবদ্ধ অবস্থায় প্রিয়বন্ধু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের হাতে অর্পণ করা হয়েছে। এই বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক সর্গটি 'উপহার' নামক সর্গ।

'পিতৃ-তর্পন' শীর্ষক প্রবন্ধে কবিপুত্র অবিনাশ চক্রবর্তী যে সব তথ্য পরিবেশন করেছেন তাতে জানা যায় যে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য তাঁর নিজের 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্য গ্রন্থটিতে 'উপহার' শীর্ষক কবিতার তলায় বড় বড় অক্ষরে লিখেছিলেন, 'এই সখা তাঁহার বাল্যকালের বন্ধু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য। এই কয়েকটি পদ্যপঙ্‌ক্তি কৃষ্ণকমল নিজের Certificate এর মত জ্ঞান করেন এবং Value করেন। বেহারীর পদ্য যদি স্থায়ী হয়, কৃষ্ণকমলের নামটাও টেঁকে যাবে, এই লোভে কৃষ্ণকমল এই টিপ্পনিটি সংযোজন করিয়া রাখিলেন।'[১]

সাংসারিক জটিলতা আর কুটিলতায় মর্মবেদনা-গ্রস্ত কবির হাহাকার দিয়ে 'উপহার' শীর্ষক প্রথম সর্গটি আরম্ভ। সংসারে সুখ নেই, শান্তি নেই। সেখানে বসবাস করার চাইতে 'যথায় নগর গ্রাম নহে মানুষের ধাম, পড়ে আছে ভগ্ন অবশেষ' বা 'শূন্যময় নির্জন শ্মশান, নিস্তব্ধ গভীর গোর স্থান' অনেক বেশী শান্তিপ্রদ। কবির ভয় কুটিল চরিত্রের 'মানুষজন্তুকে' যতখানি ব্যাঘ্রে সর্পে ততখানি নয়। কবি-মন আকৃষ্ট হয় বহির প্রকৃতির উদার প্রাঙ্গণের দিকে। ঝরণার মোহময় পরিবেশ, সমুদ্রের দিগন্তবিস্তৃত বিরাট মূর্তিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে তারই বেলাভূমিতে, এমন কি দূর পল্লী গ্রামে চাষীদের মাঝে রয়ে, চাষীদের মত হয়ে' ও যে অনেক বেশী সুখশান্তি পাওয়া যায় সে বিষয়ে কবির বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

ব্যক্তিগত জীবনে ক্ষোভ যদি অসংকোচে বন্ধুর কাছে কেউ প্রকাশ করতে পারে তাহলে,'হাঁপ ছেড়ে প্রান তার বাঁচে'। 'সঙ্গীত শতক'-এর মধ্যে শোনা গেছে 'বন্ধুর নিকটে দুখ জানালে কমিয়া যায়, কিন্তু হায় হেন বন্ধু কোথা বল পাওয়া যায়?' কিন্তু অসমবয়স্ক হলেও বন্ধুর মত বন্ধু পাওয়া গেল। কবি বিশ্বাস করেছেন এঁর সান্নিধ্যে, সুখ দুঃখের সমপ্রানতায় তাঁর বহুদিনের অভাব দূর হবে। প্রকৃতপক্ষে এ বিশ্বাসই কবিকে তাঁর প্রিয়তমবন্ধু কৃষ্ণকমল-এর কাছে টেনে এনেছে। তিনি শুধু প্রিয়তম সখা সুহৃদই নন, তিনি উদার হৃদয় বুদ্ধিমান ব্যক্তি আর দর্শন ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত। এই কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্যটি বড় সরস। তিনি রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত একটি পত্রে বলেন, 'কৃষ্ণকমল is not যে সে লোক he is a terrible fellow. He knows how to write and how to fight and how to slight all things devine.'[২]

এঁকে প্রতিভাবান, বুদ্ধিজীবী আর নিরহংকার বলে বর্ণনা করেছেন কবি। 'বুদ্ধি' আর 'হৃদয়' আপাতদৃষ্টিতে বিপরীতমুখী হলেও এদুটির প্রাধান্য যাঁদের জীবনে তাঁদের সম্বন্ধে কবির মন্তব্যটি প্রনিধান যোগ্য।

বুদ্ধি আর হৃদয়ে মিলন
বড় সুশোভন, সুঘটন,
বুদ্ধি বিদ্যুতের ছটা,
হৃদয়নীরদ ঘটা,
শোভা পায়, জুড়ায় দু'জন।

কবির বন্ধুপ্রীতি ছিল অত্যন্ত গভীর আর এই প্রীতি তাঁর কবি-জীবনকে বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করেছিল। এ প্রীতি আবাল্য অনুশীলনের ফল এবং এটি তাই কবির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ভবভূতির উক্তি উদ্ধৃত করে কবি বিহারীলাল সূচনাতেই বলেছেন 'গোত্রেষু চন্দনরসোদৃশি, শারদেন্দুএব হৃদয়ে', বন্ধুপ্রীতি শুধুমাত্র হৃদয়ানন্দকরই নয়, বন্ধুর প্রগাঢ় আলিঙ্গন শরীরের তৃপ্তিদায়কও বটে।

দ্বিতীয় সর্গের নামকরণ হয়েছে, 'নারীবন্দনা'। বাংলা কাব্য ধারায় নারী প্রথম পর্যায় থেকেই উপস্থিত। চর্যাপদ, কৃষ্ণকীর্তন, মঙ্গলকাব্যধারা, বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলী এবং এগুলির প্রায় সমান্তরাল লোকসঙ্গীতের ধারার দিকে দৃষ্টি দিলে চোখে পড়ে নারী কখনো দেবী কখনো মানবী মূর্তিতে তার বিচিত্র কর্তব্য পালনের জন্য সেখানে উপস্থিত থেকেছে। যাঁরা নিছক পৌরাণিক দেবীমূর্তিতে উপস্থিত তাঁদের সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এখান থেকেই নারী কাব্যকেন্দ্রে অপূর্ব মূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত হলেন। এ নারী গৃহচারিণী হয়েও রোম্যান্টিক মানসম্পর্শে আদর্শের সৌন্দর্যস্বর্গে প্রতিষ্ঠিত। প্রেয়সী শ্রেয়সী হয়ে উঠলেন উনিশ শতকে। সমাজে শুধু নয়, কাব্যে ও সাহিত্যে নারীর মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হোল। এই শ্রদ্ধাবোধের উৎকর্ষ মধুসূদন আর বিহারীলালের মধ্যে সুস্পষ্ট। সামাজিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে হোল নতুন দিগন্তের সূচনা।

নানা প্রসঙ্গে পূর্বেই আলোচিত হয়েছে, যে নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, ধর্মনীতির অধিষ্ঠাত্রী রূপে নারীকে গ্রহণ, কোঁতের ধ্রুব দর্শনের প্রভাব। সেকালে স্টুয়ার্টমিলের চিন্তাধারা

অবলম্বনে বঙ্কিমচন্দ্র 'সাম্য'গ্রন্থের মধ্যে এদেশের নারীদের সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন বিহারীলালের 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যে তার প্রভাবও কম নয়।[৩] বিহারীলালের নারীচেতনা তাঁর মানবচেতনামূলক বৃহৎ পটভূমিরই অংশ স্বরূপ। সমাজের পটভূমিতে এই নারীচেতনার উন্মেষে রামমোহন-বিদ্যাসাগর-কেশবচন্দ্র প্রভৃতির অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণীয়। নারীকে যথাযথ সামাজিক অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করবার পেছনে যে সসম্ভ্রম চিন্তা ছিল তারই উত্তরাধিকার অর্জন করেছিলেন বিহারীলাল। সেই চিন্তা কাল-ক্রমে কৃষ্ণকমলের সাহচর্যে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ও দর্শনের আলোচনায় শানিত হয়ে উঠেছিল। 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যের নারীচেতনাই শুধু নয়, কবির নারী সম্পর্কিত পূর্বাপর মানসিকতাটি সুসমার্জিত উভয়প্রকার চিন্তারই ফল।

স্নেহ, প্রেম, করুণা ও দয়ার জীবন্ত প্রতিমূর্তি নারী। তাঁর বিভিন্ন গুণের কথা স্মরণ করে কবি কখনো তাঁকে 'চাঁদের কিরণ' কখনো তাঁকে 'নিশার নীহার' কখনো 'ঊষার আলো', 'প্রভাতের ধীর শীতল পবন' কখনো বা 'গগনের নব নীরদমালা' বলে অভিহিত করেছেন। পুত্র, কন্যা, শ্বশুর শাশুড়ি এই সব প্রিয় পরিজন নিয়ে যে সংসার তার কেন্দ্র-বিন্দুতে এই নারী। শুধু কি তাই? এই নারী মূর্তির মধ্যে শিব-প্রিয়া উমা আর কৃষ্ণ-প্রিয়া রাধাকেও প্রত্যক্ষ করেছেন কবি। এ নারী সৃষ্টির আদিযুগ থেকেই নানা মূর্তিতে নানা ভূমিকায় বেদ-পুরাণে, কাব্য-ইতিহাসে, দৈনন্দিন জীবন-সম্পর্কিত সংসারে ও সমাজে বিরাজমানা।

'নারী বন্দনা' শীর্ষক এই সর্গের প্রথম স্তবকটি—

জগতের তুমি জীবিতরূপিনী,
জগতের হিতে সততরতা;
পুণ্য তপোবন সরলা হরিণী
বিজন কানন কুসুমলতা।

এ নারী গৃহলক্ষ্মী। কল্যাণধর্মের প্রতীক, মানবজীবনের প্রাণ

মূলে এ নারীর নীরব অবদান অসামান্য। কুটিলতার স্পর্শহীন প্রেম ও সারল্য-এর জীবন্ত-মূর্তি।

এই নারীর অবর্তমানে 'মনিময় রাজপ্রাসাদ' বিষাদমগ্ন। আবার এঁর অধিষ্ঠান হলে কুঁড়ের ভিতরে কুঁড়েখানি তবু সাজে গো ভাল।' তখন সে কুঁড়েটিকে মনে হয়, 'যেন ভগবতী কৈলাস শিখরে, বসিয়ে আছেন করিয়ে আলো।' বাঙ্গালীঘরের নারী মূর্তিকে এনে কৈলাস শিখরে প্রতিষ্ঠিত করে তাতে মহিমার যে ব্যঞ্জনা আরোপ করলেন, বাংলা ধারায় তা সম্পূর্ণ নতুন।

নবজাগরণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই নারী বন্দনা।[৪]

রবীন্দ্রনাথ যে নারীকে 'বৃন্তহীন পুষ্পসম' 'নন্দন বাসিনী উর্বশী'তে-পরিণত করেছেন, বিহারীলাল দেখেছেন তাঁকে গৃহলক্ষ্মীরূপে। কাব্যের আদিতে তিনি গৃহলক্ষ্মী রূপে দেখা দিয়েছেন অন্তে কবি সমস্ত চিন্তা ভাবনাকে সংহত করে নিয়েছেন ঐ মূর্তিরই মধ্যে। নারীকে তিনি দেবী মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন, কিন্তু বাস্তব জগতে এই নারীর যে কুৎসিত রূপও যে দেখা যায়, তা ভোলেন নি।

নারীর বিভিন্ন রূপ বর্ণনায় বিহারীলালের কৃতিত্ব অবিসংবাদিত। নারীকে তিনি পত্নীরূপে, পুত্র ও কন্যার মাতারূপে, সেবাপরায়না গৃহিনী রূপে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এইখানেই কবির চিন্তা তৃপ্ত হয় নি। এই নারীকে তিনি জগন্মাতার মূর্তিতে দেখেছেন। কবি তাঁর কল্পনার আলোয় দেখেছেন—

দুখীর বালক ধূলায় ধূসর
ক্ষুধায় আতুর, মলিন মুখ,
ডাকিয়া বসাও কোলের উপর
আঁচলে মুছাও আনন বুক। (২৮)
পরম করুণ জননীর মত
ক্ষীর সর ছানা নবনী আনি,

মুখে তুলে দাও আদরিয়ে কত,

গায়েতে বুলাও কোমল পানি। (২৯)

এই যে বহুরূপিনী নারী, যাঁর সেবায়, স্নেহ-প্রেমে আর করুণায় পৃথিবী সার্থক, তাঁর হৃদয়বত্তা তুলনীয় শুধু কুসুম-কাননের সঙ্গে, কবি বলেন—

হৃদয় তোমার কুসুম কানন

কত মনোহর কুসুম তায়,

মরি চারিদিকে ফুটেছে কেমন

কেমন পাবন সুবাস পায়। (১৪)

নারীর মাহাত্ম্য সম্পর্কেও কবি সচেতন। এই নারীমূর্তি কৈলাসে উমারূপিনী। সেখানে—

প্রেমের পাগল মহেশ ভোলা,

ধেয়ান তোমারি কমল চরণ

ভাবে গদ গদ মানস খোলা। (৩৩)

এই নারী রাধারূপিনী, কৃষ্ণের অভিলাষিতা চিরন্তনী। তাঁর জন্য—

নিশিথ সময়ে আজও বজ্রবনে

মদনমোহন বেড়ান আসি,

কালিন্দীর কূলে দাঁড়ায়ে, সঘনে,

রাধা রাধা বলে বাজান বাঁশি। (৩৪)

'অপর কেহ নারীজাতি সম্বন্ধে ইঁহার ন্যায় উচ্চ আদর্শ কথনও অনুভব ও অভিব্যক্ত করেন নাই'[৫]—সমালোচকের এই অভিমত অবশ্য মান্য। মাধুর্যেরও প্রতিমূর্তি এই নারী। কবির ভাষায়—

মধুর তোমার ললিত আকার

মধুর তোমার সরল মন,

মধুর তোমার চরিত উদার

মধুর তোমার প্রণয় ধন। (৩৯)

এই অপরূপ মাধুর্যের আটটি লিপি-প্রতিমা নির্মাণের বাসনা কবির। শিল্পী-কবির তাই প্রার্থনা—

অয়ি মধুরিমে, লোচন পূর্ণিমে
সমুখে আমার উদয় হও,
আঁকি আটখানি তোমার প্রতিমে
স্থির হয়ে তুমি দাঁড়ায়ে রও। (৪১)

কবি কিভাবে এই প্রতিমা নির্মাণ করতে চান তার বর্ণনাও দিয়েছেন নিজেই, কবি বলেছেন,—

দেহের মনের চেহারা তোমার
ভেবে ভেবে আজ হইব ভোর।
আচম্বিতে এক আসিবে আমার
আধ ঘুম্ ঘুম্ নেশার ঘোর (৪২)
ঢুলু ঢুলু সেই নেশার নয়নে
যেমনি মূরতি স্ফুরতি পাবে
আপনা আপনি হৃদি দরপণে
তেমনি আদরা পড়িয়া যাবে।

ভাবতন্ময় মুহূর্তে এক একটি মূর্তি যেভাবে কবির কল্পনা-পটে ধরা পড়বে, কবি সেভাবেই তাদের কাব্যপ্রতিমা গড়তে চান। ভাব-তন্ময়তা আর আত্মবিভোরতার সংমিশ্রণে গড়তে চান নারী মূর্তিগুলি।

তৃতীয় সর্গের 'সুরবালা' শীর্ষক কবিতার পটভূমিতে আছে কবিবন্ধু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য-এর নিখুঁত পারিবারিক চিত্র। এই পরিবারের সঙ্গে কবির সম্পর্কটি ছিল নিবিড়। কৃষ্ণকমলের অগ্রজ রামাকমল (১৮৩৪-৬০) ছিলেন বিহারীলালের সমবয়স্ক। কিন্তু বয়োকনিষ্ঠ কৃষ্ণকমলের (১৮৪৯-১৯৩২) সঙ্গেই তাঁর হৃদ্যতা ছিল বেশী পরিমাণে। কৃষ্ণকমল যে তীক্ষ্ণধী সম্পন্ন ও প্রতিভাবান ছিলেন সে কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়নের সময় তিনি এক

বার দেশ ভ্রমণের জন্য পশ্চিমে চলে যান। উৎসাহী পাঠকেরা এই দুই ভ্রাতার জীবনী 'সাহিত্যসাধক চরিতমালার' মধ্যেই সংগ্রহ করতে পারবেন।

'সুরবালা' শীর্ষক সর্গটিতে উপরোক্ত কাহিনীগুলি কবি নিপুণভাবেই বর্ণনা করেছেন। বাল্যে কৃষ্ণকমল কেমন ছিলেন সে প্রসঙ্গে কবির উক্তি—

ছেলেবেলা এই সরল সুজনে
লোকে অলৌকিক করিত জ্ঞান,
খুঁজিয়ে দেখিয়ে শিশু সাধারনে
মিলিত না এঁর কেহ সমান। (২৬)

আর এঁর অগ্রজ—

পিছনে ছিলেন জ্ঞান গরীয়ান,
দাদা মহোদয় উদার অতি,
বুদ্ধি বিভাকর পুরুষ-প্রধান
সদা কৃপাবান ভায়ের প্রতি। (৩০)

'পাঠ সমাপন হতে না হতে বিদেশ ভ্রমনে উঠিল মন' আর কৃষ্ণকমল 'পশ্চিম প্রদেশে সকের নবীন অতিথি হয়ে' চলে গেলেন এ সব কথা বলতে কবি ভোলেননি। জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকমলের পরলোক গমনের চিত্রটিও বড় করুণ।

কিন্তু আমাদের লক্ষ্য 'সুরবালা' নাম্নী বঙ্গবধূ, কবির ভাষায় 'বঙ্গসুন্দরী'। কবিতাটি বন্ধুর পারিবারিক চিত্র হয়েও বন্ধু পত্নী সুরবালা চিত্র হিসাবে অসম্পুর্ণ নয়। তবে একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে বন্ধুর বর্ণনা আর বন্ধু পত্নীর বর্ণনায় নির্দ্দিষ্ট কোন পরিকল্পনা অনুসৃত হয় নি। ভাবভোলা কবির মনে কাহিনীর যে অংশ যেভাবে এসেছে, তিনি অনুগত লিপিকারের মত তা লিপিবদ্ধ করেছেন। বলাবাহুল্য এই অসংলগ্নতা, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'গৃহিনীপনার অভাব', বিহারীলালের চরিত্রগত।

সুরবালার কুমারীজীবনের চিত্রটি অপূর্ব। তিনি সে চিত্র অঙ্কন শুরু করলেন—

একদিন দেব তরুণ তপন
হেরিলেন সুরনদীর জলে,
অপরূপ এক কুমারীরতন
খেলা করে নীল নলিনী দলে (১)

এই 'কুমারী রতন' স্বর্গের 'অপ্সরী কিন্নরী' আর দেবদেবীদের স্নেহ ভালোবাসায় লালিত পালিত আর বর্ধিত। কবি অকুণ্ঠচিত্তে ঘোষণা করলেন—

তুমিই সে নীল নলিনী সুন্দরী,
সুরবালা সুর ফুলের মালা ;
জননীর হৃদি কমল উপরি
হেসে হেসে বেশ করিতে খেলা। (৭)

অনুমানে বাধা নেই যে ইনি 'শ্যামাঙ্গী' ছিলেন। কবি এঁর বর্ণনায় বলেছেন—

সীতার মতন সরল অন্তর,
দ্রৌপদীর মত রূপসী শ্যামা,
কাল রূপে আলো করি চরাচরে
কেগো এ বিরাজে মুগধা বামা ? (১৪)

সুরবালা 'শ্যামা' হলেও অপরূপ রূপসী। তিনি 'শশাঙ্ক শ্যামিকা'। কবি যখন এই বঙ্গসুন্দরীর ধ্যানে নিমগ্ন তখন মনে প্রশ্ন উদিত হয়—

সদানন্দময়ী আনন্দরূপিণী স্বরগের জ্যোতি মুরতিমতী,
মানস-সরস-নীল-মৃণালিনী কে তুমি অন্তরে বিরাজ সতী ?

এই রূপের ধ্যান অন্তরে দেহ-ভোগ-কামনা-হীন প্রেমের উদ্বোধন ঘটায়। কবি বলেন—

জনমে না মনে ইন্দ্রিয় বিকার পরম উদার প্রেমের ভাব,
নাহি রোগ শোক জরা কদাকার, পুণ্যবান করে এ নারী লাভ।

'ভাগ্যে ভার্য্যা' এ-মত সুপ্রাচীন। এখানে তারই প্রতিধ্বনি। পুণ্যবান ছাড়া এমন সতীলক্ষ্মীকে পত্নীরূপে লাভ করা কল্পনাতীত। তবে কি ইনিই প্রেরণারূপিণী নারী? আদ্যাশক্তি? কবির মনে প্রশ্ন জাগে—

তবে যোগীজন বসি যোগাসনে নিমগ্ন ধ্যানে কারে ধেয়ায়,
আচম্বিতে আসি তাহাদের মনে কাহার মুরতি স্ফুরতি পায়। (৫৩)

এ প্রশ্নের উত্তর এসেছে কবির মিষ্টিক অনুভূতি থেকে। কিন্তু তার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে। এখনও জগৎ ও জীবনের কেন্দ্রগত মূলসত্যটি কোথায় সেই প্রশ্নে কবির সংশয় অভিব্যক্ত। এ প্রশ্নের উত্তর তীক্ষ্ণ মেধা বা তীব্র অনুভূতি-লব্ধ নয় তার জন্য প্রয়োজন বোধির। সেই বোধির আকস্মিক বিকাশের মধ্যেই মিষ্টিকচেতনা কায়া-কান্তিময় হয়ে ওঠে। আমরা পরবর্তীকালে দেখব এই মিষ্টিকচেতনা কবিকে গুহায়িত সত্যের ক্ষেত্রে প্রত্যয়ের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

তৃতীয় সর্গে প্রকৃতির চিত্র আছে, আর সেই সঙ্গে মানুষের আর প্রকৃতির সমপ্রাণতার কাহিনী। 'সঙ্গীত শতকে'এর প্রকাশ দেখেছি। এখানে এইটুকুই স্মরণীয় যে প্রকৃতি সম্পর্কে কবির এই বোধ মজ্জাগত।

চতুর্থ সর্গের নামকরণ করেছেন কবি 'চিরপরাধিনী'। এই সর্গের সম্পূর্ণ বক্তব্য কবি এই 'চিরপরাধিনী' নারীর স্বগতভাষণের আকারেই উপস্থিত করেছেন।

এই নারী স্বশিক্ষিতা তাই অর্জিত জ্ঞানের সঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞতার দুস্তর ব্যবধান তাকে অহরহ পীড়িত করে। সংসার সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা অত্যন্ত তিক্ত, কিন্তু জীবনে জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সে নিঃসন্দিগ্ধ। যেদিন এই রমণীকে তাঁর স্বামী পুস্তক উপহার দিয়ে বলেছেন—

* * এ এক আরশি
স্থির হয়ে যত চাহিয়া রবে,

ততই ইহারা ভেতরে প্রেয়সী
প্রকৃতি রূপসী উদয় হবে। (২৮)

শুধু তাই নয়। তিনি এও বলেছিলেন যে, জ্ঞানার্জনের সাহায্যে 'সুখের পথ' আবিষ্কৃত হবে, আর 'ঘুচে যাবে সব ভ্রম অন্ধকার'। এরই ফলে মানুষ সুখী হতে পারবে। আজ এই রমণী আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করেন যে 'গ্রন্থ আলোচনা করিলে যতনে, উদার জ্ঞানের উদয় হয়।' ডঃ হরেন্দ্র মোহন দাশগুপ্ত মনে করেন যে, এই উদারজ্ঞান বলতে কবি Western Knowledge কেই নির্দেশ করতে চেয়েছেন।[৬]

সমকালীন সমাজচিত্রটি কিন্তু এই সর্গে সুপরিস্ফুট। নারীকে পিঞ্জরাবদ্ধ রাখাই ছিল সে সমাজের রীতি। তাই সে নারীর সঙ্গে বহির্জগতের বিন্দুমাত্রও সম্পর্ক ছিল না। এই নারীর খেদোক্তি—

কারার বাহিরে না জানি কেমন
হাট, বাট, ঘাট কতই আছে,
সে সকল যেন মেরুর মতন
অজানা রয়েছে আমার কাছে। (২২)

শুধু কি তাই? আর একটি স্তবকও উদ্ধৃতিযোগ্য। সেখানে বর্ণনাটি সেকালের স্বামীদেবতাদেরই। তাঁরা—

বাহিরে ইঁহারা সহিয়ে সহিয়ে
ম্লেচ্ছ পদাঘাতে পিষিত হন,
রাগে ফুলে ফুলে ঘরেতে আসিয়ে
যত খুসি ঝাল ঝাড়িয়ে লন। (২৪)

এযে সত্যনিষ্ঠ চিত্রাঙ্কন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমাদের পক্ষে যতই লজ্জাজনক হোক না কেন, ক্লৈব্য, নির্বুদ্ধিতা আর নিষ্ঠুরতার এই চিত্রকে অবাস্তব বা অতিরঞ্জিত বলার উপায় নেই।

এই সর্গের মূল্যও সৌন্দর্য এবং নারীশিক্ষা সম্পর্কে কবির সুস্পষ্ট মতবাদের অভিব্যক্তিতে। অনেকগুলি স্তবককে আশ্রয় করে সেই মতবাদ প্রকাশিত হয়েছে। নারীশিক্ষা ও নারীর সামাজিক প্রতিষ্ঠার

বিষয়ে কবির বক্তব্য আমরা আগেই শুনেছি আর সংক্ষেপে আলোচনাও করেছি। এখানে শুধু একটি বিষয়ের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

প্রকৃতশিক্ষা শুধু জ্ঞানলাভের মধ্যেই সীমিত নয়। সে শিক্ষা মূল্যবোধকেও উদ্দীপ্ত করে। আর শিক্ষিত ব্যক্তিকে তার কর্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধ করে আজকের এই স্বাধিকারপ্রমত্ততার যুগে কর্তব্যপালনের প্রশ্ন অবান্তর বলেই বিবেচিত। যে নারী চিরপরাধিনী, যার সঙ্গে আপন অন্দরমহলের বহিঃস্থিত পৃথিবীর কোন সম্পর্কই নেই, সেও কিন্তু চিন্তা করেছে—

জনম অবধি খাইয়ে পরিয়ে,
ভবের ভাণ্ডার করেছি ক্ষয়,
সেই মহাক্ষতি পুরায়ে না দিয়ে
কার বল সুখে নিদ্রা হয়? (৩৯)

এই বক্তব্য প্রকাশের অন্তরালে যে উদার আর কর্তব্যপরায়ণ মানসিকতাটি সক্রিয়, তার প্রতি অন্তর স্বতঃই শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠে। এযে কবি বিহারীলালেরই স্বগতোক্তি তাতে সন্দেহ নেই। আমরা 'সঙ্গীতশতক'-এর মধ্যে কবিকে বলতে শুনেছি—

রাশি রাশি দ্রব্য কত
নাশিলাম ক্রমাগত,
কতলোক-পরিশ্রম
করিলাম ক্ষয়।
দিতে সেই ক্ষতি পূরে
চেষ্টা করা থাক দূরে
সে সকলে একেবারে
যেন দৃষ্টিহীন। (৭৭)

'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময় যে স্তবকটি পরিত্যক্ত হয় তা হল—

বেড়ি খুলে নাও প্রাণে যাই মারা
তোমাদের মন সুখেতে থাক,
আমাদের পাপে ম্লেচ্ছ দুরাত্মারা
উড়ে পুড়ে দেশে চলিয়া যাক্।

এই স্তবকটি পরিত্যাগের কারণ মনে হয় তৃতীয় ও চতুর্থ ছত্রের মধ্যেই নিহিত আছে। উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে এ ধরনের উক্তি রাজদ্রোহমূলক বলেই চিহ্নিত হত। কারও পরামর্শে কবি হয়ত দ্বিতীয় সংস্করণে সেইজন্যই এই স্তবকটি বর্জন করেছিলেন।

পঞ্চম সর্গে কবির মানসপটে চিত্রিত হয়েছে করুণার প্রতিমূর্তি নারী, আর তারই নিপুণ চিত্রণ ঘটেছে 'করুণাসুন্দরী' কবিতায়। ডাঃ উজ্জ্বল কুমার মজুমদারের মতে কবি 'করুণাসুন্দরী'র প্রেরণা পেয়েছেন বায়রনের Childe Harold থেকে।[৭] অবশ্য সর্গারম্ভেই বায়রন থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন কবি।

প্রতিবেশীর ঘরে আগুন লেগেছে, 'সুকুমারী বালা'র হৃদয় তাই দুঃখে পরিপূর্ণ অথচ যতটুকু সাহায্য এই মুহূর্তে করতে পারলে প্রতিবেশীর উপকার হয় তার তা করার শক্তি নেই। এই অসহায় অবস্থার উপমাটি লক্ষণীয়—

যেন মৃগশিশু সজল নয়নে,
দাঁড়িয়ে গিরির শিখর 'পরি,
ত্রাসে দাবানল ত্যাখে দূর বনে,
স্বজাতি জীবের বিপদ স্মরি। (১০)

করুণার জীবন্তমূর্তি এই কিশোরীকে কবি কখনো 'সুরবালা' কখনো 'দেববালা' বলে সম্বোধন করেছেন, বলেছেন—

তোমার মতন, ভুবন-ভূষণ
অমূল্যরতন নাইগো আর,
সাধনের ধন এ নব রতন
হৃদি আলো করি রহিবে কার। (১৫)

কবির আশিসও বর্ষিত হয়েছে অকৃপণভাবে এই 'করুণাসুন্দরী'র ওপর—

দেখো-বিধি এই সুকুমারী বালা
চিরদিন যেন সুখেতেঁ রয়। (১৬)

'করুণা' শব্দটি আভিধানিক অর্থে 'দয়া' বা 'অনুগ্রহ' হলেও ভারতীয় ঐতিহ্যে তার বিশিষ্টার্থক রূপটিই কবি গ্রহণ করেছেন। এ 'করুণা' আর সেই হৃদয়-ঔদার্য সমার্থক, যে ঔদার্য আত্মার গভীরতম আর উচ্চতম ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত; স্থান, কাল বা পাত্রে তাই এর প্রকাশ সীমিত নয়। উদার নীলাকাশের মত সমস্ত পৃথিবীর জড় ও চেতন বস্তুপুঞ্জকে আপনার স্নেহপূর্ণ অন্তরের মধ্যে আবৃত করে রাখার বাসনাই প্রকৃতপক্ষে করুণা। বৌদ্ধরা একেই বলেছেন 'ব্রহ্মবিহার'! বিহারীলাল, Childe Harold থেকে প্রেরণা সংগ্রহ করে থাকলেও 'করুণা' অভিধাটি প্রয়োগের পেছনে এই সুপ্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যানুসরণটি স্পষ্ট।

পঞ্চম সর্গে চতুর্থ যে নারীমূর্তি কবি কল্পনা করেছেন, সে নারী পতিপ্রেম-বঞ্চিতা, তাই সে 'বিষাদিনী'। সে রমণী রূপসী। কবির বর্ণনাটি এক্ষেত্রে অপূর্ব—

সুঠাম শরীর পেলব লতিকা,
আনত সুষমা কুসুম ভরে,
চাঁচর চিকুর নীরদ মালিকা
লুটায়ে পড়েছে ধরণী' পরে। (৩)

*　*　*　*

আধ ঢুলু ঢুলু লাজুক নয়ন
আধই অধরে মধুর হাসি,
আধ ফোটো ফোটো হয়েছে কেমন,
কপোল-গোলাপ-মুকুলরাশি। (৯)

উদ্ধৃত তৃতীয় স্তবকের মধ্যে 'কুমার সম্ভবে'র পার্বতী-বর্ণনার ছায়া দেখা যায়। সেখানে কালিদাস বলেছেন—

আবর্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং বাসোবসানা তরুণার্করাগম্।
পর্যাপ্ত পুষ্পস্তবকাবনম্রা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব। (৫৪)

এই রূপলাবণ্যবতীর সঙ্গে প্রকৃতির অভিন্নাত্ম রূপটিও দর্শনীয়। রূপবিহ্বলতা প্রকৃতির মধ্যেও পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে—

আননের পানে সরমবতীর
স্থির হয়ে চাঁদ চাহিয়ে আছে,
আসি ধীরে ধীরে শীতল সমীর,
ব্যজন করিয়ে ফিরিছে কাছে। (১০)

এই বালিকার সঙ্গে পিতামাতা বিবাহ দিলেন এক বর্ষীয়ান্ চরিত্রহীন পুরুষের, কবির ভাষায় এক 'ধাঙড়া ভাঙড়া বেদড়া বরের'। বালিকার দুঃখে কবি বহু দীর্ঘশ্বাস মোচন করেছেন, আর শেষে প্রার্থনা জানিয়েছেন—

কোথা ওগো কুলদেবতা সকল,
অনুকূল হও ইহার প্রতি,
বরষিয়ে শিরে সুধা শান্তিজল
ফিরাও সতীর পতির মতি। (২৫)

বঙ্গললনার তদানীন্তন দুঃখ-দুর্দশার আর এক বাস্তব চিত্র কবি এঁকেছেন এই সর্গে। সমকালীন সমাজে বহুবিবাহ আর বাল্যবিবাহ প্রথা কীভাবে বালিকাদের সর্বনাশ ঘটাত, কবিতাটিতে তারই ইঙ্গিত আছে। এই মনোভঙ্গীকেই আমরা কবির সমাজসচেতনতা ও নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বলে চিহ্নিত করেছি।

পঞ্চম কল্পিত নারীমূর্তি 'প্রিয় সখী'র বর্ণনা সপ্তমসর্গে। এ নারী অসহায়ের আশ্রয়, শোকগ্রস্তের সান্ত্বনা, দুঃখময় পৃথিবীতে আনন্দের আলোকবর্তিকা। প্রকৃতির সঙ্গে এ নারীর সমপ্রাণতা লক্ষণীয়। কবি প্রিয়সখীর বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলেছেন—

প্রকৃতির চারুশোভা দরশনে,
ক্রমে হয়ে যাও বিহ্বল হেন,

দাঁড়াইয়ে থাক মগন নয়নে,

হীরক প্রতিমা দাঁড়ায়ে যেন। (১১)

'হীরক প্রতিমা' অভিধাটি সযত্নে চিন্তার যোগ্য। চিরাচরিত 'সুবর্ণ প্রতিমা' উপমানটি বর্জন করে, 'হীরক প্রতিমা' ব্যবহার করে কবি নারীর গৌরকান্তি, দুর্লভ গুণের সমাবেশ প্রভৃতির দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাছাড়া ঐ শব্দের ব্যবহার নারীর প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধাবোধকেও সযত্নে প্রকাশ করেছে।

যে পৃথিবীতে সব কিছুই ক্ষণস্থায়ী, সেখানে 'প্রিয় সখী' যেন অমৃতত্বলাভ করে—কবি-কামনার এই আন্তরিক দিকটিও অকৃত্রিম ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। প্রিয়সখীর প্রতি কবির আকর্ষণ পরম ভক্তের 'সাধন ধনের' প্রতি আকর্ষণের মতই। 'কাননে কুসুম হেরিলে যেমন, ভালবাসে মন আপনি তারে' অথবা 'যেমন সুধাকর শোভে আকাশ উপরে, পরাণ জুড়ায় হেরিলে তায়'—এ ক্ষেত্রে কবি-মনে 'প্রিয়সখীর' দর্শনও সমপর্যায়ের আনন্দবিধান করে। ভবভূতি থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, 'আতপ্ত জীবিতমনঃ পরিতর্পণোমে।' জীবিতাবস্থায় বেদনাক্লিষ্ট মনের তৃপ্তিবিধায়িনী এই প্রিয়সখী। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন আদর্শরূপিণী এই নারীমূর্তিকে অন্তরে স্থাপন করে শ্রদ্ধানম্রচিত্তে ধ্যান করা। কবির ভাষায়—

যেমন পরম ভকত সকলে

আরাধনা করে সাধন ধনে,

তেমনি তোমায় হৃদয় কমলে

ভাবি আমি বসে মগন মনে। (৩০)

ষষ্ঠ-সর্গে 'বিরহিণী' নারীর কল্পনাটিও বাস্তবতামণ্ডিত। স্বামীর প্রেমময় আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করে সীমাহীন দুঃখে কালযাপন করছে এই রমণী। স্বামী-বিচ্ছেদ-কাতর অনুতপ্তা এই 'বিরহিণী' বহিঃপ্রকৃতির রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ আর স্পর্শের মধ্যে স্বামীসান্নিধ্য অনুভব করছে। স্বামী সম্পর্কে তরুলতা, গগন পবন গিরিনদী

সকলের কাছে তার কাতর জিজ্ঞাসা, 'তোমরা না জানো এমন নয়' বল তোমরা—'কোথা গেলে আমি পাইব তাঁরে।'

অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই রামায়ণের মধ্যে সমপর্যায়ের একটি বর্ণনা মনে পড়ে। মারীচকে হত্যা করে রাম-লক্ষ্মণ তাঁদের পর্ণাশ্রমে প্রত্যাবর্তন করেছেন, কিন্তু সেখানে পদার্পণ করা মাত্রই যেন বিশ্ব-প্রকৃতির হাহাকারধ্বনি শ্রুত হল। আরণ্য প্রকৃতির সে রোদন-ধ্বনির সঙ্গে রামচন্দ্রের বিলাপ মিশ্রিত হয়ে 'স্নিগ্ধপল্লব সংকাশা' 'পীতকৌষেয় বাসিনী' সীতার জন্য ত্রিভুবন অশ্রু বিসর্জন করেছে। কুরুবক, বকুল, অশোক কর্ণিকার প্রত্যেকের কাছে অশ্রুকাতর প্রশ্ন—করুণা করে বল আমার সীতা কোথায়? 'প্রিয়াং যদি বিজানাসি নিঃশংকং কথয়স্বমে।' বাল্মীকি প্রশ্নের ক্ষেত্রটিকে প্রসারিত করে দিয়েছেন, বৃক্ষতরুলতা, পশুপক্ষীর গণ্ডী ছাড়িয়ে। সীতার জন্য রামচন্দ্রের উদ্বেগাকুল প্রশ্ন সূর্য ও বাতাসের উদ্দেশ্যেও উচ্চারিত হয়েছে।

বিহারীলালের 'বিরহিণী' স্বামীর জন্যও বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে বৃক্ষলতা, গগন-পবন, গিরিনদীর কাছে প্রশ্ন করেছে 'বল কোথা মোর পতিপ্রাণধন', তাঁর বিরহে সতীনারীর যে প্রাণধারণ সম্ভব নয়। হতাশায় যখন মন ভেঙ্গে পড়েছে তখন এ বিরহিণী প্রাণত্যাগ করতে চেয়েছে। বিলীন হয়ে যেতে চেয়েছে ধরণীর স্নেহময় কোলের মধ্যে।

'বিরহিণী' সর্গের আদি আর অন্তে যথাক্রমে তিনটি আর দু'টি সংগীত যুক্ত। তার প্রথম তিনটির সুর বিষাদাত্মক, কিন্তু অন্তের সংগীত দুটিতে স্বামীর সঙ্গে মিলনের ফলে আনন্দময়তা প্রকাশিত।

সপ্তম মূর্তিকল্পনা 'প্রিয়তমা' নারীর। লক্ষণীয়, এক্ষেত্রে কবি-পত্নীই কবির বর্ণনীয় প্রিয়তমা নারী। পুত্র অবিনাশকে উপলক্ষ্য করে কবি বাৎসল্যস্নেহ সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রিয়তমা পত্নীর উল্লেখ করেছেন। কিন্তু জীবনের 'প্রথম প্রণয়' বা ভালোবাসা যে পিতা-মাতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল, সেকথা বিস্মৃত হননি কবি। সে

যেন জীবনে প্রেমের বা ভালোবাসার ঊষালগ্ন। এরপর নবাগতা পত্নীর দাম্পত্যপ্রেম গড়ে ওঠে। এর আস্বাদ ভিন্ন, কিন্তু এর পূর্ণতা সন্তান জন্মের পর। স্বয়ং কবি পিতার প্রতি কেন গভীর ভাবে আকর্ষণ বোধ করেন তারই মূল্যায়ন করতে পেরেছেন আপন পুত্রের কথা ভেবে। 'সেই সুখ' অর্থাৎ পিতামাতার প্রতি আকর্ষণজনিত সুখ এবং বাৎসল্য স্নেহজাত 'এই সুখ' কবির কাছে এখন সমার্থক হয়ে গিয়েছে।

কবিপত্নী যখন জননী হর্নান তখনও তিনি কবির জীবন আনন্দময় করে রেখেছিলেন, কিন্তু জননী হয়ে যেন তাঁর গৌরব অনেকখানি বর্ধিত হয়েছে। আজ মাতৃত্বের স্পর্শে তাঁর সৌন্দর্যের মধ্যে স্বর্গীয় সুষমার আভাস পরিব্যাপ্ত। এই মাতৃমূর্তির সামনে কবির ভক্ত-জনোচিত শ্রদ্ধানিবেদন নারীজাতি সম্পর্কে কবির দৃষ্টিভঙ্গীটিকে সম্পূর্ণভাবেই উন্মোচিত করেছে। সন্তান কোলে করে কবিপত্নী যখন আসেন, কবির মনে হয়—

যেন ঊষাদেবী আসে আলো করি
তরুণ অরুণ কোলেতে দোলে (১৩)

প্রিয়তমা পত্নীলাভ 'যুগযুগান্তের তপের ফল'। ইনি শুধু নর্ম সহচরী নন, ইনি গৃহিণী, সচিব, ললিত-কলাবিধির সহসাধিকা। কবির কথায়—

বিপদে বান্ধব পরম সহায়,
সখী আমোদিনী আমোদসেবী,
শান্ত অন্তেবাসী ললিতকলায়
সমাধি সাধনে সদয়া দেবী। (৩৩)

এই পংক্তি চতুষ্টয়ে কালিদাসের যে শ্লোকাংশের ছায়া দেখা যায় সেটির সম্পূর্ণ উদ্ধৃত আছে, 'বন্ধু বিয়োগ' কাব্যের 'সরলা' নামক তৃতীয় সর্গের শিরোদেশে। সে শ্লোকটি হোল—

গৃহিণী সচিবঃ সখীমিথঃ
প্রিয়শিষ্যা ললিত কলাবিধৌ।

করুণাবিমুখেন মৃত্যুনা
হরতা ত্বাং বদ কিংন মে হৃতম্ ॥

এটি 'রঘু বংশে'র অন্তর্গত ইন্দুমতীর তিরোধানে রাজা অজের বিলাপ-মূলক অংশ। ইনি মাতৃরূপিণী সেবায়, মর্মসঙ্গিণী হাস্যোল্লাসে। কবির ভাষায় এঁর পরিপূর্ণ চিত্রখানি—

সদানন্দময়ী আনন্দরূপিণী
স্বরগের জ্যোতি মূরতিমতী,
মানস-সরস-বিকচ নলিনী,
আলয়-কমলা করুণাবতী। (২০)

ইনি শুধু স্বর্গীয় আনন্দের মর্ত্যপ্রতিমাই নন, ইনি একাধারে গৃহলক্ষ্মী এবং সারস্বত সাধনার প্রেরণাদাত্রীও বটে। 'বঙ্গসুন্দরী' শুধু 'অঙ্গনা' কাব্য ধারায় অন্যতম সংযোজন মাত্র নয়, বাঙালী বধূ সম্পর্কে মিস্টিক চেতনার এই অপূর্ব প্রকাশ তাকে এক মহৎ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। যে প্রেমচেতনাকে আশ্রয় করে কবি মিস্টিক চেতনায় উত্তীর্ণ হয়েছেন সে প্রেমচেতনা প্লেটোনিক নয়। প্রিয়তমা পত্নীর আধারেই সে চেতনার প্রকাশ, বিকাশ ও পরিণতি। কাব্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে কবির প্রেরণাদাত্রী কবিপত্নী। কবি বলেছেন—

নিস্তব্ধ নিশায় লেখনীর মুখে
গাঁথিতে বসিলে বচনাহার,
তুমি সরস্বতী দাঁড়াও সমুখে,
খুলে দাও চোখে ত্রিদিবদ্বার। (৩৬)

কবির একটি বিশেষ মানসিকতা যত্নের সঙ্গে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। কবি-পত্নীর প্রতি কবির আকর্ষণ অত্যন্ত তীব্র। অবশ্য রূপ ও গুণের অপূর্ব সমন্বয়ে যে নারীর চিত্র লেখনী আশ্রয় করে পরিস্ফুট, সেই চিত্র যাঁর, তাঁর প্রতি তীব্র আকর্ষণ থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই আকর্ষণ মোহ নয়, মুক্তি। এই আকর্ষণ ভোগে অসম্পূর্ণ, ত্যাগেই তার পূর্ণতা। পত্নীপ্রেম পৃথিবীকে নতুন ভাবে অর্থান্বিত করে তুলেছে। কবি বলেছেন—

বিষণ্ণ জগৎ তোমার কিরণে
বিরাজে বিনোদ মূর্রতি ধরি,
কে যেন সন্তোষে ডেকে আনে মনে,
যেন সুধারসে হৃদয় ভরি। (২৬)

সীমা থেকে কিভাবে অসীমানুভূতিতে উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করেছে এই প্রেম, সেটিও লক্ষ্য করার মত—

চরাচর যেন সকলি আমার
নারী নরগণ ভগিনী ভাই;
আননে আনন্দ উথলে সবার
গ'লে যায় প্রাণ যেদিকে চাই। (২৭)

এ স্তবকগুলির ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। শুধু স্মরণ রাখা দরকার যে এই প্রেমময়তার দৃষ্টিতেই প্রকৃতিপ্রীতি সৃষ্ট। এই স্বীকৃতি আমরা 'সঙ্গীত শতকে'র মধ্যেই পেয়েছি। এখন এইখানে রইল প্রায় এক-দশক পরের রচনা 'সারদামঙ্গল'-এর ভাষ্য। 'মৈত্রী' আর 'প্রীতি' কবি-ব্যবহৃত এই দুটি শব্দকে আমরা এখন থেকেই মানব প্রেম ও প্রকৃতি প্রীতি রূপে গ্রহণ করছি। আমরা যতই অগ্রসর হতে থাকব ততই এ ধারণা পরিপুষ্টি লাভ করবে।

দশম-সর্গে অষ্টম নারীমূর্তি 'অভাগিনী'র চিত্র অঙ্কিত। বোধহয় কবির এ ধারণা ছিল যে একাধিক কারণেই নারীকে অভাগিনী আখ্যা দেওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে আমাদের পূর্ব পরিচিতা 'চিরপরাধিনী', 'বিষাদিনী' আর 'বিরহিণী'রাও নিঃসন্দেহে 'অভাগিনী'। নারীর দুর্ভাগ্যকল্পনা করতে গিয়ে কবি সাংসারিক ও সামাজিক হৃদয়-হীনতার বিভিন্ন দিক ভেবেছেন। এই 'অভাগিনী' সম্পর্কে কবির ইঙ্গিত, 'পত্রিপত্রহস্তা গর্ভবতী নারী'।

প্রবাসী স্বামীর কাছ থেকে প্রণয়লিপি এসেছে এ ধারণায় গভীর আগ্রহে পত্রটি পাঠ করার পর পত্নী জেনেছেন তাঁর স্বামী দ্বিতীয়বার বিবাহে বদ্ধপরিকর। অবশ্য 'উদার' স্বামী লিখে পাঠিয়েছেন যে

'লাগিবে যে ধন ভরণপোষণে দিবে তা সকলি'। শুধু উভয়ের সাক্ষাৎ আর হবে না। কিন্তু একথাও তিনি জানিয়েছেন যে নবনির্বাচিত পত্নীকে না পেলে তাঁর পক্ষে জীবনধারণ সম্ভব নয়।

কাহিনীর সূত্রপাত করতে গিয়ে কবি বড় নিপুণভাবে রামায়ণের সুপরিচিত করুণ কাহিনীটির ইঙ্গিত দিয়েছেন। দীর্ঘকাল অবর্ননীয় দুঃখ যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট সীতা অযোধ্যায় ফিরে এসেছেন। একটি বিশেষ মুহূর্তে যখন তিনি রামচন্দ্রের সপ্রেম আহ্বানের প্রতীক্ষায়, তখনই এলো বনবাসে যাবার নির্মম আদেশ। এই অভাগিনী তবুও সীতাকে ভাগ্যবতী মনে করেন কারণ—

নিরমি তোমার সোনার মূরতি
বসালেন পতি আপন বামে। (৪)

আর এই অভাগিনীর স্বামীর বামে বসবে তার নবাগতা সপত্নী। 'অভাগিনী' পুরাকালের অভাগিনী সীতাকে স্মরণ করেছে তার করুণতম মুহূর্তে।

বহুবিবাহপ্রথা যে সমাজে প্রচলিত ছিল সে সমাজে 'বসিবে সতিনী, হাসি হাসি আসি পতির পাশে'—এমন কিছু নতুন বা আশ্চর্যজনক ঘটনা নয়। দ্বিতীয়বার বিবাহ করার জন্য স্বামী প্রস্তুত এই সংবাদ জেনে আমাদের 'অভাগিনী' তাই শুধু বলেছে—

কারো দোষ নাই, কপালেতে করে,
নহিলে তেমন, এমন হয়।
নিমগন হয়ে সুধার সাগরে
হলাহলে কার পরান দয়? (১০)

এই হতভাগিনী রমণীর মাতার মৃত্যুর পর তার পিতাও দ্বিতীয়-বার দারপরিগ্রহ করেছিলেন, কবিতায় তার উল্লেখ আছে।

দশ-সর্গে বিভক্ত 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যকে 'প্রেমমূলক' বা 'প্রকৃতি প্রেমমূলক' বলে চিহ্নিত না করে নারীবর্ণনামূলক কাব্য হিসাবে গ্রহণ

করাই সঙ্গত। শোভন ও সঙ্গত হয় শুধু 'অঙ্গনা কাব্য' বলা, অবশ্য একটু পরিবর্তিত ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে।

মহাকবি মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা' আর 'বীরাঙ্গনা' কাব্য প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৮৬১ ও ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে। এই দু'টি কাব্য সম্পর্কে আচার্য সুকুমার সেনের সংক্ষিপ্ত মন্তব্যটি স্মরণ করাই যথেষ্ট। তিনি বলেছেন, "ব্রজাঙ্গনা'য় বাঙ্গালা সাহিত্যের চিরকাল-এর একমাত্র বিরহিণীর একতান, বীরাঙ্গনায় সংস্কৃত সাহিত্যের দূরকালের বিদেশিনীর ছায়াসহ মনস্বিনীদের নানা অনুরাগ।"[৮] আর আমাদের আলোচ্য 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যে সমকালীন বঙ্গললনাদের বিরহমথিত দীর্ঘশ্বাসের করুণ ধ্বনি 'অঙ্গনা' কাব্যধারায় নবতর সংযোজন।

'বঙ্গসুন্দরী' কাব্য যখন প্রথম প্রকাশিত হয় (১৮৬৭-৬৯) তখন তাতে মোট ন'টি সর্গ ছিল। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে যখন দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তখন কবি লিখলেন 'সুরবালা' নামে একটি সর্গ। নতুন সন্নিবেশ 'পরাধিনী' নামক সর্গের একটি কবিতা ত্যাগ এবং অন্যান্য সর্গের কোন কোন কবিতায় কোন কোন পদ পরিবর্তন করা হইল।' যাই হোক 'অঙ্গনা' কাব্য ধারায় 'বঙ্গসুন্দরী' যে একটি মূল্যবান সংযোজন তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। ভাবের গভীরতায় ভাষার 'সারল্যে, ছন্দের রমণীয়তায় এবং গীতিধর্মিতার সাবলীল প্রকাশে 'বঙ্গসুন্দরী' অনবদ্য। 'সুরবালা' পরবর্তীকালে রচিত ও সংযোজিত; তাই তার রচনায় ভাব ও ভাষায় পরিণতি বা পরিপক্কতা অনেক বেশী। 'চিরপরাধিনী', 'বিরহিণী' এবং 'অভাগিনী' dramatic monologue বা নাটকীয় মনোকথন শ্রেণীর কাব্য। আচার্য সুকুমার সেন একে 'ভনিকা কাব্য' বলেছেন। এগুলির নাটকীয়তা কাহিনীর আকস্মিক সূত্রপাত আর সমাপ্তিতেই শুধু নয়, তাদের আবেগ প্রাবল্যের মধ্যেও নিহিত।

অঙ্গনাকাব্যধারার উত্তরসূরী সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার। অঙ্গনা কাব্যের ধারায় মধুসূদন, বিহারীলাল ও সুরেন্দ্রনাথ এই কবিত্রয়ী

স্মরণীয়। মধুসূদন গ্রহণ করলেন রাধা, শকুন্তলা, তারা, রুক্মিণী, দ্রৌপদী, ভানুমতীদের, কিন্তু বিহারীলালের দৃষ্টি নিবদ্ধ বঙ্গসীমন্তিনী-দের ওপর। সুরেন্দ্রনাথও চেয়েছিলেন মাতা, জায়া, ভগ্নী আর নন্দিনীর চিত্রাঙ্কন করতে। মধুসূদনের চিন্তা একদিকে চিরন্তন রাধা-কৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গে, অন্যদিকে পাশ্চাত্য heroic epistles গুলিকে আশ্রয় করে কাব্যমূর্তিতে প্রকাশিত। বিহারীলাল কিন্তু একান্তই আত্মনিমগ্ন। কোন প্রথানুবর্তন নেই, তর্কাপেক্ষ আখ্যানের অবতারণাও নেই। পারিবারিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত নারীরূপিণী যে ভাবসঙ্গ তারই বিচিত্র চরিত্রায়ন 'বঙ্গসুন্দরী কাব্যে'। কেউ আনন্দময়ী, কেউ বা বিষাদিনী, কারও জীবন পতিপ্রেমে পরিপূর্ণ, কেউ প্রেমবিরহিণী। কিন্তু প্রত্যেকটি চরিত্র বাস্তবানুগ।

উনিশ শতকের নবজাগরণে নারীর সামাজিক মূল্যবোধেও উজ্জ্বল। নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও তার আপন ভাগ্য জয় করবার স্বাধীনতা স্বীকৃত হয় এই শতক থেকেই। বিহারীলালের চিন্তাবৃত্তে নবজাগরণের যাবতীয় লক্ষণ সুস্পষ্ট। যে আধুনিকতা কাললক্ষণাতীত মনোভঙ্গী, শিল্পে-সাহিত্যে যার প্রকাশ চিরসম্বর্ধিত, তারই অন্যতম পথিকৃৎ বিহারীলাল,—রবীন্দ্রনাথের 'ভোরের পাখী'। তাছাড়া বিহারীলালের কাব্যের কাঠামো দেশী এবং বিষয়বস্তু ও চরিত্রগুলিও দেশী। বাঙালী পরিবারের বর্ণাঢ্যতাও তাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সুপ্রচুর। এই বিচারে বিহারীলাল ঐতিহ্যাশ্রয়ী হয়েও আধুনিক এবং এইখানেই অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে তাঁর প্রতিষ্ঠা।

বাংলা কাব্যজগতে নারীকে আপন বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াসে বিহারীলালের অবদান ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে। নারী সম্পর্কে এই মূল্যবোধ যে রামমোহন প্রমুখ মনীষীদের সমাজসংস্কার-মূলক আন্দোলনের সাহায্যে পুষ্টিলাভ করেছিল তারও উল্লেখ করা হয়েছে।

কাব্যে বাঙালী পুরনারীদের প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব সম্পূর্ণরূপেই

বিহারীলালের। কবিকল্পনার কেন্দ্রে কবি প্রেয়সীকে গ্রহণ সেই ঊনবিংশ-শতাব্দীর পটভূমিতে রীতিমত দুঃসাহসিকতার কাজ ছিল। বিহারীলাল আত্মবিশ্বাসের বলিষ্ঠতায় সেই অকল্পনীয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। এর ফলে নারীকেন্দ্রিক যে কাব্যধারা গড়ে উঠল তাতে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, গোবিন্দ চন্দ্র দাস, দেবেন্দ্র নাথ সেন, অক্ষয় কুমার বড়াল প্রভৃতি আপন আপন সুর সংযোজন করে একে পরিপুষ্ট একটি পৃথক ধারায় পরিণত করেছেন। এই কাব্যধারায় পরবর্তী-কালে রবীন্দ্রপ্রতিভার সংযোগ ঘটেছে। এ বিচারে 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্য নিঃসন্দেহে মূল্যবান।

বিহারীলালের কাব্যে সরস্বতী অনেকখানি স্থান অধিকার করে রয়েছেন। 'সঙ্গীত শতক' থেকেই তাঁর দর্শন মেলে, কিন্তু তা অতিপরিচিত মূর্তিতে—কমলাসীনা বীণাবাদিনী সরস্বতী। 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যের প্রথম সর্গে তারই পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করি, কবি বলেন—

আমি ভ্রমি কমল কাননে,
যথা বসি কমল আসনে,
সরস্বতী বীণা করে
স্বর্গীয় অমিয় স্বরে,
গান আন সহাস আননে। (৪০)

'বঙ্গসুন্দরী'র নবমসর্গে এসে কবির ভাব পরিবর্তন নতুন-দিগন্তের আভাস দেয়। 'সারদামঙ্গল' কাব্যের পটভূমি যে রচিত হতে শুরু করেছে সে সত্যটি এখান থেকেই প্রত্যক্ষ করা যায়। এই সর্গের শীর্ষক 'প্রিয়তমা'। কবি-প্রেয়সীর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হল—

সদানন্দময়ী আনন্দরূপিণী,
স্বরগের জ্যোতি মূরতিমতী,
মানস-সরস-বিকচ-নলিনী,
আলয়-কমলা করুণাবতী। (২০)

আবার 'মর্ত্য ভুবন কমল কাননে নারী সরস্বতী বিরাজ করে' বলার পরই বলা হোল—

এস উষারাণী এস সরস্বতী
এস লহ লক্ষ্মী এস জগত ছটা।...

'সঙ্গীতশতক'-এর বীনাপাণি সরস্বতী 'বঙ্গসুন্দরীর' যুগে ভিন্ন রূপে আবির্ভূতা হয়েছেন। এই চেতনা 'সারদামঙ্গলে' গিয়ে সম্পূর্ণ মৌলিক মূর্তি রচনা করেছে। আবার 'সাধের আসনে'র পরিসমাপ্তিতে লক্ষ্মী সরস্বতী এক হয়ে দেখা দিয়েছেন মর্ত্য প্রেয়সীর জীবন্ত প্রতিমূর্তিতে।

শব্দচয়ন আর গ্রন্থনৈপুণ্য 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যের একটি বিশিষ্ট দিক। বিস্মিত হই এই কথা ভেবে যে, কাব্য রচনার প্রায় চার দশকাশ্রিত কালের প্রথমদশকের মধ্যেই রচিত এ কাব্য। 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্য প্রকাশিত হবার পর তদানীন্তন পাঠকসমাজ যে এর প্রতি আকৃষ্ট হন, তা অকারণে নয়।

বিহারীলালকে রোম্যান্টিক কবিরূপে চিহ্নিত করলেও কাব্যপ্রযুক্তির বিচারে তাঁর বিশিষ্টতাই পৃথকভাবে লক্ষণীয়। সাধারণভাবে রোম্যান্টিক কবিতার আবেদন শ্রুতির কাছে। কিন্তু বিহারীলালের আবেদন শ্রুতিতে সমাপ্ত হয় না। দৃষ্টি আর চিন্তাকেও উদ্দীপ্ত করে। যেখানেই বাক্‌প্রতিমা নির্মিত হয়েছে সেখানেই এই তিনটি গুণের মধ্যে প্রথমটির প্রতি কিয়ৎপরিমাণে ঔদাসীন্যই পরিলক্ষিত হয়। এটি অভিযোগের আকারে সমালোচকেরা বিহারীলালের বিরুদ্ধে সাধারণ ভাবেই উল্লেখ করেন। আমরা কিন্তু বিশ্বাস করি যে, কাব্যে ব্যবহৃত শব্দ যদি শ্রুতিসুখকর না হয়েও অর্থদ্যোতক হয়ে ওঠে, তা অবশ্যই কবির নৈপুণ্য প্রমাণিত করে। আর 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যটি সতর্কতার সঙ্গে পাঠ করলে একথা মনে হয় না যে, কবি শ্রুতিসুভগতাকে অস্বীকার করেছেন। বরং ব্যবহৃত বাক্‌প্রতিমাগুলি কবির অন্তরতম বক্তব্যকে সার্থকভাবেই মুকুরিত করেছে, এইটিই স্বীকার করতে হবে।

কবি নারীর রূপগুণ বর্ণনায় যে সব উপমান গ্রহণ করেছেন বহু ক্ষেত্রে ভাষাগত আয়তনে তা ক্ষুদ্র কিন্তু ভাবগভীরতায় বৃহৎ। 'স্নেহের সাগর' 'দয়ার নদী' 'করুণা নির্ঝর' প্রভৃতি উক্তিগুলি তার উদাহরণ। নারী হৃদয়কে সুবাসিত 'কুসুমকানন' বলার মুহূর্তেই আমাদের একাধিক ইন্দ্রিয় উন্মুখ হয়ে ওঠে। নারী-শিক্ষাপ্রসঙ্গে কবি যখন বলেন 'প্রাচীতে তরুণ অরুণ উদয়' তখন দৃষ্টির সঙ্গে ইতিহাসচেতনাও জাগ্রত হয়। বস্তুত বিহারীলের বাক্‌প্রতিমাগুলি তাঁর চিন্তা অভিজ্ঞতা আর অনুভূতির সার্থক সমন্বয়ে গঠিত আর এই শ্রেণীর বাক্‌প্রতিমার ব্যবহার তাঁর প্রতিভারই পরিচায়ক।

তিনমাত্রার ছন্দে বিহারীলালের কৃতিত্ব সর্বস্বীকৃত। এই ছন্দের মধ্যে যেটুকু শোষণশক্তি নিহিত তার সুযোগ গ্রহণ করে অনেকেই পরবর্তীকালে এর মধ্যে ধ্বনিবহুল যুক্তব্যঞ্জনবর্ণের অবাধ ব্যবহার করেছেন। মনে হয় তাতে কোন কোন ক্ষেত্রে কবিতার গীতিধর্মিতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। বিহারীলাল তাঁর রচনার গীতলতা অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যেই সম্ভবত যুক্তব্যঞ্জনবর্ণের ব্যবহারে বাহুল্য ঘটাননি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—

নাহিক তেমন বসন ভূষণ,
বাকল বসনা দুখিনীবালা,
করে দুইগাছি ফুলের কাঁকন
গলে একগাছি ফুলের মালা।
(নারী বন্দনা, স্তবক ৩)

অথবা

বিকসিত নীল কমল আনন,
বিলোচন নীল কমল হাসে,
আলো করে নীল কমল বরণ,
পুরেছে ভুবন কমলাবাসে। (সুরবালা, স্তবক-২)

এই ভাবে বিহারীলাল রচিত বহু কবিতার স্তবক উদ্ধৃত করে দেখানো যায় যে তাঁর কবিতার সঙ্গীতধর্মিতা, পেলবশব্দচয়নেও এই

তিনমাত্রায় ছন্দের মধ্যে তাদের গ্রন্থনেই পূর্ণতা পেয়েছে। এই ছন্দই এককালে 'বিহারীলালের ছন্দ' নামে পরিচিত ছিল। কবি পরবর্তী-কালে কিন্তু এই ছন্দের অনুবর্তন আর করেননি।

সুনির্বাচিত শব্দ কবিতাকে সঙ্গীতধর্মী করে। কিন্তু আমাদের বক্তব্য এ নয় যে সুনির্বাচিত শব্দ চয়ন ও গ্রন্থনের সাহায্যে কবিতাকে সুললিত সঙ্গীতে পরিণত করাই সার্থক কবিতার লক্ষণ। আমরা চাই কবিতার ধ্বনিমাধুর্য আকর্ষণীয় হবে এবং ধ্বনিকে আশ্রয় করে সহৃদয় পাঠক অর্থপ্রতীতিতে উত্তীর্ণ হবেন।

শব্দচয়ন সম্পর্কে বিহারীলালের বিরুদ্ধে অভিযোগটি এই প্রসঙ্গে ওঠায়। 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যের মধ্যেও বিহারীলাল এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করেছেন যেগুলি তদানীন্তন কলকাতার কথ্য ভাষার মধ্যেই ব্যবহৃত হ'ত। 'সঙ্গীতশতক' কাব্যগ্রন্থের দু'একটি সঙ্গীতের মধ্যে ধ্বন্যাত্মক এ ধরণের কিছু শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যগ্রন্থে উপভাষান্তর্গত বহু কথ্য শব্দ চোখে পড়ে। এতে স্থানবর্ণিমা বা Local colour স্পষ্টতম হয়েছে বলা গেলেও কোন কোন ক্ষেত্রে তা যে কাব্যের মাধুর্য-হানিকর হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। 'ধূঁয়ায় ধোঁয়ায় ভরিল সকল' (করুণা সুন্দরী, স্তবক ২), 'আয়রে পবন গোয়াল ছাওয়াল' (বিরহিণী, স্তবক ৪৫), 'মরম বেদনে গোঙরায় মন' (প্রিয়সখী, ১৯), 'হ্যাকারেতে হাসায় দোধার' (উপহার ৪৪) প্রভৃতি ছত্র বা ছত্রাংশ লক্ষণীয়। এর সঙ্গে কবি-বর্ণিত শব্দ যেমন 'আক্রমিছে', 'ভূষিবেন', 'আদরিয়ে' ব্যবহৃত হয়েছে। যৌগিক ক্রিয়াপদ বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য। কবি যৌগিকক্রিয়াকে একপদে পরিণত করে বক্তব্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন।

আমরা আগেই বলেছি যে, এ ধরনের শব্দ কিছু কিছু ক্ষেত্রে কবিতার মাধুর্য নষ্ট করেছে। কিন্তু একথাও আমাদের মনে রাখা উচিত যে, কবিতার ভাষা আর লৌকিকভাষা বা কথ্যভাষার মধ্যে কোন তারতম্য থাকাই সাম্প্রতিক কালে নিন্দিত। স্তেফান ম্যালার্মের

বা ইয়েট্সের কবিতায় এমন বহু ফরাসী ও আইরিস শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা যথেষ্ট সুপরিচিত নয়। কিন্তু বিদগ্ধ সমাজের মতে সেগুলিই হোল তাঁহাদের কবিতার সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য। এ প্রসঙ্গে কবি সমালোচক টি. এস. এলিয়েটের একটি উক্তি প্রণিধান যোগ্য। THE MUSIC OF POETRY প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, 'Some poetry is meant to be sung; most poetry, in modern times, is meant to be spoken—and there are many other things to be spoken of besides the murmur of innumerable bees or the moan of the doves in immemorial elms. Dissonance, even Colophony, has its place just as in a poem of any length, there must be transition between the passages of greater or less intensity to give a rhythm of fluctuating emotion essential to the musical structure of the whole; and the passages of less intensity will be in relation to the level on which the total poem operates; prosaic—so that, in the sense implied by that context, it may be said that no poet can write a poem of amplitude unless he is a master of the prosaic' [১]

এলিয়টের উপরোক্ত দীর্ঘবাক্যের প্রতিপাদ্য বিষয় হোল, কবিতা কেবলমাত্র গীত হবার উদ্দেশ্যেই রচিত হয় না, সাধারণ বক্তব্য প্রকাশও তার অন্যতম দায়িত্ব। অতএব শ্রুতিকটু বা গদ্যধর্মী শব্দেরও ব্যবহার তার পক্ষে প্রয়োজন হতে পারে। ক্ষেত্রবিশেষে আবেগ প্রাবল্যকে অনুভূতিগ্রাহ্য করে তোলার জন্যই কবিতাকে যেমনি সুললিত হয়ে উঠতে হবে, তেমনি সাধারণ বক্তব্য প্রকাশের ক্ষেত্রে তার পক্ষে গদ্যধর্মী হয়ে ওঠাও প্রয়োজন। বস্তুত, দীর্ঘকবিতা রচনার জন্য গদ্যধর্মী স্তবক রচনার দক্ষতার প্রয়োজন।

এই আলোচনার ঠিক পরেই এলিয়টের বক্তব্যের সঙ্গে একমত হয়ে আমরাও বলি, আমাদের বিচার্য হওয়া উচিত সম্পূর্ণ কবিতাটি, তার অংশবিশেষ নয়। সমগ্র কবিতার অর্থ, ধ্বনিমাধুর্য এবং উপ-স্থাপনভঙ্গির বৈশিষ্ট্য যদি হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে, তাহলে কবিতা সার্থক। এ বিচারে 'বঙ্গসুন্দরী' নিঃসন্দেহে সার্থক। বিষয় নির্বাচনে এবং উপস্থাপনের আন্তরিকতায় বিহারীলাল নিঃসন্দেহে পথিকৃৎ।

প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, বিহারীলালের এই কাব্যগ্রন্থের ছন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম জীবনের দুর্বলতা স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'একদা এই ছন্দটাই আমি বেশী করিয়া ব্যবহার করিতাম। এইটাই আমার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল।'[১০] রবীন্দ্রনাথ দ্বিধাহীন চিত্তে বলেছেন যে, 'এ ছন্দ নারীবর্ণনার উপযুক্ত বটে, ইহাতে তালে তালে নূপুর ঝংকৃত হইয়া উঠে।'[১১] 'উপহার' অংশ ছাড়া 'বঙ্গসুন্দরী'র অন্য সব কবিতা পর্যায়ক্রমে বারো আর এগার অক্ষরে বিভক্ত। পূর্বেই বলেছি যে, এখানে যুক্তাক্ষর ব্যবহৃত হয়েছে খুবই অল্প। এর ফলে ধ্বনিবৈচিত্র্য কমেছে, কিন্তু লালিত্য বৃদ্ধি পেয়েছে নিঃসন্দেহে।

লক্ষণীয় যে, 'বঙ্গসুন্দরী'র ছয় মাত্রার পর্ববিভক্তি আকস্মিক নয়। বাংলা কাব্য জগতে এই বিশেষ ধারার অনুপ্রবেশ ঘটেছে দ্বারকানাথ রায়,[১২] কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার[১৩] প্রভৃতির কাব্যে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিহারীলালের কাব্যে এই পর্ব-বিভক্তি বৈশিষ্ট্য অর্জন করছে তার দ্রুতগামিতার মধ্যে।

'সে সময় ধরা অতি সুধাময়
প্রকাশ হয়েছে মধুর মধু
জগত লোচন দিনেশ উদয়,
সহ উষা সুরসুন্দরী বধূ।'

(দ্বারকানাথ-প্রকৃতিপ্রেম)

আর—

'চির সুখী জন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে ?
কী যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে '

(কৃষ্ণচন্দ্র—সদ্ভাবশতক)

এর পাশে—

'একদিন দেব তরুণ তপন
হেরিলেন সুর নদীর জলে
অপরূপ এক কুমারীরতন
খেলা করে নীল নলিনী দলে '—পড়লেই এ

কবিতার অন্তঃপ্রকৃতির পার্থক্য স্পষ্ট ধরা পড়ে। এর গতিশীলতাই প্রধান বৈশিষ্ট্য, আর বোধ হয় সেই জন্যই কালক্রমে এই রীতিই গীতি কবিতায় অনুকরণীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যেরও অংশবিশেষ প্রবাদবাক্যের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। এই অংশগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে, কবি এগুলিতে নিছক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতারই বর্ণনা দেন, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টির গভীরতায় এবং বক্তব্যের ব্যঞ্জনায় ব্যক্তিগত চেতনা সর্বজনীন চেতনার চিরন্তন সত্যমূল্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। কবির বক্তব্য আপ্তবাক্যে উত্তীর্ণ হয়। এগুলি সন্দেহাতীত ভাবেই কাব্যমূল্য পরিচায়ক।

'বঙ্গসুন্দরী'র মধ্যে যে অংশগুলিকে আমরা প্রৌঢ়োক্তি বলে চিহ্নিত করতে পারি সেগুলি হোল—

'ব্যাঘ্রে সর্পে ভত নয়
মানুষ জন্তুকে যত ডরি।' (উপহার, স্তবক ৮)
'বুদ্ধি আর হৃদয় মিলন,
বড় সুশোভন, সুঘটন।' (উপহার, স্তবক ৪৩)
'প্রেমহীন হেয় পশুসুখ ভোগ' (উপহার, স্তবক ৬৭)

'সাগরে শয়ন হয়েছে আমার
শিশিরে যাইতে কেন ডরাই।' (অভাগিনী,
স্তবক ৪১)

উল্লেখপঞ্জী

(১) অবিনাশ চক্রবর্ত্তী : পিতৃতর্পণ, ভারতবর্ষ ১৩২০, পৃঃ ৭২

(২) সাহিত্য সাধক চরিতমালা : সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ম খণ্ড, (৫ম সংস্করণ) কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, পৃঃ ২৪

(৩) উজ্জ্বলকুমার মজুমদার : বাংলাকাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব, (১ম সংস্করণ), পৃঃ ১৫৫

(৪) ঊনবিংশ শতাব্দের গীতি কবিতা সঙ্কলন : শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, (২য় সংস্করণ), ভূমিকা পৃঃ ॥৵

(৫) সমালোচনা সাহিত্য : সম্পাদক : শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রফুল্লচন্দ্র পাল (১ম সংস্করণ), পৃঃ ২৮১

(৬) Harendra Mohan Dasgupta : Studies in Western Influence on 19th Century Bengali Poets : (1969 Edn.) P. 193 (Footnote)

(৭) উজ্জ্বলকুমার মজুমদার : বাংলাকাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব, (১ম সংস্করণ), পৃ: ১৫৬

(৮) সুকুমার সেন : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : ২য় খণ্ড, (৫ম সংস্করণ), পৃ: ১৯

(৯) T. S. Eliot : Selected Prose : Edited by J. Hayward (1963 Edn.) P. 56

(১০) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জীবনস্মৃতি, ১৩৭৮ সংস্করণ পৃঃ ১১২

(১১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবীন্দ্ররচনাবলী, (পঃ বঃ সরকার), ১৩শ খণ্ড, (১ম সংস্করণ), পৃঃ ৯০৫

(১২) দ্বারকানাথ রায়ের 'সীতাহরণ' কাব্য (১৮৫৭), 'প্রকৃতিপ্রেম' (১৮৬২) প্রকৃত সুখ (১৮৬৩) প্রভৃতি কাব্য 'বঙ্গসুন্দরী'র পূর্বে প্রকাশিত হয়।

(১৩) কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 'সদ্ভাব শতক'ও (১৮৬১) 'বঙ্গসুন্দরী'র পূর্বে প্রকাশিত হয়।

॥ ৬ ॥

'সারদা মঙ্গল' কবি বিহারীলাল রচিত কাব্যমালিকার মধ্যমণি। এ স্বীকৃতি শুধু কবির পাঠক সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমিত নয়। কবিও মনে করেন তাঁর কবিসত্তাব সার্থক প্রকাশ এই কাব্যে। 'সাধের আসন' কাব্যগ্রন্থের নবম সর্গে এই 'সারদা মঙ্গল' কাব্য রচনার ইতিহাসটি অত্যন্ত সংক্ষেপে কিন্তু নিপুণতার সঙ্গেই ব্যক্ত করেছেন। নানা কারণে কাব্য-রচনার ধারা ব্যাহত হয় এবং 'সারদা মঙ্গল' সম্পূর্ণ করতে প্রায় দশ বছর সময়ের প্রয়োজন হয়। কবি স্বীকার করেছেন, এই কাব্যটির সম্পূর্ণতা এসেছিল তাঁর ভক্ত পাঠিকা কাদম্বরী দেবীর প্রেরণায় সেই প্রসঙ্গে কবি বলেছেন—

সাক্ষাৎ আমার প্রাণ
'সারদা মঙ্গল' গান,
অসম্পূর্ণ পড়ে ছিল, যেন মরে গিয়েছে।
বে-সুরা বীণার মত
জানিনা কি দশা হোত।'
তোমারি আদরে, দেবি, ফিরে প্রাণ পেয়েছে। (৯।২)

কবির প্রাণস্বরূপ এই 'সারদা মঙ্গল' কাব্যের বীজ কবি প্রতিভার মধ্যে উপ্ত ছিল প্রথমাবধিই। কালে পরিবেশ-প্রসন্নতায় সে বীজ সার্থক কাব্যের পরিপূর্ণতায় প্রকাশিত হোল। কবি প্রতিভার সর্বোত্তম সৃষ্টি রূপে 'সারদা মঙ্গল' বাংলা কাব্যধারায় সংযোজিত হয়ে গেল।

এই কাব্যের প্রাণ-প্রতিমা 'সারদা'। কিন্তু তাঁর আবির্ভাব আকস্মিক নয়। কবির চিন্তা-বৃত্তে বিবর্তিত হয়ে 'সারদা' অভিনব মূর্তিতে এই কাব্যে অধিষ্ঠিতা, তবু তিনি যে কবিজীবনের প্রথম

অধ্যায় থেকেই তাঁর কাব্য চিন্তার মধ্যমণি হয়েই ছিলেন, এ সত্য প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

'প্রেম প্রবাহিণী' কাব্যের পঞ্চম সর্গে কাব্য-সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে দেবী সরস্বতীর উল্লেখ আছে। গীতিকবি বিহারীলালের প্রথম সার্থক আত্মপ্রকাশ যে কাব্যে সেই 'সঙ্গীত শতক'-এর মধ্যে প্রথম সঙ্গীতেই কবি বলেছেন—

মূর্তিমতী সরস্বতী
সুধা বরিষয় ;
নিতান্ত কাতর জন,
শোকে তাপে দগ্ধ মন,
শ্রবণে করিলে পান
তৃপ্ত হয়ে রয়।

বলা উচিত, 'সারদা মঙ্গল' কাব্যের উপক্রমণিকা এখানেই।
'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যের 'নারীবন্দনা' শীর্ষক দ্বিতীয়-সর্গে কবি বললেন—

প্রেমের প্রতিমা, স্নেহের সাগর
করুণা নির্ঝর দয়ার নদী,
হ'ত মরুময় সব চরাচর
না থাকিতে তুমি জগতে যদি। (৩)

'সুরবালা' শীর্ষক তৃতীয়-সর্গে কবিকে বলতে শোনা গেছে—

একদিন দেব তরুণ তপন
হেরিলেন সুরনদীর জলে
অপরূপ এক কুমারী রতন
খেলা করে নীল নলিনী দলে। (১)
বিকশিত নীল কমল আনন
বিলোচন নীল কমল হাসে,
আলো করে নীল কমল চরণ
পুরিছে ভুবন কমল বাসে। (২)

স্নেহ, প্রেম ও করুণার প্রতিমূর্তি এই অপরূপ কুমারী রতনই কি যোগীন্দ্রের ধ্যানধন? এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল ঐ কাব্যেরই তৃতীয় সর্গে—

তবে যোগিজন বসি যোগাসনে
নিমগন মনে কারে ধেয়ায়,
আচম্বিতে আসি তাঁহাদের মনে
কাহার মূরতি স্ফুরতি পায়? (৫৩)

বলাবাহুল্য, এই নয়ন-লোভন মূর্তি, যোগীদের ধ্যানধন, স্বয়ং সারদা। কবির অন্তরে এই মূর্তি রচিত হয়েছে বহুভাব ও চেতনার সমবায়ে। কবি-সত্তার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে যে দিন, সে দিন থেকেই তিল তিল করে এই তিলোত্তমা কবি হৃদয়ে সৃজিত হয়েছেন। এই তিলোত্তমার উপাদান কোন্ কোন্ উৎস থেকে সংগৃহীত, তার কিছু সন্ধান কবি দিয়েছেন 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যের 'প্রিয়তমা' নামক নবম সর্গে। সেখানে কবির উক্তি—

এস ভবারাণী, এস সরস্বতী
এস লক্ষ্মী এস জগতচ্ছটা,
এস সুধাকর-বিমল-মালতী
আহা, কি উদার রূপের ঘটা (৫১)

কবির জীবনজিজ্ঞাসা যে সত্যের সন্ধান পেয়েছে তাকেই প্রথম থেকে বিভিন্ন কাব্যের মধ্যে নানা ভাবে প্রকাশ করতে অগ্রসর হয়ে কবি পৌঁচেছেন 'সারদা মঙ্গল' কাব্যে। যে প্রশ্ন 'বঙ্গসুন্দরী'র সুরবালা শীর্ষক সর্গে উত্থাপিত হয়েছিল তারই পুনরাবৃত্তি শুনি 'সারদামঙ্গলের' মধ্যে—

হে যোগীন্দ্র যোগাসনে
ঢুলু ঢুলু দু-নয়নে
বিভোর বিহ্বল মনে কাহারে ধেয়াও? (১।১৮)

এই সাত্ত্বিক প্রশ্নের উত্তর আংশিকভাবে 'সারদামঙ্গল' কাব্যে আর

আংশিকভাবে পরবর্তীকালের কাব্য 'সাধের আসনের' মধ্যে পাওয়া গেল। আমরা যথাকালে সে বিষয়ে আলোচনা করব।

পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ 'সরস্বতী' নামক যে মূল্যবান গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করেছেন সেখানে তিনি বলেছেন যে, দেবী সরস্বতীর অন্যতম নাম 'সারদা'। জৈন শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের 'শ্রীরত্নসার ভাগবীজো' নামক গ্রন্থে 'অথ সরস্বতী স্তো ... লিখ্যতে' শীর্ষক স্তোত্রটিতে দেবীর ষোলটি নামের উল্লেখ আছে। সেগুলি যথাক্রমে ভারতী, সরস্বতী, সারদা, হংসগামিনী, বিদ্বৎমাতা, বাগেশ্বরী, কুমারী, ব্রহ্মচারিণী, বাণী, ভাষা, শ্রুতদেবী এবং কৌনী। বিহারীলাল শুধু 'সারদা' নয়, 'কুমারী' নামটিও বহুবার ব্যবহার করেছেন। যাই-হোক, জৈন শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের নিত্যকর্মপদ্ধতি শ্রেণীর যে বৃহৎ গ্রন্থখানি 'রত্নসাগর' নামে পরিচিত তার মধ্যে সরস্বতীর প্রণাম মন্ত্রে বলা হয়েছে 'শ্রী সরস্বত্যৈ নমঃ, শ্রী সারদায়ৈ নমঃ।'

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের 'সাধন মালা' নামক ধর্মগ্রন্থে চার প্রকার সরস্বতীর ধ্যান পাওয়া যায়--মহাসরস্বতী, বজ্রবীণা সরস্বতী, বজ্র সারদা এবং আর্যা সরস্বতী। এখানেও সারদা নামের ব্যবহার লক্ষণীয়।

দেবী সরস্বতী মেধা, প্রজ্ঞা, প্রভা প্রভৃতি নবশক্তির উৎস। নব-শক্তির বর্ণনামূলক শ্লোকটি নিম্নরূপ—

মেধা প্রজ্ঞা প্রভাবিদ্যা ধীধৃতি স্মৃতিবুদ্ধয়ঃ।

বিদ্যেশ্বরীতি সংপ্রোক্তা ভারত্যা নবশক্তয়ঃ।।

বিহারীলালের 'সারদা' পরিকল্পনার মধ্যে এই সমস্ত শক্তির সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। কবির কাছে 'সারদা' শুধুমাত্র 'আনন্দরূপিণী' নন, তিনি 'সাধনের ধন' 'করুণারাণী', 'সত্যরূপা', 'প্রেমের প্রতিমা', আবার 'গেরুয়া পরা ভীষণ ত্রিশূলধরা'ও বটে।

'মার্কণ্ডেয় চণ্ডী'তে যিনি বিশ্বভূতা মায়াশক্তিরূপে কীর্তিতা, তিনিই আবার চেতনা, বুদ্ধি, ক্ষান্তি, ও শান্তিরূপে বন্দিতা। কবির ভাবলোকে

এই সব রূপ ও শক্তির সমন্বয়, পর্থিব ও অপার্থিব চেতনার সম্মেলনে 'সারদা' এক অভিনব মূর্তিতে সৃষ্ট হয়েছে। তিনি 'যোগীর ধ্যানের ধন' এবং 'যোগেশ্বরী'। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, কবির চিন্তায় তন্ত্রোক্ত দেবীসাধনধারাটিও প্রাধান্য লাভ করেছিল। যিনি, কবির 'মানস মরালী', তিনিই আবার 'যোগীর ধ্যানের ধন ললাটিকা মেয়ে'। এতে একদিক থেকে যেমন কবি আর যোগীর অভিন্নতা প্রতিপন্ন হোল, অন্যদিকে তেমনি ভাব থেকে রূপে উত্তীর্ণ হওয়ার শক্তির প্রমাণটিও পাওয়া গেল। সাধক কবি বিহারীলালেব ভাব থেকে রূপে এবং রূপ থেকে ভাবে অবিরাম যাওয়া আসাব শক্তিটি স্পষ্টভাবেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রকাশিত।

'সারদামঙ্গল' পাঁচটি সর্গে বিভক্ত। এর আদি ও অন্তে যথাক্রমে 'উপহার' ও 'শান্তি' শীর্ষক দুটি গীত সংযোজিত আছে। এ ছাড়া পাঁচটি সর্গেব প্রত্যেকটিরই সূত্রপাত একটি গীত দিয়ে। অবশ্য প্রথম সর্গেব গীতটি এই সর্গেরই অন্তর্ভুক্ত। তাই তারপরের স্তবকটির সংখ্যা নির্দিষ্ট হয়েছে 'দুই'।

'সারদামঙ্গল'—এই কাব্যনামের নীচে কবিদত্ত উদ্ধৃতিটি কাব্য-রসাস্বাদনের পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক। মিলন অপেক্ষা বিরহের অবস্থাটি প্রিয়। এই বিরহের মধ্যে মিলনের জন্য তীব্রতর আকাঙ্ক্ষা সৃষ্ট হয়। বিরহের মূল্য এইখানেই। বিরহের মধ্যে নিঃসন্দেহে বিষাদেব ভাব থাকে, কিন্তু সে বিষাদ দুঃখ নয়, বরং তাকে অপ্রখর সুখ বলাই সঙ্গত। এই বিষাদের মধ্যে নিহিত থাকে একপ্রকার কোমলতা, আর অপ্রাপণীয়কে লাভ করার জন্য উদগ্র কামনা, নিহিত থাকে সীমার মধ্যে অসীমকে অনুভব করার জন্য আন্তরিক আকূতি। সীমা আর অসীমের মিলনই পূর্ণতা, কিন্তু অমায়িকভাবে অসীমানুভব থেকে যে বিচ্ছিন্নতা তাই হোল বিরহ। এ দুয়ের মধ্যে সুনির্দিষ্ট কোন সীমারেখা নেই, সম্ভবও নয়। তাই মিলনের নিবিড়তম মুহূর্তে বিরহের বেদনা অন্তরকে পরিপ্লুত করে। কবির জীবনে এই দুই ভাব-

সম্মিলনের ফলশ্রুতি ঘটে বিষাদময়তায়। ফলত 'সারদা মঙ্গল' কাব্যের রমণীয়তা তার এই কোমল করুণ বিষাদময়তারই মধ্যে।

'উপহার' শীর্ষক গীতটির মধ্যে সমগ্র কাব্যের বক্তব্যটি স্বল্পাক্ষরতায় প্রকাশিত। দেবী সারদা আর কবি প্রেয়সী এখানে একাত্মায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে বহির্বিশ্ব এবং কবিমানস তাঁদেরই যৌথ প্রভাবে পরিপূর্ণ করে রেখেছেন। 'সারদা' একাধারে প্রেম ও সৌন্দর্য চেতনার সারভূতা মূর্তি কিন্তু এক্ষেত্রেও সেই বিরহমিলনের চিরন্তন লীলার রূপটি অভিনীত। কবি বলেন—

কি জানি কি ঘুম ঘোরে,
কি চোখে দেখেছি তোরে,
এ জনম ভুলিতে রে পারিবনা আর।

কিন্তু পরক্ষণেই চরম জীবনসত্যটি স্মৃতিপথে উদিত হয়, আর কবি বলেন—

তবুও ভুলিতে হবে,
কি লয়ে পরান রবে,
কাঁদিবে চাঁদের পানে চাই বারে বার।

এরপর কবির বিরহবেদনা সমগ্রবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে সমমর্মিতার চিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে উঠে। বিশ্বব্যাপী বিষণ্ণতার দিকে তাকিয়ে কবি প্রশ্ন করেন—

হে চন্দ্রমা, কার দুখে
কাঁদিছ বিষণ্ণ মুখে?
অয়ি দিগঙ্গনে, কেন কর হাহাকার? (.....)

এরপর প্রথম সর্গে 'সুস্বপ্নরূপিণী' উষার পবিত্র সুন্দর পটভূমিতে চন্দ্রাননা বীণাপাণিকে আহ্বান জানালেন কবি। কবির উষা বর্ণনাটি নিঃসন্দেহে রসোত্তীর্ণ। এই উষাবর্ণনা অবশ্য বিহারীলালের কাব্যে একাধিকবার পাওয়া যায়।

ঋক্‌বেদের 'পুরুষসূক্তে' উষাকে 'ঋত পত্নী' রূপে বর্ণনা করা হয়েছে

'ঋত' শাশ্বত নিয়ম, শক্তি ও সৌন্দর্যানুভূতির প্রেরণা উৎস। এরই সারভূতা প্রতিমা উষা। বিশ্বশক্তি ও বিশ্বসৌন্দর্যের মহান আবির্ভাব এই উষালগ্নেই প্রত্যক্ষ করা যায়। এই পবিত্র মুহূর্তে কবিকণ্ঠে দেবী সারদার উদ্দেশ্যে আহ্বানগীত ধ্বনিত হোল—

এস মা উষার সনে
বীণাপাণি চন্দ্রাননে,
রাঙা চরণ দুখানি রাখ হৃদয় কমলে। (১০।১)

উদয়াচলে কবি প্রথমে প্রত্যক্ষ করছিলেন উষাকে আর বর্ণনা করছিলেন তাঁরই সৌন্দর্য পরম নিষ্ঠার সঙ্গে। ধীরে ধীরে মূর্তিমতী উষার মধ্যেই প্রত্যক্ষ উঠলেন দেবী সারদা। কবি যোগমগ্ন অন্তরের মধ্যে প্রত্যক্ষ করলেন—

কপোলে সুধাংশু ভাস,
অধরে অরুণ হাস,
নয়ন করুণাসিন্ধু প্রভাতের তারা জ্বলে।
মাথা ধুয়ে পয়োধরে
কোলে বীণা খেলা করে—
স্বর্গীয় অমিয় স্বরে আননে কি কথা বলে। (১০।২)

এরপর উষা অন্তর্হিতা হলেন, আর 'সাধনের ধন' 'আনন্দরূপিণী' সারদাই কবির কল্পলোকে বিশ্ববিমোহিনী মূর্তিতে অবির্ভূতা হলেন। কাব্যের সূত্রপাতেই কবি বলেছেন এই 'অমরবালা'র মূর্তি যোগেই স্ফূর্তিলাভ করে। ধ্যানাসনে সারদার বর্ণনায় কবি বলেন—

ভাবভরে মাতোয়ারা
যেন পাগলিনী পারা,
আহ্লাদে আপনা-হারা মুগুধা মোহিনী,
নিশান্তের শুকতারা,
চাঁদের সুধার ধারা,
মানস-মরালী সম আনন্দরূপিণী।

সারদাকে 'মানস-মরালী' আর 'আনন্দরূপিণী' বলে অভিহিত করার নেপথ্যে 'কাব্যাদর্শ'কার দণ্ডীর প্রভাব আছে। দণ্ডী 'সরস্বতী-প্রার্থনায়' বলেছেন- - চতুর্মুখমুখাম্ভোজ বনহংসবধূর্মম।

মানসে রমতাং দেবীং সর্বশুক্লাসরস্বতী॥

যে সরস্বতী শুক্লাম্বরা এবং হংসবধূ, ব্রহ্মার মুখপদ্মবনে যাঁর চিরাধিষ্ঠান, তিনি সেই পদ্মবন থেকে নিঃসৃত হয়ে কবির মানস সরোবরে দীর্ঘকাল কেলি করুন। শ্রদ্ধেয় শশিভূষণ দাশগুপ্তও অনুমান করেছেন যে, কবি যখন 'মানস মরাল।' বিশেষণটি ব্যবহার করেন, তখন তাঁর অবচেতন মনে দণ্ডীর প্রভাবটাই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল।

কবি প্রথম সর্গের মধ্যে জীবধাত্রী উমার আবির্ভাবলগ্নে দেবী সারদার আবির্ভাব কল্পনা করলেন। তারপর বাল্মীকির পূর্বকাল, বাল্মীকির কাল আর কালিদাসের কালোচিত ত্রিবিধ সরস্বতী মূর্তি রচনা করলেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, পূর্ববর্তী কাব্যগুলিতে যে সরস্বতীর সাক্ষাত পাওয়া গিয়েছে তিনি চিরপরিচিতা মরালবাহনা বীণাপাণি। 'সারদা মঙ্গল'-এর সরস্বতী বা সারদা কবির একান্তই মৌলিক চিন্তাসম্ভূত। প্রথানুগবর্ণনা এখানে অনুপস্থিত। কবি আপন মনের মাধুরী মিশিয়েই এক দেবামূর্তি নির্মাণ করেছেন এবং এইখানেই বিহারীলালের প্রতিষ্ঠা।

প্রাক্-বাল্মীকি যুগে সৃষ্টির আদিকালেই কবি সারদাকে প্রথম প্রত্যক্ষ করলেন বিশ্বমানবের চেতনাদাত্রীরূপে। সৃষ্টির সেই আদিকালের বর্ণনায় কবি বললেন—

নাহি চন্দ্র সূর্য তারা
অনল হিল্লোল-ধারা,
বিচিত্র-বিদ্যুৎ-দাম-দ্যুতি ঝল্‌মল্‌,
তিমিরে নিমগ্ন ভব,
নীরব নিস্তব্ধ সব,
কেবল মরুত রাশি করে কোলাহল। (১।৫)

এর পরের স্তবকে সারদার আকস্মিক আবির্ভাবের বর্ণনা। তাঁর আবির্ভাব অভিনন্দিত হোল উষা আর দিগঙ্গনাদের দ্বারা, আর—

ভাঙ্গিল মোহের ভুল,
জাগিল মানবকুল,
হেরিয়ে তরুণ উষা আনন্দে অধীর। (১।৭)

জ্ঞানদায়িনী দেবীর শুভাবির্ভাবে বিশ্বমানবমনের এই জাগৃতি-কল্পনাটি সুন্দর। মানবমনের তমিস্রা দূরীভূত হোল, আদিকবির উদ্ভবলগ্নটিও যেন সূচিত হোল সেই সঙ্গে। জ্ঞানরূপিণী দেবীর আবির্ভাবে নিখিল বিশ্বের মোহভঙ্গ ঘটল।

এর পরেই কবি বাল্মীকির কালে চলে এসেছেন। তপোভঙ্গের ভাবভোলা আদিকবির তমসাতীরে ভ্রাম্যমাণ মূর্তিটি কল্পনা করেছেন ; সেই কল্পিত মূর্তির বর্ণনায় কবি বললেন—

অম্বরে অরুণোদয়,
তলে দুলে দুলে বয়,
তমসা তটিনী রাণী কুলু কুলু স্বনে,
নিরখি লোচনলোভা
পুলিন বিপিন-শোভা
ভ্রমেন বাল্মীকি মুনি ভাব ভোলা মনে। (১।৮)

তমসাতীরে 'শাখে-শাখে রস-সুখে' ছিল ক্রৌঞ্চ আর ক্রৌঞ্চী. নিষ্ঠুর শবরের নিক্ষিপ্ত বাণে ক্রৌঞ্চ নিহত হোল, তখন—

ক্রৌঞ্চী প্রিয় সহচরে
ঘেরে ঘেরে শোক করে,
অরণ্য পুরিল তার কাতর ক্রন্দনে। (১।১০)

ঈশ্বরানুগ্রহে কবিত্বশক্তিতে শক্তিমান বাল্মীকি এ দৃশ্য দর্শন করে বিহ্বল হলেন। তাঁর শোকদীর্ণ অন্তর থেকে উদ্গীত হোল 'পরিপূর্ণ বাণীর সঙ্গীত'। কবিত্ববিকাশের সেই পরমলগ্নের বর্ণনায় কবি বলেন—

চক্ষে করি দরশন
জড়িমা-জড়িত মন,
করুণ-হৃদয় মুনি বিহ্বলের প্রায়;
সহসা ললাট ভাগে
জ্যোতির্ময়ী কন্যা জাগে,
জাগিল বিজলী যেন নীল নবঘনে! (১।১০)

আদিকবির আত্মপ্রকাশের এই চিত্রটি সুপরিকল্পিত। এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয় আরও একটি বিষয় রয়েছে। কবি বাল্মীকি মুনির চরম বিহ্বলতার মুহূর্তেই 'ললাটভাগে জ্যোতির্ময়ী কন্যা'র জাগরণ বর্ণনা করে তীব্র আবেগপ্রবণতার সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তির সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। শুধু আবেগবাহুল্যই যে কবিপ্রতিভার একমাত্র অবলম্বন নয়, 'বুদ্ধি আর হৃদয়ের মিলন'টিই সব চাইতে 'সুশোভন', এ সত্যাদর্শ বিহারীলাল বহুপূর্বেই ঘোষণা করেছেন। এখানে সেই আদর্শই পুনরুচ্চারিত হ'ল।

প্রসঙ্গত ইতিমধ্যে প্রকাশিত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্ন প্রয়াণ (১৮৭৫) কাব্যের কথাটি মনে পড়ে। সেই রূপকাশ্রয়ী কাব্যের 'শান্তিপ্রয়াণ' অংশে একটি বর্ণনায় পাই—

হৃদি মাঝে পাইয়া চেতন রবি,
ফুটিল নয়নপদ্ম 'দ্বিজ হৈনু' মনে ভাবে কবি।
ব্রহ্মতালু ভেদি'
ভবপাশ ছেদি'
উঠে জ্ঞানানল শিখা হিরন্ময় ছবি। (১৫৫)

বিহারীলাল ও দ্বিজেন্দ্রনাথের বর্ণনার মধ্যে সাধর্ম্যটি দুর্লক্ষ্য নয়। এই সাদৃশ্য আরও স্পষ্ট হয় দুই কবির কাব্যে একই উদ্দেশ্যমূলক 'শারদামঙ্গল' ও 'স্বপ্নপ্রয়াণ' সঙ্গীত সংযোজন পরিকল্পনায়। এই কাব্যগ্রন্থদ্বয়ের যৌথ [illegible] ইতিহাস বাঙ্গালী কাব্যপাঠক সম্প্রদায়ের সুপরিজ্ঞাত [illegible]। [illegible] 'সারদামঙ্গল'-এর

আলোচনা প্রসঙ্গে 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যের উল্লেখ অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনার স্থান অন্যত্র নির্দিষ্ট আছে।

এদিকে তমসানদীর তীরে যে করুণ দৃশ্য দেখা গিয়েছিল তার বর্ণনা করার পর কবি করুণারূপিণী সারদার বর্ণনা করলেন অত্যন্ত নিপুণ ভাবেই 'কভু হেসে ঢল ঢল, কভু রোষে জ্বল জ্বল'—আনন্দ বিষাদের প্রতিমূর্তি এই সারদা কিন্তু মূলত বিষাদিনী বীণাপাণিরূপেই প্রাধান্য পেলেন কবিমানসে। আদিকবি বাল্মীকির অন্তরেও এই শোকদীর্ণা সারদার মূর্তিটি কাব্য-প্রেরণার কেন্দ্রবিন্দুতে প্রতিষ্ঠিত হলেন। তখন আদিকবির যে ভাবান্তর হ'ল তার বর্ণনায় বিহারীলাল বললেন—

রোমাঞ্চিত কলেবর,
টলমল থরথর,
প্রফুল্ল কপোল বহি বহে অশ্রুজল। (১।১৮)

বিহারীলাল বাল্মীকিকে 'যোগী' আর 'ভাবে ভোলা' বলে বিশেষিত করেছেন। যোগমগ্ন সেই আদিকবিকে কবি বিহারীলাল এখন প্রশ্ন করেন—

হে যোগেন্দ্র! যোগাসনে
ঢুলু ঢুলু ছু-নয়নে
বিভোর বিহ্বল মনে কাঁহারে ধেয়াও! (১।১৮)

কবির কাব্যপাঠক মাত্রেই জানেন যে 'সারদামঙ্গল' কাব্যের এই তিনটি ছত্রের মধ্যে ভাবীকালের 'সাধের আসন' কাব্যগ্রন্থের সম্ভাবনা নিহিত রইল। যে প্রশ্ন কবিমনে উদিত হোল, এই কাব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তার উত্তর কবিই দিয়েছেন 'সাধের আসন' কাব্যের মধ্যে।

এদিকে কবি ধ্যাননিমগ্ন। কবিমানসে এখন কাব্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত। সৌভাগ্যের দেবী কমলা কবির বাঞ্ছিতা ন'ন, তাই পার্থিব সম্পদের সমস্ত প্রলোভনই আদিকবির দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হ'ল। বিহারীলাল সেই প্রত্যাখ্যানের বর্ণনা করেন—

কমলা ঠমকে হাসি
ছড়ান্ রতন রাশি,
অপাঙ্গে ভ্রূ ভঙ্গে আহা ফিরে নাহি চাও। (১।১৮)

পার্থিব সম্পদের প্রতি বিতৃষ্ণার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কবি বলেন—

এমন করুণা মেয়ে
আছে যার মুখ চেয়ে,
ছলিতে এসেছ তাঁরে কেন গো চপলা।
হেরে কন্যা করুণায়
শোক তাপ দূরে যায়—
কি কাজ—কি কাজ তাঁর তোমায় কমলা! (১।১৯)

কমলার উদ্দেশ্যে তাই কবির উক্তি—

যাও লক্ষ্মী অলকায়,
যাও লক্ষ্মী অমরায়
এস না এ যোগীজন তপোবন স্থলে। (১।২০)

কাব্যসৃষ্টিতে নিমগ্নচিত্ত কবির কাছে পার্থিব সম্পদের কোন মোহই যে নেই, সে কথা শোনা গেছে 'সঙ্গীত শতক' থেকেই। সেখানে আত্ম-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে নিজের সম্পর্কে কবির উক্তি শোনা গেছে—

ধনীর পুতলি গণে
ফেটে পড়ে যেই ধনে,
সে ধনে সুখের আশা
করিনে কখন। (২)

সেই সঙ্গীতগুলির মধ্যেই আরো শোনা গেছে যে 'মূর্তিমতী সরস্বতী'র সুধাবর্ষণ যদি সৌভাগ্যবশত কবির জীবনে ঘটে, তাতেই তাঁর সমস্ত কামনা বাসনার পরিতৃপ্তি ঘটবে। আপন মানসবৈশিষ্ট্যের বর্ণনায় কবিকণ্ঠে 'নিসর্গ সন্দর্শন' কাব্যগ্রন্থের মধ্যেও শোনা গেছে—

অয়ি সরস্বতী দেবী! ছেলেবেলা থেকে
তব অনুরক্ত ভক্ত আমি চিরকাল ;

ভুলিবনা কমলার কাম-রূপ দেখে ;
ভুগিতে প্রস্তুত আছি যেমন কপাল। (১।১২)

কবি বিহারীলাল যখন আদিকবি বাল্মীকি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তাঁর মনোভঙ্গীটি বর্ণনা করেন, তখন অনায়াসেই তারই সঙ্গে সমান্তরালভাবে কবির আপন মানসস্বরূপটিও অনুভূত হয়। প্রকৃতপক্ষে এ হ'ল স্বীয় মনোবৃত্তির আরোপিত বর্ণনা মাত্র।

এখন বাল্মীকির পরবর্তী বা মহাকবি কালিদাসের কাল সম্পর্কে কবি সচেতন হয়েছেন। একবিংশ-স্তবক থেকে সারদার ভিন্নতর মূর্তিকল্পনার মধ্যে কবিমানসের এই পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। করুণারূপিণী সারদা মহাকবি কালিদাসের কালে আনন্দের প্রতিমূর্তিতে পরিবর্তিত হলেন। সেই পরিবর্তিত মূর্তির বর্ণনায় কবি বলেন—

কোটি শশী উপহাস
উথলে লাবণ্যরাশি,
তরল দর্পণে যেন দিগন্ত আবরে ;
আচম্বিতে অপরূপ
রূপসীর প্রতিরূপ
হাসি হাসি ভাসি ভাসি উদয় অম্বরে। (১।২১)

এর পরের বেশ কয়েকটি স্তবকে 'আনন্দরূপিণী সারদা'র বর্ণনা করেছেন বিহারীলাল। এখন থেকেই দেবী সারদার সঙ্গে কবির আত্মিক-সম্পর্কটি লক্ষণীয়। কবিসত্তার আনন্দবেদনার কেন্দ্রে এই দেবী, তার ঘোষণায় কবি এখান থেকেই মুখর। কবি বলেন—

তোমারে হৃদয়ে রাখি
সদানন্দ মনে থাকি,
শ্মশান অমরাবতী দু-ই ভাল লাগে ;
গিরিমালা কুঞ্জবন,
গৃহ নাট্য-নিকেতন,
যখন যেখানে যাই যাও আগে আগে

জাগরণে জাগ হেসে,
ঘুমালে ঘুমাও শেষে,
স্বপনে মন্দার-মালা পরাইয়ে দাও গলে। (১৩০)

এখানে কবিকণ্ঠে সেই স্বীকৃতি আবার শোনা যায়—

যত মনে অভিলাষ,
তত তুমি ভালবাস,
তত মন প্রাণ ভোরে আমি ভালবাসি ;
ভক্তি ভাবে এক তানে
মজেছি তোমার ধ্যানে ;
কমলার ধন মানে নহি অভিলাষী। (১৩১)

কবিসত্তার লীলাসঙ্গিনী এই সারদা। বিশ্বসৌন্দর্য এবং বিশ্বরহস্যের লীলাধারও এই সারদা। যদিও কবি বলেছেন —'রূপে মন ভোরে রাখ', ইনি কিন্তু অবিমিশ্র সৌন্দর্য চেতনা নয়, এঁর সঙ্গে প্রেম ও অধ্যাত্ম-চেতনাও সংমিশ্রিত। এর প্রমাণ পরবর্তী স্তবকের মধ্যেই আছে।

সারদা চেতনা' কবিজীবনে ঈশ্বরচেতনার অতিরিক্ত একটি চেতনা। কবিজীবনে সে চেতনার প্রভাব সর্বাংশে ব্যাপক, কিন্তু তিনি ভগবৎ-বিশ্বাসীর ঈশ্বর বা ভগবান নন। বিচিত্র ভাবের সমন্বয়ে কবির মনোজগতে এই লীলাময়ীর উদ্ভব, বিকাশ এবং শেষ পর্যন্ত এই চেতনাটি পরিণতি আত্ম-চেতনার সঙ্গে একাত্মতা। কিন্তু কাব্যচেতনা যতক্ষণ না পরিণতির ঐ স্তরে গিয়ে উপনীত হয়েছে, ততক্ষণ মিলন-বিরহের লীলায় কাব্যসত্তা বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। কবি যখন বলেন —তুমিই মনের তৃপ্তি,

তুমি নয়নের দীপ্তি,
তোমা-হারা হলে আমি প্রাণ-হারা হই ;
করুণা-কটাক্ষে তব
প্রাণ পাই অভিনব
অভিনব শান্তিরসে মগ্ন হয়ে রই। (১৩২)

তখন 'সারদা চেতনার' স্বরূপটি উপলব্ধি সম্ভব হয়। যিনি মানসিক তৃপ্তি নিয়ে আসেন তিনি প্রেমময়ী, কিন্তু তিনিই আবার 'নয়নের দীপ্তি' অর্থাৎ সৌন্দর্য প্রতিমা। সারদা একই কালে প্রেম ও সৌন্দর্যানুভূতির প্রতীক এবং কবির সৃজনশীল প্রতিভার প্রেরণাউৎসও বটে। প্রেম ও সৌন্দর্য-চেতনার সঙ্গে প্রেরণারূপিণী সারদার প্রভাব যদি কবিসত্তা থেকে অপসৃত হয়, সে যে কবির আত্মিক মৃত্যুরই সমান হয়ে দাঁড়াবে, এ কথা অকপটে স্বীকৃত হয়েছে উপরিস্থিত স্তবকে। তবুও সাময়িক ভাবে সেই প্রভাব অপসৃত হয়, আর কবিকণ্ঠে বিরহের আর্তনাদ ধ্বনিত হয়। সমগ্র 'সারদামঙ্গল কাব্যে'র মধ্যে ঐ প্রভাবের অভাবজনিত বেদনারই প্রকাশ আত্যন্তিক হয়ে উঠেছে, আর এই কাব্যটির মূল্য ও মাধুর্য ঐখানেই।

প্রথম সর্গের শেষাংশে কবি সারদা-বিরহে আপন অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন—

অদর্শন হলে তুমি,
ত্যজি লোকালয় ভূমি,
অভাগা বেড়াবে কেঁদে নিবিড় গহনে ; (১।৩৩ ।

কবির এই বিষাদময় জীবনের স্পর্শে বিশ্বপ্রকৃতিতেও বিষাদের ছায়া নেমে আসবে। তরুলতা, জীবকুল সবকিছুই শোকমগ্ন হবে আর এই শোকাবেগের স্পর্শ দেবী সারদা স্বর্গেও অনুভব করতে পারবেন।

তখন টলিবে হায় আসন তোমার,—
হায় রে, তখন মনে পড়িবে তোমার। (১।৩৪)

কিন্তু কবির বেদনামথিত অন্তর থেকে উত্থিত আর্তনাদের স্পর্শে বিচলিত সারদা যখন মর্ত্যে পদার্পণ করবেন, তার পূর্বেই হয়ত তাঁর অদর্শনে কবির নরদেহ ধ্বংস হয়ে যাবে। মর্তে এসে কবির ভস্মরাশি আর অস্থিমালা দর্শন করে—

করুণা জাগিবে মনে ;
ধারা ব'বে দু-নয়নে,
নীরবে দাঁড়ায়ে রবে প্রতিমার প্রায়। (১।৩৪)

দেবী সারদা করুণারূপিণী। বিষাদঘন অশ্রুসজল ভাবপরিমণ্ডলের মধ্যেই ঘটে তাঁর আবির্ভাব। কিন্তু তাই বলে তাঁর অশ্রুসজল মূর্তি কল্পনা করা কবির পক্ষে সম্ভব নয়। কবি বলেন—

ভেবে সে শোকের মুখ
বিদরে আমার বুক,
মরিতে পারিনে তাই আপনার হাতে। (১৩৫)

সারদাকে কেন্দ্র করে কবির এই ভাববিমিশ্রণ রোমান্টিক মনেরই সাক্ষ্য বহন করেছে। কিন্তু এইটি বিশেষভাবেই লক্ষণীয় যে সারদা-বিরহ যখন অত্যন্ত মর্মান্তিক তখনই অনলংকৃত কাব্যদেহকে অবলম্বন করে কবির আত্মপ্রকাশ মর্মস্পর্শী। বিরহ-মিলন, বেদনা-আনন্দ অস্পষ্ট-স্পষ্ট এই দ্বিমুখী ভাবযোজনায় রোম্যাণ্টিক কবিমনের স্বপ্ন-জাগর বিলাস। এ সত্য সর্বস্বীকৃত যে, Elusive ও indistinct বা অশরীরী ও ছলনাময়ীর উদ্দেশ্যেই হাসানো, কাঁদানো আবার ফাঁকি দেবার অভিযোগ ধ্বনিত হয়েছে।

'সারদা মঙ্গলে'র দ্বিতীয় সর্গের আরম্ভেই কবির বিলাপ শ্রুত হ'ল—

হারায়েছি—হারায়েছি রে, সাধের স্বপনের ললনা!
মানস-মরালী আমার কোথা গেল বলনা!

*   *   *   *

বল বল ফিরে কি আর পাবনা!
কেন এল চেতনা! (গীত)

এর পরই কবিমনের মধ্যে শুরু হ'ল অন্বেষণ। কবিমানসীর অদর্শনে কবির মনের মধ্যে বহুপ্রকার চিন্তারই উদয় হয়। এক সময় তাঁর মনে হয় যে সারদার মর্ত্যভূমিতে আবির্ভাব আর বুঝি সম্ভব নয়। দেবী সারদার মত অলৌকিক নায়িকার উপযুক্ত নায়ক নেই, আর বাল্মীকি, কালিদাস প্রভৃতি মহাকবিদের মত ভক্তসাধকও নেই মর্ত্যভূমিতে। কবির মনে প্রশ্ন জাগে—

সে মহাপুরুষ-মেলা,
সে নন্দনবন-খেলা,
সে চির বসন্ত-বিকশিত ফুলহার,
কিছুই হেথায় নাই ;
মনে মনে ভাবি তাই,
কি দেখে আসিতে মন সরিবে তোমার ! (১।৭)

কিন্তু এই মহৈশ্বর্যময়ী যোগীশ্বরীর অভাবে কবির পক্ষে জীবন ধারণ সম্ভব নয়। তাই তাঁর যোগ্য নায়কের সুপরিকল্পিত চিত্র রচনায় ব্রতী হলেন কবি বিহারীলাল। দ্বিতীয় সর্গের প্রথম ছ'টি স্তবকে আদর্শ নায়কের রূপ বর্ণনা করলেন। প্রথম স্তবকে তার সূত্রপাত—

আহা সে পুরুষবর
না জানি কেমনতর
দাঁড়ায়ে রজতগিরি অটল সুধীর !
উদার ললাট ঘটা,
লোচনে বিজলী ছটা,
নিটোল বুকের পাটা, নধর শরীর ! (২।১)

আদর্শ নায়কের বর্ণনা করতে গিয়ে বিহারীলাল যে [illegible] পটভূমি থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন, কল্পনাশক্তির যে সমৃদ্ধতার সাক্ষ্য উপস্থিত করছেন তা সপ্রশংস উল্লেখের যোগ্য। কবি দ্বিতীয়-স্তবকে নায়ককে বল্কলাবৃত যোগীর মূর্তিতে উপস্থিত করলেন। তৃতীয়-স্তবকে তাঁর সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির সংযোগ করলেন আর যোগীর হাতে 'কুসুম রতন'—শ্রেষ্ঠ একটি কাব্য কল্পনা করলেন। এদিকে যোগমগ্ন মহানায়ক অন্তরের মধ্যে যে মহানায়িকার সন্ধান পেয়েছেন তার প্রমাণটিও অনুপস্থিত রইল না। পরপর ছ'টি স্তবক রচনা করে সারদার যথাযোগ্য নায়কের মূর্তিটি অঙ্কন করার পরই সপ্তম-স্তবকের প্রশ্ন উচ্চারিত হ'ল। হতাশ হয়েই কবি বলে উঠলেন, বাল্মীকি

কালিদাস প্রভৃতি 'মহাপুরুষ-মেলা' যখন আর নেই, দেবী সারদার প্রত্যাবর্তন অকল্পনীয়।

কবি স্বয়ং 'সারদাচেতনা'র আধার। সে চেতনার উদ্ভব আর বিকাশ কবিমানসেই। এই চিন্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বলা যায়, সারদার জন্য কল্পিত যোগ্যনায়কের মূর্তিতে কবির আত্ম-অভিক্ষেপ ঘটেছে। অষ্টম-স্তবকে এই ধারণার সমর্থন পাওয়া যায়। এখানে কবিকে বলতে শোনা যায়—

কেমনে বা তোমা বিনে
দীর্ঘ দীর্ঘ রাত্রি দিনে
সুদীর্ঘ জীবন জ্বালা স'ব অকাতরে।
কার আর মুখ চেয়ে,
অবিশ্রাম যাব বেয়ে
ভাসায়ে জর্জর তরী অকূল সাগরে। (২.৮)

কবি বিহারীলাল ও তাঁর পরিকল্পিত [illegible] একাত্মতা পেলেন এখানে। 'সারদাচেতনা'র পরিপূর্ণতা [illegible] মর্ত্য মানবীর আধারে, সেখানে পৌঁছনোর [illegible] সামান্য [illegible]।

কবির বিরহবেদনা যখন সেই বিশ্বপ্রকৃতি হতে ছড়িয়ে পড়ে আর ধরণী তারই বিলাস মুখমণ্ডল [illegible] চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সারদা [illegible] এখনো কখনো কবির মনে [illegible] শ্মশান-বৈরাগ্য, সমস্ত [illegible] দুর্বহ মনে হয়। [illegible] আনন্দসঞ্চারিণী সারদার অদর্শনে কবিজীবন যেন সম্পূর্ণ অর্থহীন। কবির বিরহবেদনা শুধু বিশ্বপ্রকৃতিকেই বিষাদগ্রস্ত করেনা, স্বয়ং সারদাও বিষণ্ণ হন। সেই বিষাদ প্রতিমার বর্ণনায় কবি বলেন—

অয়ি, এ কি, কেন কেন,
বিষণ্ণ হইলে হেন ?
আনত আনন-শশী, আনত নয়ন,

অধরে মন্থরে আসি
কপোলে মিলায় হাসি,
থর থর ওষ্ঠাধর, স্ফোরেনা বচন। (২।১১)

সারদার প্রীতিকামনায় যে কোন দুরূহ কাজই কবি করতে পারেন। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য দেবীসারদার প্রীতি উৎপাদন। তিনি বলেন—

স্বরগ-কুসুম-মালা,
নরক-জ্বলন-জ্বালা,
ধরিবে প্রফুল্ল মুখে মস্তকে সকলি। (২।১৫)

এমনকি, কবি বলেন—

নরকে নারকী-দলে
মিশিগে মনের বলে,
পরান কাতর হ'লে ডাকিব তোমায়। (২।১৬)

উপরোক্ত ছত্রগুলি পাঠ করার সময় রবীন্দ্রনাথের সেই অতি-পরিচিত সুক্তিটি মনে পড়ে—

উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে,
তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে।

কবি যে মনোবলের অধিকারী হয়ে নরকেও যেতে ভয় পান না, তাতে তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তাই প্রতিপন্ন হয়।

সারদাকে কখনো বা নির্দয় মনে হয়, মনে হয়, তাঁর কৃপালাভের সমস্ত চেষ্টা মরীচিকার মত ভ্রান্তির নামান্তর মাত্র। কিন্তু পরক্ষণেই কবির মনে হয়, স্বর্গীয় সুষমার অধিকারিণী দেবী সারদা কখনোই পাষাণী হতে পারেন না। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চেয়ে কবি বলেন—

তেমন আকৃতি, আহা,
ভাবিয়ে ভাবিয়ে যাহা
আনন্দে উন্মত্ত মন, পাগল পরাণ,

সে কি গো এমন হবে,
মোর দুখে সুখে রবে,
কাঁদিয়ে ধরিলে কর, ফিরাবে বয়ান ! (২।১৮)

'রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্'—এ প্রার্থনা মহৎ জীবনের অধিকারীরা চিরদিন উচ্চারণ করে এসেছে। কারণ বেদনার চরম আঘাতেই মানুষের ব্যক্তিস্বরূপ আপন বৈশিষ্ট্যে প্রকাশিত হয়। শক্তি সামর্থ্যের প্রকৃত পরিচয় মেলে দুঃসহ দুঃখেরই মুখোমুখি হলে। বিহারীলালের জীবনেও এই উপলব্ধি ঘটে নির্ভুল ভাবে, সারদা-বিরহেরই পরিপ্রেক্ষিতে। তাই তাঁকে বলতে শোনা যায়—

মহান্ মনের তরে
জ্বালা জ্বলে চরাচরে,
পুড়ে মরে ক্ষুদ্রেরাই পতঙ্গের প্রায় :
জ্বলুক্ যতই জ্বলে,
পর জ্বালা-মালা গলে,
নীলকণ্ঠ-কণ্ঠে জ্বলে হলাহল-দ্যুতি।
হিমাদ্রিই বক্ষ'পরে
সহে বজ্র অকাতরে,
জঙ্গল জ্বলিয়া যায় লতায় পাতায় !
অস্তাচলে চলে রবি,
কেমন প্রশান্ত ছবি !
তখনো কেমন আহা উদার বিভূতি ! (২।২১)

সারদার অদর্শনে তাঁর স্নেহ ভালোবাসা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা অন্যায়। দোলাচলচিত্ত চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচায়ক নয়, অতএব সেই বালসুলভ চাপল্য অবশ্যই বর্জনীয়। তাছাড়া সারদার প্রণয় সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা, তাঁর প্রতি অবিচারেরই নামান্তর। কবি আবার এই বিশ্বাসে সুপ্রতিষ্ঠিত যে, অপূর্ব লাবণ্যের অধিকারিণী সারদা কখনোই কারোর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করতে পারেন না।

অষ্টাদশ স্তবকে সেই বিশ্বাস প্রকাশিত। এর পরে সাধারণ ভাবেই কবির বক্তব্য হ'ল, পরিণত চিন্তার অধিকারী মানুষের মনে যখন প্রেমের সঞ্চার হয় তখন সেখানে কোন প্রকার সংশয়ের স্থান থাকে না। এ সম্পর্কে কবির বক্তব্য—

প্রণয় পবিত্র ধনে
সন্দেহ করোনা মনে,
নাগরদোলায় দোলা শিশুর মানায়!
সারদা সরলা বালা,
সবে না সন্দেহ-জ্বালা,
ব্যথা পাবে সুকোমল হৃদয় কমলে ॥ (২।১২)

প্রেমচেতনার স্বরূপ উপলব্ধির মধ্যে তৃতীয়-সর্গের উৎপত্তি। এই উপলব্ধির ক্ষেত্রে উপনীত হতে কবি সচেষ্ট। অভিষ্ট দেবীকে কেন্দ্র করে তাই জগৎসত্যটিকেও আয়ত্ত করতে চান কবি।

বিরহের বীজ বিশ্ববিধানের কেন্দ্রেই নিহিত। এর তীব্রতা অভীষ্টের উদ্দেশ্যে মানবাত্মাকে উন্মুখ করে রাখে। অপূর্ণ মানবাত্মা সম্পূর্ণতার সন্ধানে যাত্রা করে সৃষ্টির আদিযুগ থেকেই। [illegible] জন্মান্তর ভোগের আবর্তন করে তাকে তার উৎস সন্ধানের জন্য অব্যাহত থাকতে হয়। এই চলার পথে সে পার্থিব কত কিছু অভাব লাঘব করতে করতে অগ্রসর হতে থাকে, আর শেষে একদিন পাপমুক্ত হয়েই পরম[illegible] সঙ্গে মিলনে সম্পূর্ণতা লাভ করে। সেই চরম মিলনমুহূর্তের পূর্ববর্তী মুহূর্ত পর্যন্ত বিরহের বেদনায় আপ্লুত। তাকে নিয়ে কবির মানবমনে প্রশ্ন জাগে—

পূর্ণিমা-প্রমোদ আলো,
নয়নে লেগেছে ভাল;
মাঝেতে উথলে নদী, দু-পারে দু-জন,
চক্রবাক্ চক্রবাকী দু-পারে দু-জন। (৩।১)

নয়নে নয়নে মেলা,

মানসে মানসে খেলা,

অধরে প্রেমের হাসি বিষাদে মলিন ; (৩২)

সমগ্র তৃতীয়-সর্গের মধ্যে এই ভাবেরই প্রাধান্য। পৃথিবীতে সমস্ত কিছুই যথাযথভাবে রয়েছে তবুও শুধু মিলনবাসনার মধ্যে বিরহ-বেদনা অনুভূত হচ্ছে অহরহ। এ যেন বিশ্ববি... দেবীসারদার উদ্দেশ্যে কবি বলেন—

সেই আমি, সেই তুমি,

সেই এ স্বরগ-ভূমি,

সেইসব কল্পতরু সেই কুঞ্জবন ,

সেই প্রেম, সেই স্নেহ,

সেই প্রাণ, সেই দেহ,

কেন মন্দাকিনী-তীরে দু-পারে দু-জন ! (৩৩)

কোন কিছুর মধ্যেই অসঙ্গতি নেই, পরিবর্তন ঘটেনি কোথাও। তবুও মিলনের মুহূর্তটি বিরহের স্পর্শে অশ্রুসজল হয়ে থাকে কেন ? প্রেম-মন্দাকিনী কেন প্রেমিক ... দুজনকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে ? মন্দাকিনী বা স্বর্গগঙ্গার উপমাটি প্রেমাতিশয্যের ক্ষেত্রে যে উচ্চকোটির আদর্শকে চিহ্নিত করে সেটিও স্মরণীয়। কিন্তু প্রশ্ন থাকে প্রেমের পূর্ণতা বহির্বিশ্বে অবলম্বন সন্ধান করে কেন ?

কেন গো পরের করে

সুখে নির্ভর করে,

আপনা আপনি সুখী নহে কেন মন !

সদাশিব সদানন্দ

সতী বিনে নিরানন্দ,

শ্মশানে ভ্রমেণ ভোলা খ্যাপা দিগম্বর। (৩৪)

উদ্ধৃতাংশটি সুন্দর। যিনি সদানন্দ নামেই পরিচিত তাঁরও আনন্দ উৎস সতী সতীর অভাবে সদানন্দও নিরানন্দ। একটি প্রেমপ্রতিমাকে

আশ্রয় করে প্রেম তার পূর্ণতার সন্ধান করে। হৃদয়োদ্ভূত প্রেমের পূর্ণতা হৃদয়েরই মধ্যে নিরালম্ব অবস্থায় হওয়া সম্ভব নয়।

জগৎসত্যটিকে বোধির আলোকে অধিগত করতে কবি বিহারীলাল যেন ধ্যানস্থ হলেন। ধীরে ধীরে সেই সত্য কবির উপলব্ধির ক্ষেত্রে উন্মোচিত হ'ল। কামনা বাসনা সীমাহীন বটে, কিন্তু এই পৃথিবীতে তার পূর্ণতা নিতান্তই আংশিক। যাঁর প্রাপ্তির ক্ষেত্রটি বহু বিস্তৃত, তাঁর কামনা বাসনাও অসীম। যাই হোক, অন্তরবাসিনীকে অন্তরের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত রাখতে হবে তাঁর চিন্ময়ী মূর্তিতে। উপলব্ধির আলোকেই 'কায়াহীন মহাছায়া, বিশ্ববিমোহিনী মায়া'কে তৃতীয় নয়নের সামনে প্রতিষ্ঠিত রাখতে হবে। ধ্যানমগ্ন কবির অন্তর এই সত্যের উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, তিনি স্বীকার করলেন—

বিচিত্র এ মত্ত-দশা,
ভাব-ভরে যোগে বসা,
হৃদয়ে উদার জ্যোতি কি বিচিত্র জ্বলে।
কি বিচিত্র সুর তান
ভরপুর করে প্রাণ,
কে তুমি গাহিছ গান আকাশমণ্ডলে। (৩।৯)
জ্যোতির প্রবাহ মাঝে
বিশ্ব বিমোহিনী রাজে।
কে তুমি লাবণ্য-লতা মূর্তি মধুরিমা!
মৃদু মৃদু হাসি হাসি
বিলাও অমৃত রাশি
আলোয় করেছ আলো প্রেমের প্রতিমা। (৩।১০)

কবির 'বিচিত্র মত্তদশাতেই' দেবীসারদা তাঁর হৃদয়ে আবির্ভূতা হলেন আর কবি নিজের তদানীন্তন অবস্থাটির বর্ণনা একটি অনবদ্য ছত্রে তুলে ধরলেন 'অন্তরে জ্বলিছে আলো, নয়নে আঁধার।' বহির্বিশ্বে নিবদ্ধদৃষ্টি কবির কাছে সবই অন্ধকার, শুধু মাত্র জ্ঞানচক্ষুতেই

অন্তর্বিশ্বের সেই আলোকিত সত্তা পরিদৃশ্যমান। আবার এও বলা যায় যে, হৃদয়ে অনুভূত সারদাচেতনার যে তীব্র আবেগ কবি বিহারীলালকে 'বিচিত্র মত্ত দশা'য় উপনীত করেছে তার প্রভাব যতক্ষণ কবিহৃদয়কে আচ্ছন্ন করে রাখে ততক্ষণ রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের পৃথিবীও তাঁর কাছে অন্ধকার। যাঁর মন অসীমাভিসারী, সীমার আকর্ষণ কি তাঁকে বিচলিত করতে পারে?

কবির অন্তরে মুহূর্তকালের জন্য সারদার অধিষ্ঠান ঘটল। আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন কবি। কিন্তু পরক্ষণেই দেবী সারদা অন্তর্হিতা হলেন। কবিকণ্ঠে হাহাকার ধ্বনিত হ'ল—

আচম্বিতে এ কি খেলা!
নিবিড় নীরদমালা!
হা হা রে, লাবণ্য-বালা লুকা'ল লুকা'ল। (৩।১২)

এই অন্তর্ধান অত্যন্ত সাময়িক, বরং বলা সঙ্গত মৌহূর্তিক। পঞ্চদশস্তবকে বিরহ মিলনের এই লীলাচঞ্চল মুহূর্তটি ধরা পড়েছে—

ফের্ এ কি আলো এল!
কই, কই, কোথা গেল,
কেন এল, দেখা দিল, লুকাল আবার?
কে আমারে অবিরত
খেপায় খেপার মত?
জীবন-কুসুম-লতা কোথারে আমার! (৩।১৫)

অসীম প্রেমানুভূতি আর অসীম সৌন্দর্যচেতনা যে আকাঙ্ক্ষা সৃজন করে, তার সম্যক তৃপ্ত এই জীবনে সম্ভব নয়। নিরবচ্ছিন্ন প্রেম ও সৌন্দর্যোপভোগ সসীম সত্তার মধ্যে পরিচ্ছিন্ন ও সাময়িক হতে বাধ্য। এই পরিচ্ছিন্ন অসীমানুভব বিরহাবস্থার সূচনা করলেও তা কিন্তু চিরন্তনের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা নয়। সূক্ষ্ম একটি যোগসূত্র মানবাত্মার সীমিত সত্তার সঙ্গে, অসীমপ্রেম ও সৌন্দর্যচেতনার সঙ্গে নিত্য বর্তমান থাকে।

বৈষ্ণব রস-শাস্ত্র একে বলেছে 'বিরহ বিপ্রলম্ভ'। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য বিপ্রলম্ভের মূর্তিমান বিগ্রহ।[৩] যিনি 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত' কৃষ্ণ স্বরূপ, তাঁর মধ্যেই কৃষ্ণ বিরহবেদনা তীব্রতম। তাঁর অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে তাঁর স্বরচিত শ্লোক—

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দ বিরহেণ মে ॥[৪]

যাঁর অন্তরেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁরই আবার কৃষ্ণমিলনার্তি সর্বাপেক্ষা তীব্র। এখানে সীমার মধ্যে পরিচ্ছিন্ন অসীমানুভবের বেদনা বিহারীলালের বিরহানুভবের সমগোত্রীয়। তাঁর কাব্যসমালোচকরা তাঁকে দিব্যোন্মাদ বলেছেন।[৫] প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মধ্যেই দিব্যোন্মত্ততা দেখা গিয়েছিল। বিহারীলালকে শ্রীচৈতন্যদেবের পর্যায়ে উন্নীত করার প্রশ্ন অবান্তর এবং অবাস্তব। কিন্তু এই গীতিকবির 'বিচিত্র মত্ত দশাটি'কে পাঠকদের উপলব্ধি করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে ঐ উপলব্ধির ওপরই নির্ভর করবে বিহারীলালের কাব্যবিচারের যোগ্যতা, কারণ ঐ ভাবের আশ্রয়েই গড়ে উঠেছে তাঁর সৃজনশীল চিন্তা। যাইহোক 'অন্তরে জ্বলিছে আলো নয়নে আঁধার'— এই ছত্রটিকে 'বিরহ বিপ্রলম্ভ' বলে গ্রহণ করলে এবং বুঝি কেন কবি আবার বলেছেন—

বিশ্ব বিমোহিনী মায়া,
মেঘে শশী ঢাকা রাকা-রজনী-রূপিণী (৫.৪)

বিশ্ববিমোহিনী মায়াই অসীম সত্তা। কবির অন্তরে তার প্রকাশ নিরবচ্ছিন্ন নয়। মেঘাবৃত জ্যোৎস্নাকিরণের মত কখনো তা অত্যন্ত মৃদু, আবার কখনো বা মেঘনির্মুক্ত অবস্থায় নয়নমনের অসীম তৃপ্তিদায়ক।

সুখদুঃখের অনুভূতি সর্বদা বস্তু-নিরপেক্ষ নয়, যেমন নয় সৌন্দর্যানুভূতি। রসানুভূতির সহায়ক আলম্বন আর উদ্দীপন বিভাব। এই

নির্ভরশীলতা না থাকলে হয়ত মানুষের সুখ হ'ত সীমাহীন। কিন্তু বস্তুতপক্ষে এ পৃথিবীতে তা সম্ভবপর নয়, আর সেখানেই নিহিত আছে মানবজীবনের চরম ট্র্যাজেডীর বীজ। কবির উদ্বেলিত অন্তর থেকে প্রশ্ন উৎসারিত হয়—

কেন গো পরের করে
সুখের নির্ভর করে,
আপনা আপনি সুখী নহে কেন নর? (৩।৬)

না কি প্রেম-চেতনাই মিথ্যা আর অঙ্গাঙ্গীভাবে প্রেম-নির্ভর আনন্দ কামনাও মিথ্যা? কবি জানতে চান—

তবে কি সকলি ভুল?
নাই কি প্রেমের মূল?—
বিচিত্র গগন-ফুল কল্পনা-লতার? (৩।২০)

এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় অন্তরের উপলব্ধিলোকে—

এ ভুল প্রাণের ভুল,
মর্মে বিজড়িত মূল,
জীবনের সঞ্জীবনী অমৃত-বল্লরী। (৩।৩২)

মানুষের জীবনে শ্বাস-প্রশ্বাসের মতই স্বাভাবিক এই প্রেম-চেতনা। নরনারীর রক্তকণিকার মধ্যেই যেন এর জন্মাবধি অধিষ্ঠান; আর এর মধ্যেই জীবন-সঞ্জীবনীসুধা নিহিত। কবি এই চেতনাকে ভ্রান্ত অথচ 'বল্লরী' বলেছেন। আশ্রয় ছাড়া এর বৃদ্ধি ও কুসুমিত পূর্ণতা সম্ভব নয়। তেমনি মানব মানবীও প্রেমের আকাঙ্ক্ষিত সিদ্ধি খোঁজে আপন প্রণয়িনী আর প্রণয়ীর আশ্রয়ে। কবি বিহারীলালের ক্ষেত্রে এই আশ্রয় দেবী সারদা।

নারী মাত্রেরই জন্ম দেবী অংশে। মহামায়া বিশ্বধাত্রী; কিন্তু তাঁর প্রকাশ নারীমূর্তিতে। নারীর মধ্যে যিনি বিশ্বমাতৃকাকে দর্শন করতে সমর্থ হন প্রকৃত সাধক তিনিই। নারীকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে দেবীমূর্তি জ্ঞান করা ভারতীয় ঐতিহ্যের অঙ্গ। দুর্গাপূজার অঙ্গ

কুমারী পূজা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাদেবীকে দেবী-জ্ঞানে পূজা করেছিলেন।

যদিও অনস্বীকার্য যে সারদা বহুলাংশে তত্ত্ব বা ভাবমূর্তিতেই অচঞ্চল, তবু মিষ্টিক চেতনার সুগভীর উদ্ভাসনের মুহূর্তে ইনি লৌকিক মানবী-কায়ায় পরিণত হয়েছেন। সারদা-পরিকল্পনার এই মৌলিকতায় কবি বিহারীলালের কাব্যমূল্য সুপ্রতিষ্ঠিত। কবি এই সারদার উপর নির্ভরশীল, এঁরই কৃপায় কবিজীবনের সমস্ত ঊনতা পূর্ণতা লাভ করবে, জীবনের সমস্ত দুঃখ-বেদনা রমণীয় আনন্দ-সঙ্গীতে রূপান্তরিত হবে, এই আশায় কবি সারদার আশিস লাভ করতে চান। সমালোচক বলেন—'জীবনের যত কিছু কোমল, করুণ ও মধুর বন্ধন আছে তাহার সবই সারদা। এই কবির নিকট সারদা কখনো জননী, কখনো নন্দিনী, কখনো প্রণয়িনী—প্রাণের প্রাণ পরমেশ্বরী। শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, মধুর প্রায় সব রসেই এই কবি সৌন্দর্যেশ্বরীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন।'[৭]

কবি বিহারীলাল তাই ধ্যানস্থ হন 'হৃদয় প্রতিমা'র সন্ধানে। সেই মুহূর্তে অসীমানুভবের বাসনা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। কবি বলেন—

বাসনা বিচিত্র ব্যোমে
খেলা করে রবি সোমে
পরিয়ে নক্ষত্র তারা হীরকের হার, (৩।৮)

ধ্যানমগ্নতার আনন্দ প্রকৃতপক্ষে সারদার অসীমসত্তার সঙ্গে মিলনেরই আনন্দ। কবির ভাষায়—

বিচিত্র এ মত্ত-দশা—
ভাব-ভরে যোগে বসা,
হৃদয়ে উদার জ্যোতি কি বিচিত্র জ্বলে। (৩।৯)

পরবর্তী স্তবকের মধ্যেও দেখা যায় সেই যোগযুক্ত অবস্থা। সেখানেও শুনি—

জ্যোতির প্রবাহ-মাঝে
বিশ্ববিমোহিনী রাজে,
কে তুমি লাবণ্য-লতা মূর্ত্তি মধুরিমা!
মৃদু মৃদু হাসি হাসি
বিলাও অমৃত-রাশি
আলোয় করেছ আলো প্রেমের প্রতিমা. (৩।১০)

কিন্তু এই যোগযুক্ত অবস্থাটি দীর্ঘস্থায়ী হ'ল না। সারদা অন্তর্হিতা হলেন আর কবিকণ্ঠে আর্তনাদ ধ্বনিত হ'ল—'হা হা রে, লাবণ্য-বালা লুকা'ল লুকা'ল।' এখান থেকে আবার শুরু হ'ল 'জীবন সাধন ধন' সারদার অন্বেষণ। আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে, অন্বিষ্ট দেবীর সন্ধান পেয়েও পরমুহূর্তে তাঁকে কবি হারিয়েছেন। তবু কিন্তু বিরাম নেই অন্বেষণের। সারদাই কবির একমাত্র কাম্য ধন। সেই পরশ-পাথরের প্রত্যাশী কবি। কিন্তু তাকে তো সহজে পাওয়া যায় না—

বিরহী-বিহঙ্গ ডাকে সারা নিশি তরুশাখে
যারে ডাকে তার দেখা পায়না অভাগা।
তবু ডাকে সারাদিন আশাহীন শ্রান্তিহীন
একমাত্র কাজ তার ডেকে ডেকে জাগা।

পরশপাথর : সোনার তরী

অপ্রাপ্তিজনিত এই তীব্র আকাঙ্ক্ষাই বিশ্বজগতকে কর্মচঞ্চল আর গতিশীল করে রেখেছে। এই কর্মচাঞ্চল্যই বিশ্বসৌন্দর্য এবং প্রাণ-লক্ষণ। সেদিক থেকে গতি, প্রাণ ও সৌন্দর্য সমার্থক। গতিশীলতা, প্রাণচাঞ্চল্য আর সৌন্দর্যচেতনা 'সারদামঙ্গল কাব্যে'র মধ্যে উজ্জ্বল স্ফটিকের রূপ পেয়েছে। এই জন্যই 'সারদামঙ্গল' এত আকর্ষণীয়।

কবির ভাবনাবৃত্তের কেন্দ্রবিন্দুতে সারদা। তিনি বরাভয়দাত্রী, পালনকর্ত্রী আবার সংহারমূর্তিতে ত্রিশূলধারিণী ধ্বংসকর্ত্রী। আপাত-বিরোধী এই ত্রিবিধমূর্তির মধ্যে সাম্য আছে। কবির কাছে এ তিন মূর্তিই প্রিয়। 'সংহার মূরতি অতি মধুর তোমার'—কবির অখণ্ড দৃষ্টির

পরিচায়ক এই উক্তি এবং এই অখণ্ড দৃষ্টি কবিস্বরূপের মৌলিকতাও প্রমাণিত করে।

তৃতীয় সর্গের অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে মানবজীবনের উপর পবিত্র প্রেমের প্রভাব বর্ণনা। এ প্রেম প্রেমাস্পদের মধ্যে সার্থকতা লাভ করে, কিন্তু এর ভিত্তিমূলে দেহকামনা নিহিত নেই। এই আদর্শ প্রেমকে কবি বলেন 'স্বর্গসুধা'। তিনি আরও বলেন—

প্রণয় পবিত্র কাম,
সুখ-স্বর্গ-মোক্ষ-ধাম ! (৩।২৭)

অতএব এর জন্য মর্ত্য মানবের যে সীমাহীন আকাঙ্ক্ষা তা সে লাভ করেছে জীবনসূত্রে। এ আকাঙ্ক্ষা তার জন্মগত, স্বভাবগত।

সারদার জন্য কবির ব্যর্থ অন্বেষণ অব্যাহত থাকে। সারদাকে 'এলোকেশী কালী', ত্রিশূলধারিণী সংহারিণী মূর্তিতে দেখে এক এক বার তাঁর হাতেই আপনার মৃত্যু কামনা করেন কবি। মনে হয়, হয়ত বা মৃত্যুর পরে এই বিরহযন্ত্রণা থেকে চিরন্তন মুক্তিলাভ সম্ভব হবে, তখন—

আর আমি কাঁদিব না,
আর আমি কাঁদাব না,
নীরবে মিলিয়ে যাবে সাধের স্বপন ! (৩।৩৯)

কিন্তু সাধ আর সাধ্যের মধ্যে দূরত্বটুকু থেকেই যায়। অন্যান্য বহু বস্তুর মতই মৃত্যুর জন্য কবির কামনা শুধুমাত্র কামনাই থাকে। বস্তুত সারদার জন্য ব্যাকুল অন্বেষণ যেন চিরন্তনতা লাভ করে। 'ওই যে ত্রিশূল দোলে গগনমণ্ডলে'—উক্তিটিও প্রণিধান যোগ্য। ধ্বংসের মধ্যেই সৃষ্টির বীজ নিহিত আছে, এই বিশেষ দৃষ্টি ভঙ্গীও এখানে কাব্যরসাশ্রিত হয়েছে। ভারতীয় দর্শনের ঐতিহ্যধারা যে কবির জীবনে সাঙ্গীকৃত তার প্রমাণও পাওয়া গেল এখানে।

চতুর্থ সর্গে হিমালয়ের উদার ও অত্যুন্নত রূপ দর্শন করে সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা করেছেন কবি। অন্তরে প্রেমের প্রদীপ আলোকিত

থাকলে তারই আলোকে বিশ্বপ্রকৃতি রমণীয় হয়ে ওঠে। সারদার অদর্শনে সেই প্রদীপ নির্বাপিত। তাই চতুর্থ সর্গের সূত্রপাতে যে গীত, তার মধ্যে প্রকৃতি দেবীর কাছে কবির প্রশ্ন—

কোথা গো প্রকৃতি সতী সে রূপ তোমার!
যে রূপে নয়ন মন ভুলাতে আমার!

তবু প্রকৃতিদেবীর কাছে অনুরোধ জানান কবি—

চল, দেবী লয়ে চল,
যথা জাগে হিমাচল,
উদার সে রূপরাশি দেখি একবার।

'শ্রীশ্রীচণ্ডী'র পঞ্চম অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে আছে—

ইতি কৃত্বা মতিং দেবা হিমবন্তং নগেশ্বরম্।
জগ্মুস্তত্র ততো দেবীং বিষ্ণুমায়াং প্রতুষ্টুবুঃ।

অর্থাৎ এইরকম নানা চিন্তার পর দেবতারা গিরিরাজ হিমালয়ে গিয়ে বৈষ্ণবী শক্তি মহাদেবীর উত্তমরূপে স্তব করলেন। 'সারদা'-সন্ধানরত কবির মনে হিমালয়ের চিন্তা উদিত হওয়ার নেপথ্যেও 'শ্রীশ্রী চণ্ডী'র প্রভাব অকল্পনীয় নয়।

সাধারণভাবে বলা যায় যে পার্থিব চিন্তা যখন মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে তখনই প্রয়োজন হয় ভাবের জগতের। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগত থেকে মন তখনই চলে যেতে চায় অতীন্দ্রিয় জগতে। হিমালয়-চিন্তা সেই ভাবজগতে বিচরণের ইচ্ছা থেকেই উদ্ভূত। আবার একথাও স্মরণীয় যে ভাবের জগতে স্বচ্ছন্দে বিচরণের জন্য প্রয়োজন অসীমানুভূতির। আর একথা কে না জানে যে দিগন্তবিস্তৃত মহাসমুদ্র বা নভোস্পর্শী হিমালয়ের মত বিরাট কোন রহস্যময় সৌন্দর্য মনকে অসীমাভিসারী করে তোলে? এর অনেকখানিই বাক্‌পথাতীত, অস্পষ্ট স্বপ্নচারণা। কিন্তু এই ভাবের জগত অলীক নয়। আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে বিহারীলালের মধ্যে রূপ থেকে ভাবে যাতায়াতের স্বচ্ছন্দ শক্তিটি যথেষ্ট পরিমাণেই দেখা যায়।

হিমালয়ের উন্নত সৌন্দর্যের বর্ণনা অতি নিপুণভাবেই করেছেন কবি :

বিশ্ব যেন ফেলে পাছে—
কি এক দাঁড়ায়ে আছে !
কি এক প্রকাণ্ড কাণ্ড মহান্ ব্যাপার !
কি এক মহান্ মূর্ত্তি,
কি এক মহান্ স্ফূর্ত্তি,
মহান উদার সৃষ্টি প্রকৃতি তোমার ! (৪।২)

কবি বিহারীলালের হিমালয়-বর্ণনামূলক অংশটি কাব্য-পাঠকদের কাছে কতখানি প্রিয় তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় প্রমথ চৌধুরীর একটি প্রবন্ধ থেকে। সেখানে তিনি বলেছেন, 'আমি যখন প্রথম দার্জিলিং যাই তখন শিলিগুড়িতে হিমালয়ের বিরাট রূপ দেখে অবাক্ হয়ে যাই এবং আমার মুখ থেকে বিহারীলালের ক'ছত্র বেরিয়ে পড়ে।'[৮]

হিমালয়ের গৌরব বর্ণনায় কবির নৈপুণ্য মৌলিক। হিমাচল শুধু আয়তন ও বিস্তৃতিতেই বিরাট নয়, সে সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের প্রতিও ভ্রূক্ষেপহীন। প্রকৃতির তাণ্ডব, ধরিত্রীগ্রাসী সিন্ধুর উত্তাল তরঙ্গ সবই তার কাছে তুচ্ছ। সে যেন যোগমগ্ন ব্যোমকেশ।

হিমালয়ের বর্ণনায় কালিদাসের প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। বিহারীলাল বলেন—

সানু আলিঙ্গিয়ে করে
শূন্যে যেন বাজি করে,
বপ্র-কেলি-কুতূহলে মত্ত করিগণ।

'মেঘদূতে'র 'পূর্ব-মেঘ' অংশের দ্বিতীয় শ্লোকে পাওয়া যায়—

আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুং
বপ্রক্রীড়াপরিণতগজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ। (মেঘদূত : ১।২)

এই ভাব-সামঞ্জস্য মনে করিয়ে দেয় যে, ভারতীয় সাহিত্যের একটি

শক্তিশালী ঐতিহ্যধারা আমাদের সর্বপ্রকার সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপকে আশ্রয় করে প্রবাহিত হয়ে এসেছে। সেই ঐতিহ্যকে অঙ্গীকার করে নিয়ে সৃজনধর্মিতায় প্রকাশে বিন্দুমাত্রও অগৌরব নেই, বরং তা শক্তিমত্তারই পরিচায়ক। প্রকৃতপক্ষে হিমালয়ের সৌন্দর্যবর্ণনায় বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে কালিদাসের বিভিন্ন কাব্যে ব্যবহৃত ক্ষুদ্র বাক্যাংশ বা দু'একটি রূপকল্পের ছায়া অনায়াসেই চোখে পড়ে। 'কুমারসম্ভব' কাব্যের মধ্যে হিমালয় বর্ণনা আছে। বিহারীলালের 'নবীন নীরদমালা, সঙ্গে সঙ্গে করে খেলা' অংশের সঙ্গে 'আমেখলং সঞ্চরতাং ঘনানাং' অথবা—

ঐ গণ্ড শৈল-শিরে
গুল্মরাজি চিরে চিরে
বিকাশে গৈরিক ঘটা ছটা রক্তময়!
তৃণ তরু লতাজাল
অপরূপ লালে লাল
মেঘের আড়ালে যেন অরুণ উদয়। অংশের মধ্যে—

যশ্চাপ্সরো-বিভ্রম-মণ্ডনানাং সম্পাদয়িত্রীং শিখরৈর্বিভর্তি।
বলাহক-চ্ছেদ-বিভক্ত-রাগামকাল-সন্ধ্যামিব ধাতুমত্তাম্॥ (১।৪)

—প্রভৃতি শ্লোকের ছায়া দুর্লক্ষ্য নয়। প্রকৃতপক্ষে কবি বিহারীলালের উপর মহাকবি কালিদাসের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল।

বহির্জগতের সুষমা অন্তর্জগতের প্রভাবপুষ্ট দৃষ্টি-শ্রুতির সৃষ্টি। অন্তর যখন বেদনাক্লিষ্ট, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তখন সৌন্দর্যবিরহিত। কবির মধ্যে এই ভাবটি প্রথমাবধিই লক্ষ্য করা গিয়েছে। এখানেও শোনা যায়—

আয়, ফুলময়ী সতী
গিরি-ভূম ভাগ্যবতী!
অভাগার তরে তব হয়ান সৃজন। (৪।২১)

প্রকৃতির কোনো শোভাই বেদনাক্লিষ্ট অন্তরকে আকর্ষণ করে না,

অথবা বলা যায়, বেদনাক্লিষ্ট অন্তরের অধিকারী কবি প্রকৃতিতে মনোলোভন কোন সৌন্দর্যই দেখতে পান না। এ মনোভঙ্গী নতুন নয়। কবিসত্তার আত্মপ্রকাশের উষালগ্নে মৈত্রীবিরহের সঙ্গে একই মুহূর্তে প্রীতিবিরহ অনুভূত হয়েছে। বিরহব্যথায় কাতর কবিহৃদয় সৌন্দর্যানুভূতির তীব্রতা হারিয়েছে। আবার অন্বিষ্ট-দেবীর সন্ধান যখনই লাভ করেছেন কবি, তখন বিশ্বপ্রকৃতিও মনোরম হয়ে উঠেছে। কবি সারদাকে বিশ্বজগতের পটভূমিতে সৌন্দর্যেশ্বরীর ভূমিকায় অবতীর্ণ দেখেন আর আনন্দে গেয়ে ওঠেন।—

উদার—উদারতর
দাঁড়ায়ে শিখর-পর
এই যে হৃদয়-রাণী ত্রিদিব-সুষমা।
এ নিসর্গ-রঙ্গভূমি,
মনোরমা নটী তুমি ;
শোভার সাগরে এক শোভা নিরুপমা। (৫।১৬)

'নটী' অভিধাটি সুপ্রযুক্ত। কবির জীবননাট্যের প্রধানা নটী যে দেবী সারদা তাতে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই। সঙ্গে সঙ্গে এটিও স্মরণীয় যে নিসর্গরঙ্গভূমির আলোছায়ার সীমা ঐ নটীর দর্শন-অদর্শনের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। সারদার দর্শনে কবি তাঁর আনন্দ প্রকাশ করে বলেন—

দরিদ্র ইন্দ্রত্ব-লাভে
কতটুকু সুখ পাবে ?
আমার সুখের সিন্ধু অনন্ত উদার ;—
কবির সুখের সিন্ধু অনন্ত উদার। (৫।১৯)

বলতে গিয়ে 'আমার' শব্দটিকে স্পষ্টীকৃত করলেন দ্বিতীয় ছত্রে 'কবির' শব্দ ব্যবহার করে। সাধারণ মানুষের সুখানুভূতি প্রধানত বস্তুনির্ভর, কিন্তু শিল্পী ও কবির সুখ একান্তই ভাবনির্ভর। ঠিক পরের স্তবকেই বললেন এ সুখের আস্বাদন যে করে—

সে যেন কি হয়ে যায়,
সে যেন কী নিধি পায়,
* * * * * * * * *
এমন আনন্দ আর নাই ত্রিভুবনে। (৫।২০)

এটিই 'আনন্দরূপমমৃতম্'। এই আনন্দ-স্বরূপের আস্বাদনের মধ্যে জীবনের চরম সার্থকতা। বিশ্বব্যাপী অজস্র আনন্দের আয়োজন, আর তারই প্রকাশ ঔদার্যে উত্তীর্ণ হৃদয়ের অনুভূতি-লোকে, সেখানে সমস্ত তুচ্ছ আর মূল্যহীন বস্তু আনন্দের উপাদানে রূপান্তরিত। এর ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ একে বলেছেন 'শক্তি'। বলেছেন এর উপলব্ধি যদি জীবনে না হয় তাহলে জীবনই ব্যর্থ।[৭] এ আনন্দকে কবি বিহারীলালও বস্তুস্বরূপে প্রকাশিত দেখেছেন আর রসস্বরূপে অনুভব করেছেন। 'আনন্দরূপমমৃতম্ যদ্‌বিভাতি' আমাদের চতুষ্পার্শে অমৃতধর্মী অবিনাশী এই আনন্দেরই অজস্র প্রকাশ। 'সারদামঙ্গল'-এর মধ্যে সেই আনন্দাস্বাদনেরই মহৎ প্রচেষ্টা, সেই প্রচেষ্টার সাফল্যেই 'সারদামঙ্গল' কাব্যের মূল্য।

বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে যে বিচিত্র সৌন্দর্যের প্রকাশ, কবি স্বীয় অন্তরের প্রসাদগুণে সেগুলির সঙ্গে একটি অন্তরঙ্গ যোগসূত্র স্থাপন করেন। এর কল্যাণে তিনি প্রকৃতিকে কখনো ভাবে কখনো বা স্বীয়চিন্তার মায়া-মুকুরে দর্শন করেন। এরই ফলে বর্ণনায় প্রকৃতি এসেছে কখনো স্বভাবোক্তির মাধ্যমে, কখনো বা কল্পনার লূতাতন্তুতে নির্মিত অতিসূক্ষ্ম অথচ বর্ণাঢ্য চিত্রের আধারে। 'সারদামঙ্গলে'র মধ্যে এই উভয়বিধ বাক্‌প্রতিমার দর্শন পাওয়া যায়।

বিহারীলালের 'সারদামঙ্গলে' রূপ অপেক্ষা ভাবেরই প্রাধান্য দেখা যায়, এ অভিমত কাব্যমূল্য-হানিকর নয়। বিশেষ করে গীতিকবিতার পক্ষে তো নয়ই। কাব্য-আলোচনা-প্রসঙ্গে কবির ভাব থেকে রূপে আবার রূপ থেকে ভাবে স্বচ্ছন্দ গতায়াতের ধর্মটি দেখা গিয়েছে। এটি মানসিক দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক প্রক্রিয়া।

'সারদা' পরিকল্পনার মধ্যে ব্যক্তিচৈতন্যাতীত এক মহাচৈতন্যের স্বীকৃতি আছে। বহু কবি আর দার্শনিক তাঁদের জীবনে এই মহাচৈতন্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব অনুভব করেছেন। তাঁরা তাঁদের মনোমত নামকরণও করেছেন এই শক্তির। Socrates যাকে-Daimon বলেন বা, Plato যাকে Idea বলে অভিহিত করেন, তিনি ঐ অতি চৈতন্য-রূপিণী শক্তি। H. G. Wells যখন বলেন The driver of the Machineman, তখন অনুভূতিটি আরও স্পষ্ট হয়

বিহারীলালের 'সারদা' দার্শনিকদেব পরিভাষায় 'মায়া', কিন্তু তিনি একাধারে কান্তি, প্রেম ও জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী, মায়া ও শক্তিরূপিণী। বেদান্তের মায়াবাদ আর তন্ত্রোক্ত শক্তিবাদ ভারতীয় চেতনায় একাত্ম হয়ে গিয়েছে। ভারতীয় ঐতিহ্যের সমন্বয়ধর্মিতার এ একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

কবি যাঁকে 'বীণাপাণি চন্দ্রাননে' বলে সম্বোধন করেছেন তাঁকেই আবার 'নয়ন অমৃতরাশি প্রেয়সী আমার' বলেছেন। যাঁর 'পদভরে কাঁপে ধরা ভূধর অধীর' তিনিই আবার 'প্রকৃতি সতী' আর 'লাবণ্যবালা'। একদিকে রইল সমন্বয়ধর্মিতাব প্রকাশ, অন্যদিকে রইল মহাচৈতন্যের স্বীকৃতি। 'সারদা' এ বিচারে সম্পূর্ণ নবাগতা। এরই বিবর্তিত রূপ রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' আর 'লীলাসঙ্গিনী' পরিকল্পনায়। কিন্তু উভয়ের মধ্যে রূপতন্ময়তা থেকে ভাবলোকে উত্তরণ। সূক্ষ্ম বিচারে রূপ ও ভাব অবিভাজ্য। তবে প্রাধান্য দিয়েই আমরা তাদের পূর্বাপর সম্বন্ধ নিরূপণ করতে চাইছি। বিহারীলালে ভাবপ্রাধান্য রূপে উত্তীর্ণ করেছে কবিকে, আর রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে রূপ-বৈচিত্র্য প্রাথমিক স্তরে প্রাধান্য পেয়ে ভাবলোকে উত্তীর্ণ হয়েছে। এর কারণ বিহারীলাল চরিত্র বিচারে 'যোগী' আর রবীন্দ্রনাথ 'কবি'। বিহারী-লাল স্বয়ং এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন—

কবিরা দেখেছে তাঁরে নেশার নয়নে,
যোগীরা দেখেছে তাঁরে যোগের সাধনে।

'সারদামঙ্গল' পঞ্চম সর্গের মধ্যেও সারদার অন্বেষণ অব্যাহত। কবির বিরহবেদনা আর শোকমগ্নতা জড় ও চেতন জগতের মধ্যেও অনুভূত ও স্বীয় বৈশিষ্ট্যে অভিব্যক্ত। সে বর্ণনাগুলি এইরকম—

কপোতী সুদূর বনে,
ঘুঘু—ঘু করুণ স্বনে
কাঁদিয়ে বলিছে যেন শোকের বারতা। (৫।১)
তৃষ্ণায় ফাটিছে ছাতি,
জল খুঁজে পাতি পাতি
বেড়ায় মহিষ-যূথ চারি দিকে ফিরে।
এলায়ে পড়িছে গা,
লটপট করে পা,
ধুঁকিয়ে হরিণগুলি চলে ধীরে ধীরে। (৫।২)
কিবে স্নিগ্ধ দরশন,
তরুরাজি ঘন ঘন,
অতল পাতালপুরী নিবিড় গহন!
যত দূর যায় দেখা
ঢেকে আছে উপত্যকা,
গভীর গম্ভীর স্থির মেঘের মতন। (৫।৩)

শুধু প্রাণীজগতের মধ্যেই বেদনাবোধ সীমাবদ্ধ নয়। তরুলতাও অপ্রাপ্তিজনিত বেদনায় 'গভীর গম্ভীর' হয়ে আছে। কিন্তু যিনি 'কায়াহীন মহাছায়া, বিশ্ব বিমোহিনী মায়া' তিনি কখনো দৃষ্টিগ্রাহ্যরূপে অবতীর্ণ হতে পারেন না। তাঁর স্বরূপ শুধুমাত্র উপলব্ধিতে ধরা পড়ে। এই উপলব্ধি যতদিন অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে ততদিন 'রাকা রজনী'-র শশী মেঘেই ঢাকা থাকে। কবির উপমাটিও অপূর্ব—'উপরে উজলে ভানু, ভূতলে যামিনী'। যিনি বিশ্বধ্যেয়া, বিশ্বসৌন্দর্য ও প্রেমসম্পদের মূর্তিমতী দেবী তাঁর সত্তা স্বীকৃত, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান আর ভক্তির অভাবে কবির ধ্যানলোকে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত নন।

বেদনার প্রকাশ এই সর্গের ছত্রে ছত্রে। যা 'জ্বলন্ত তপন'-এর মত উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক, সে কিন্তু 'অনন্ত জলদজালে' আবৃত। তাঁর তেজোরাশি চেতন ও অচেতন জগতকে যখন আতঙ্কগ্রস্ত আড়ষ্ট করে ফেলে কবি তখন 'ত্রিলোক তারিণী' গঙ্গার শান্তিময় 'তরল তরঙ্গ'কে স্মরণ করেন।

এক সময় সারদা কবির অন্তর্জগতে আবির্ভূতা হন আর বহির্বিশ্বও সেই মিলনের আনন্দে অধীর হয়ে ওঠে। কবি বলেন—

নিসর্গ মহান মূর্ত্তি
চতুর্দ্দিকে পায় স্ফূর্ত্তি
চতুর্দ্দিকে যেন মহা সমুদ্র অপার। (৫।১৪)

আনন্দের এই বিশ্বব্যাপ্ত স্বরূপটিকে প্রকাশ করলেন কবি, বললেন—

এমন আনন্দ আর নাই ত্রিভুবনে;
হে প্রশান্ত গিরি-ভূমি,
জীবন জুড়ালে তুমি
জীবন্ত করিয়ে মম জীবনের ধনে!
এমন আনন্দ আর নাই ত্রিভুবনে। (৫।২১)

যিনি বিশ্বনিয়ন্ত্রী তিনি এখন রইলেন কবির অনুভূতিলোকে আর তাঁরই আশিস-আলোকে কবির শুরু হোল জীবন-জিজ্ঞাসা, জগৎ ও জীবনের অর্থভেদ-প্রচেষ্টা। ধীরে ধীরে কবি একসময় অসীম থেকে সীমায় প্রত্যাবর্তন করলেন, বললেন—

দাঁড়াও হৃদয়েশ্বরী,
ত্রিভুবন আলো করি,
দু'নয়ন ভরি ভরি দেখিব তোমায়। (৫।২৩)

ইনি কবিপ্রেয়সী। 'সারদামঙ্গলের' শেষে যে শান্তিগীতিটি সংযোজিত হয়েছে সেখানে এই প্রত্যাবর্তনটি আরো সুস্পষ্ট। অসীম থেকে সীমায় প্রত্যাবৃত্ত কবি আপন সংসারের মধ্যেই এখন পরিতৃপ্ত জীবনের অধিকারী। সেখানে কমলা ও সারদার একীকৃত মূর্তিতে

কবিপ্রিয়া বিরাজিতা; 'চারিদিকে কুমারী কুমার'; 'দিন যাপনের গ্লানি' ঘরে এলে' উলে যায়' সম্পূর্ণভাবেই। অতএব কবি পরম আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন—

তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী,
আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি,
হোগ্‌গে এ বসুমতী যার খুশী তার। শান্তিগীতি : সারদামঙ্গল

এটি কবির 'বেপরোয়া ভাব' নয় বা এটি 'উন্মাদের কথা'-ও নয়।[১০] এর মধ্যে কবির জীবনদর্শন এবং ভারতীয় ঐতিহ্য-ধারা অত্যন্ত পরিচ্ছন্নভাবেই প্রকাশিত। এ যাবৎ আলোচনায় কবিসত্তার এই দিকটি বার বার তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে যে কান্তি, প্রেম ও জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সারদার ভাবমূর্তি কবিপ্রেয়সীর মধ্যে একাত্ম হয়ে গিয়েছে। যে বিশ্বমাতৃকা বুদ্ধি, শক্তি, শ্রদ্ধা ও কান্তির অধিষ্ঠাত্রীরূপে সর্বভূতে বিরাজিতা, তিনিই আবার যে লক্ষ্মীরূপা শর্বাণী একথা 'শ্রীশ্রীচণ্ডী'র ৫ম অধ্যায়েই আছে। এর মধ্যে অসঙ্গতি কোথাও নেই। বরং এই সমন্বয়ধর্মী শক্তিবাদের অনুবর্তন ভারতীয় ঐতিহ্যানুগত। 'সারদা' পরিকল্পনায় কবির জীবনে এই শক্তিসাধনার ধারাটি প্রকাশিত। অন্তঃসম্পদ কবির যথেষ্ট পরিমাণেই সংগৃহীত হয়েছে এবং তাও ঐ সারদার আশিসলব্ধ। এ বিচারে তিনি লক্ষ্মী ও সরস্বতী অতএব কবিপ্রেয়সীও লক্ষ্মী সরস্বতীর মিলিত বিগ্রহ। কবিপ্রেয়সীর মধ্যে জগন্মাতার রূপদর্শন এবং সেই মূর্তির মধ্যে জগদ্ধাত্রীর অনুধ্যানের শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কেও পূর্বেই আলোচনা হয়েছে।

কবি আপন সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত। পার্থিব ভোগবাসনা বা সম্পদের প্রতি তাঁর অনীহা সুবিদিত, তাই তিনি ঘোষণা করলেন, তিনি 'ব্রহ্মাণ্ডের পতি'। বসুমতীর অন্যকোন ভোগ্যবস্তুর প্রতি তাঁর আসক্তি নেই, 'হোগ্‌গে এ বসুমতী যার খুশী তার'। যিনি 'ভূভৃতাং লক্ষ্মী'— ভূপতিদের আরাধ্যাদেবী লক্ষ্মী, তাঁর সঙ্গে কবির কোন আত্মিক সম্পর্ক নেই। এ উন্মাদের কথা নয়, প্রবল আত্মপ্রত্যয়ী

কবির স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা। আদর্শবাদী ভাবুক কবির বস্তুবাদের বিরুদ্ধে মুখর প্রতিবাদ।

'সারদামঙ্গলে'র মধ্যে মানবপ্রেমের সঙ্গে প্রকৃতিপ্রীতি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত হয়ে আছে। এ হ'ল যথাক্রমে প্রেম ও কান্তিসত্তা। প্রেমসত্তার সাহায্যে কান্তিসত্তায় উত্তরণপ্রচেষ্টার কথা বহুবার উল্লেখিত হয়েছে। প্রেমসত্তার মধ্যে মিলন-বিরহ-মূলক ভাববৈচিত্র্য নিহিত। বিরহাতুর মুহূর্তে কবির মনে প্রশ্ন জাগে, এই প্রেমময় সত্তা কি নিতান্তই 'গগন ফুল'? পরমুহূর্তে কবির উপলব্ধিতে ধরা পড়ে যে মিলন ও বিরহের অপূর্ব রাগরঞ্জিত প্রেমময় সত্তা বিশ্বজীবনের মধ্যেই অনুস্যূত হয়ে আছে। এই সত্তার উদ্বোধন মানবজীবনকে মৃত্যুঞ্জয়ী করে তোলে।

প্রকৃতি-চিত্রের পটভূমিতে বিহারীলাল প্রথমাবধিই মানব-জীবন-চিত্র এঁকে চলেছেন। কিন্তু আঙ্গিকের দুর্বলতায় বহুক্ষেত্রেই নিতান্তই ভাবস্তরে থেকে যায়, পাঠকের অন্তরে সার্থকরূপ পরিগ্রহ করতে পারে না। কলাকৌশলগত এই ত্রুটি প্রথম থেকেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে এও স্বীকৃত হওয়া উচিত যে, প্রকৃতি ও মানব জীবনের যে ঐক্যবদ্ধ রূপটি কবি তুলে ধরছেন তা একান্তই মৌলিক। উত্তরকালে বাংলা কাব্যধারায় এ চিন্তা যথোচিত মর্যাদা পেয়েছে।

'সারদা'কে কবি 'যোগেশ্বরী' অভিধায় ভূষিত করেছেন। 'যোগের অন্য নাম 'মিলন'। পার্থিব জগতে এই মিলন দেশ, কাল আর পাত্র পাত্রীর আধারে সসীম এবং অতৃপ্ত। তাই মিলনের মুহূর্তে বিরহ-চিন্তায় আত্মার ক্রন্দন শোনা যায়। বিরহ বা আত্মার যোগভ্রংশ অবস্থায়, যোগযুক্ত বা মিলনাবস্থায় প্রত্যাবর্তনের আকুতিটি তীব্র হয়ে ওঠে। কবি, শিল্পী আর যোগীর প্রাথমিক সাধনা দেশ, কাল আর পাত্রাধারে যে বিরহ অবস্থা তার বিনাশ ঘটানো। তারপরেই বিশ্বচেতনার উপলব্ধির মধ্যে তাঁরা অনন্ত মিলনের আস্বাদলাভ করেন। এই অবস্থায় প্রেম, সৌন্দর্য আর আনন্দের পরিপূর্ণ আস্বাদন

সম্ভব। মানুষ জন্মসূত্রে অপূর্ণ হলেও, সংখ্যাগণনার অতীত প্রত্যুষে যোগযুক্ত অবস্থায় পূর্ণতার আস্বাদন সে লাভ করেছিল। অপূর্ণতার আধারে মর্তমানব সেই পূর্ণতার মিলনাভিসারেই যাত্রা করে। এই অভিসারযাত্রীদের প্রথম সারিতে আছেন কবি, শিল্পী আর যোগীরা।

বিহারীলাল প্রেমিক। সে প্রেম মর্ত্যমানবীয় আধারে পরিপুষ্টি লাভ করলেও, দেহসম্ভোগের সীমায় আবদ্ধ নয়। এর গভীরতা দেবী সারদার আশিসপুষ্ট, তাই এ প্রেম আদর্শায়িত এবং অনন্তাভিমুখী। এ প্রেমচেতনা রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও সৌন্দর্যচেতনাকে অর্থবান করে তুলেছে—

জ্যোৎস্নারাতে নিভৃতমন্দিরে
প্রেয়সীরে
যে নামে ডাকিতে ধীরে ধীরে
সেই কানে-কানে-ডাকা রেখে গেলে এইখানে
অনন্তের কানে।
প্রেমের করুণ কোমলতা
ফুটিল তা
সৌন্দর্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে। (সাজাহান : বলাকা)

কিন্তু বিহারীলালের ক্ষেত্রে এই চেতনার সঙ্গে তৃতীয় একটি ভাব মিশ্রিত হয়েছে, সেটি হ'ল শ্রদ্ধা। তাকে জ্ঞান, ভক্তি, শ্রদ্ধা বা আধ্যাত্মিক চেতনাও বলতে পারি। আমাদের বিশ্বাস কবি বিহারী-লালের সারদাকেন্দ্রিক মিষ্টিক চেতনার মূলগত সত্যটি প্রেম, প্রীতি ও শ্রদ্ধার মিলিত মূল্যেই নির্ধারিত। সেই চেতনা আবার কবিপ্রেয়সীর মর্ত্যকায়ার মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করেছে। এ সম্বন্ধে কবির উক্তি—

এ মর্ত্যভুবনে কমল কাননে
নারী-সরস্বতী বিরাজ করে ;
কবে সমাদরে, সদানন্দ মনে,
পূজিতে তাঁহারে শিখিবে নরে ? (বঙ্গসুন্দরী ৯।৩০)

বিহারীলালের 'সারদা' একই কালে সৌন্দর্য আর প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী হয়েও Shelley-র কল্পনাধৃত ভাবমূর্তির মধ্যেই অবসিত হননি। প্রেরণাদাত্রী ও সৌন্দর্যানুভূতির লীলাক্ষেত্রে তিলোত্তমা হয়েও ইনি কবিপ্রেয়সী রূপে কবিরই ঘরণী। এই প্রেমচেতনাকে তাই Platonic বলে চিহ্নিত করা যায় না।

'সারদামঙ্গল' পঞ্চাংক নাটকের মতই পঞ্চসর্গের সমাহারমূলক কাব্য। এর সর্গসজ্জা একান্তই অনুভূতিভিত্তিক। ভাবপ্রধান কাব্যের পক্ষে তা অস্বাভাবিক নয়।

'সারদামঙ্গলে'র সূত্রপাতে উষার পটভূমিতে সারদার মূর্তি দর্শন করেছেন কবি। এরপর ত্রিকালের ত্রিবিধ মূর্তিকল্পনার ক্ষেত্রে কখনো দর্শন কখনো অদর্শনের অর্থাৎ মিলন বিরহের আলোছায়া-ঘেরা বন্ধুর পথে কবির যাত্রা শুরু হয়েছে। এই যাত্রাপথের আনন্দ-বেদনার ছায়া কাব্যটির সর্বাঙ্গে জড়িয়ে আছে। কবির অনুভূতিলোকে এই আনন্দবেদনার প্রতিক্রিয়া যখন যেভাবে ঘটেছে, কাব্যটির সর্গবিভক্তি ঘটেছে সেইভাবে। কখনো মিলনের আনন্দ, কখনো বিরহের বিষাদ, আবার কখনো বা এ দুয়ের সঙ্গমস্থলে সংশয়ক্লিষ্ট চিন্তার বহিঃপ্রকাশ সারদামঙ্গল কাব্যের সর্গসজ্জাকে অনেকখানি যুক্তি-সহ করে তুলেছে। আবার একথাও আমাদের মনে রাখা উচিত যে, ভাবের জগতে সীমারেখাও একান্তই ভাবরূপী। দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর নির্মাণ করে বস্তুবিভাজনের দায়িত্ব সেখানে অস্বীকৃত। সেখানে বরং ভাব চকিতের মধ্যে ভাবান্তরে উপনীত হয়। যা একান্তই মানসিক তার গতি যে অবিশ্বাস্য পরিমাণেই দ্রুত এবং স্বাভাবিক। অতএব 'দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া' বা 'দু'জনে মুখোমুখি গভীর দুখে দুখী' শুনলে যেমন বিভ্রান্ত হইনা, তেমনি সারদামঙ্গলের মধ্যে মিলনের মুহূর্তেই বিরহের আভাসে বিব্রত বোধ করিনা। আর কবি একে নিজেই 'স্পষ্ট, কখন অস্পষ্ট, কখন বা তিরোহিত ভাব' বলে বর্ণনা করেছেন।[১১]

'সারদামঙ্গল' একটি সমগ্র কাব্য নহে, তাহাকে কতকগুলি খণ্ড কবিতার সমষ্টিরূপে দেখিলে তাহার অর্থবোধ হইতে কষ্ট হয় না।'[১২] কবিগুরুর এই অভিমত সর্বতোভাবে স্বীকার্য নয়। বিভিন্ন সর্গের মধ্যে একটি ভাবগত ঐক্য অবশ্যই আছে। এই কথাই বিশদভাবে পূর্বে বলা হয়েছে। এখন বিভিন্ন সর্গের বিষয়বস্তু ও ভাবরাজির ক্রমবিবর্তনের ধারাটিকে অনুসরণ করার চেষ্টা প্রয়োজন।

কাব্যটির প্রথম-সর্গে 'স্বপ্নরূপিণী' উষার সুন্দর পটভূমিতে সারদার প্রথম আবির্ভাব ঘটল। ইনি নিত্যকালের সরস্বতী নন। কবির অন্তরে ত্রিকালের উপযোগী ত্রিবিধ সারদা মূর্তিতে আবির্ভূতা হয়ে ইনি আবার তিরোহিতা হলেন। এঁকে মর্ত্যভূমিতে আবির্ভূতা দেখতে চান কবি। কিন্তু 'কি দেখে আসিতে মন সরিবে তোমার!' দ্বিতীয় সর্গে তাই এই লোকোত্তর নায়িকার জন্য যোগ্য নায়কের চিত্র অংকিত হ'ল। তবুও কবির আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হ'ল না। দুঃসহ বিচ্ছেদ-বেদনার অবসানকল্পে কবি ধ্যানস্থ হ'লেন। এই ধ্যানমগ্নতা এবং ধ্যানভঙ্গের অবসরে সারদার সঙ্গে মিলন বিরহের বর্ণনা তৃতীয়সর্গের মধ্যে আছে। সারদা এই সর্গে নানারূপে আবির্ভূতা হয়েছেন, কিন্তু কোনরূপেই সুপ্রতিষ্ঠিতা হন নি। এঁর সন্ধানে তাই চতুর্থ সর্গে হিমালয় যাত্রা করলেন কবি। পঞ্চম সর্গের পূর্বভাগ পর্যন্ত হিমালয়ের উদার সৌন্দর্যের মধ্যে কবির সারদা-সন্ধান অব্যাহত রইল। সন্ধানতৎপর কবি একসময় অনুভব করলেন যে, এই 'বিশ্ববিমোহিনী মায়া'কে অন্তরের অন্তঃস্থলে একটি চৈতন্য-স্বরূপে উপলব্ধি করতে হয়। কবি উপলব্ধির ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হলেন আর তারই আলোকে পঞ্চম-সর্গের উত্তরভাগ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এই পর্বে এসে 'ত্রিবিধ সুষমা'র অধিকারিণী 'হৃদয়রাণী' শেষ পর্যন্ত কবিপ্রেয়সীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেলেন। ভাবরাজি রূপবিশেষে সমাহিত হয়ে গেল। প্রথমসর্গের উত্তরভাগ থেকেই অন্বেষণ শুরু হয়েছিল। কিন্তু তা ছিল মূলত প্রেম ও সৌন্দর্য সত্তারই অন্বেষণ। সাময়িক মিলনের পর বিরহজনিত যে আর্তি তারই

প্রকাশ দেখা যায় পঞ্চমসর্গের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বর্ণনার মধ্যে। এরপর উপলব্ধির নিগূঢ়তায় প্রেম ও সৌন্দর্যসত্তার পূর্ণতা পরিলক্ষিত হ'ল কবিপ্রিয়ার মধ্যে। কামনাপূর্তির আনন্দে শান্তিগীত গেয়ে উঠলেন কবি—'প্রিয়ে কি মধুর মনোহর মুরতি তোমার'।

'সারদা মঙ্গলে'র সর্গসজ্জাকে অনুভূতিভিত্তিক বলার পরও কিন্তু দেখা যায় যে, মিলন ও বিরহ মূলক সর্গ পৃথকীকৃত নয়। তা হওয়া সম্ভবও নয়। 'শাক্ত পদাবলী'র অন্তর্গত আগমনী পর্যায়ের বহু সঙ্গীতে বিজয়ার স্পর্শ ওতপ্রোত ভাবে মিশ্রিত হয়ে আছে। কিন্তু এর জন্য আগমনী সঙ্গীতের মূল্যহানি ঘটেনি। মিলনের সঙ্গে বিরহের সম্পর্ক এমনি নিবিড় যে, তাদের মধ্যে ভেদরেখা অঙ্কন করা অসম্ভব। তবু সমস্ত ক'টি সর্গকে একত্রে পাঠ করলে, সেগুলিতে যে অন্তঃসঙ্গতি আছে সেটি অনায়াসে অনুভূত হয়। সর্গগুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে গ্রহণ করলে অর্থবোধ বাধাগ্রস্ত হতে বাধ্য। সর্গগুলির মধ্যে ভাবসঙ্গতির কথা শ্রদ্ধেয় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও স্বীকার করেছেন।[১৩] একথাও অপ্রাসঙ্গিক নয় যে বহুবিধ ভাবের সমষ্টি সার্থক কাব্যসৃষ্টিতে সহায়তাই করেছে। মেঘদূত তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

অনাথবন্ধু রায়কে লেখা যে পত্রাংশ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'বিহারীলালের কাব্য সংগ্রহ' গ্রন্থে সংযুক্ত হয়েছে, তাতে কবি লিখেছেন, 'মৈত্রীবিরহ, প্রীতিবিরহ, সরস্বতীবিরহ যুগপৎ ত্রিবিধ বিরহে উন্মত্তবৎ হইয়া আমি 'সারদা মঙ্গল' রচনা করি'। অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী বলেছেন, সরস্বতীবিরহ বুঝিতে পারি। কবিমাত্রই কখনো না কখনো সরস্বতীবিরহ অনুভব করেছেন। মৈত্রী বিরহ ও প্রীতিবিরহ কি? কবিজীবনের কোন অকথিত অধ্যায় ছুটি গুপ্ত আছে তাদের মধ্যে? কবি বলেননি।[১৪]

প্রকৃতপক্ষে এ দু'টি অধ্যায় সম্পর্কে কবি কোন গোপনীয়তা রক্ষা করেননি। অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবেই বিভিন্নস্থানে এ অধ্যায়গুলির অন্তর্নিহিত তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন।

বিহারীলালের জীবনে মৈত্রী এবং প্রেম সমার্থক। এর সপক্ষে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত পত্রকবিতার[১৫] অংশবিশেষ উদ্ধৃত করি—

এ কি নতুন আলো অন্তরে উজলে
অরুণ কিরণ যেন প্রফুল্ল কমলে।
বহুদিন যে রস করিনি আস্বাদন,
আজি সে মধুর রসে রসিয়াছে মন।
মৈত্রী কিম্বা প্রেম ইহা ঠিক নাহি পাই,
যারে বলে ভালোবাসা বুঝি হবে তাই।

এ পত্রকবিতাটি রচিত হয় ১২৭১ সালে আর 'সারদামঙ্গল' কাব্যের সূত্রপাত ১২৭৭ সালে অর্থাৎ এ পত্ররচনার ছ'বছর পরে। 'বন্ধু বিয়োগ' কাব্যের মধ্যে প্রথমা পত্নীর উদ্দেশ্যে রচিত স্মৃতিতর্পণ স্থান পেয়েছে। এ সব মিলিয়ে আমাদের ধারণা দৃঢ়তর হয় যে কবির কাছে মৈত্রী আর প্রেম পৃথক নয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কবির আর একখানি পত্র 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা'য় প্রকাশ করেছেন। সে পত্রের কিয়দংশ—

'ভালোবাসার সৃষ্টি করিয়া ঈশ্বর ভালই করিয়াছেন ** ভালবাসার প্রথম চরিতার্থতার স্থান এই বিশ্ব। নরনারীতে ভালবাসা প্রথম প্রস্ফুটিত হয়। তাহার স্বর্গীয় সৌরভ চিরদিন জীবনকে পরমানন্দময় করিয়ারাখে। ক্রমে ক্রমে সমস্ত বিশ্ব আপনার হইয়া যায়। এই সমায়িক আত্মভাব দেবদুর্লভ। ইহারই নাম পরমার্থ, স্বার্থ নহে।'[১৬]

রবীন্দ্রনাথের মতে বন্ধুত্ব গভীরতর হলেই ভালোবাসায় গিয়ে দাঁড়ায়। বিহারীলালও নিশ্চয়ই বিশ্বাস করতেন মৈত্রী গভীরতর হলে প্রেমের রূপ ধারণ করে। এই আলোচনার পর মৈত্রীবিরহ সম্পর্কে আর কোন অনুপপত্তি থাকার কথা নয়। এই বিরহ কম বেশী প্রতিটি নরনারীর জীবনেই অনুভূত হয়। কবির তীব্র সংবেদনশীল অন্তরের মধ্যে এর অনুভূতি যে তাঁর সমস্ত চিন্তাভাবনার উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, এ খুব স্বাভাবিক কথা। এই রকম

মানসিক পটভূমিতেই যে সারদামঙ্গল রচিত তা নয়, তবে এর প্রকাশ এই কাব্যের মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্ট। সে আলোচনা আমরা পূর্বেই বিশদভাবে করেছি।

'প্রীতি' শব্দটিকে আমরা সৌন্দর্য-প্রীতি ও প্রকৃতি-প্রীতি বলেই গ্রহণ করেছি। 'প্রেম প্রবাহিণী' কাব্যের তৃতীয় সর্গে কবি বিশ্ব-প্রকৃতিতে প্রাণের আরোপ করে তাকে 'প্রীতিদেবী' বলে সম্বোধন করেছেন, আর তাকেই প্রশ্ন করেছেন—

এ কি এ কি প্রীতিদেবী কেন গো এমন
বিজন কাননে বসি করিছ রোদন ?

বিহারীলালের 'প্রীতিবিরহ' যে সৌন্দর্যসত্তার উপলব্ধিগত বাধা, সে বিষয়ে আমাদের ধারণাকে দৃঢ়তর করে 'শরৎকাল' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'প্রভাত সঙ্গীতে'র সর্বশেষ ছত্র। সেখানে কবি বলেছেন 'বিশ্বের সৌন্দর্যরাশি কি এক পিরীতিময়।' অতএব নিঃসংশয়ে বলা যায় যে কবিব্যবহৃত 'প্রীতি' শব্দটি সৌন্দর্যচেতনার সমার্থক।

মানুষ আর প্রকৃতি এ দুয়ের মধ্যে এক অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ বিহারীলাল সব সময় অনুভব করেছেন। মানবপ্রেম থেকেই বিহারীলালের এই প্রকৃতিপ্রীতির উদ্ভব; তাই প্রেমের ক্ষেত্রে বিরহের ছায়াপাত ঘটলে প্রকৃতি-প্রিয়তাও ম্লান হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে কবি বিহারীলাল প্রকৃতিতে যে বিশ্ববিমোহন রূপ দর্শন করেন সে তো প্রেমাস্পদের রূপারোপেই সৃজিত। 'সারদামঙ্গল' কাব্যের 'উপহার' শীর্ষক প্রথম গীতটির মধ্যেও কবি এ কথা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন,—

নয়ন-অমৃতরাশি প্রেয়সী আমার!
জীবন-জুড়ান ধন, হৃদি-ফুল-হার!
মধুর মূরতি তব
ভরিয়ে রয়েছে ভব
সমুখে সে মুখশশী জাগে অনিবার!

বিহারীলালের কবিস্বরূপের মধ্যে প্রেম ও প্রকৃতিপ্রীতি অদ্বয়

ভাবনারূপেই ধরা দিয়েছিল। 'সঙ্গীত শতকে'র মধ্যে সংকলিত একটি সঙ্গীতে (৮৮) কবি 'বন্ধুত মিত্রতা প্রেম'-এ তিনটি শব্দকে পর্যায়ক্রমে একই সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। এ উল্লেখ আকস্মিক বা অসতর্কতার পরিচায়ক নয়। 'বন্ধুতা'র উৎকর্ষই 'প্রেম', কবির এই উপলব্ধি তাঁর জীবনচর্যার অঙ্গীভূত ছিল। তাঁর রচিত পত্রগুলির যে কটি আমাদের নজরে এসেছে, সেগুলিতে এই মনোভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। উদ্ধৃতির মধ্যে 'মিত্রতা' শব্দটিও রয়েছে। যাইহোক, কবি যাকে 'মৈত্রী' এবং 'প্রীতি' বলে চিহ্নিত করেছেন তা যে যথাক্রমে প্রেম ও প্রকৃতিপ্রীতি, আমাদের এ বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। যিনি প্রেমময় অন্তরের অধিকারী, প্রকৃতিরসের প্রকৃত রসিকও তিনিই। প্রেমের 'স্বর্গীয় সৌরভ' জীবনকে চিরদিন 'পরমানন্দময়' করে রাখে, কবির এ উক্তি নিগূঢ় অর্থবহ। এবার এই প্রেম ও প্রকৃতিপ্রীতির সঙ্গে শাশ্বতী সারস্বতচেতনাকে মিলিয়ে তারই বিরহানুভূতির ক্ষেত্রে 'সারদামঙ্গল'-কাব্যের উৎপত্তি চিন্তা করলে, কোথাও কোন প্রকার অসঙ্গতি থাকে না। এই মুহূর্তে কবির 'সঙ্গীতশতক' থেকে ক'টি ছত্র স্মরণ করা প্রয়োজন—

বুঝিলে ইহার ভাব
পাইবে আমার ভাব
প্রেম, ধর্ম, প্রকৃতির হবে উদ্দীপন।

প্রেম ও প্রকৃতিপ্রীতির উদ্দীপন যে সমান্তরাল ক্ষেত্রে ঘটে সে কথা এই মাত্র আলোচিত হ'ল। এখন ঐ প্রেমচেতনা, প্রকৃতিপ্রীতি বা সৌন্দর্যচেতনার সঙ্গে ধর্ম বা অধ্যাত্ম চেতনার মিলিত কবিস্বরূপটিকে অনুভব করতে পারলে, বিহারীলালের চিন্তাধারা সম্পর্কে আর কোন অসঙ্গতি থাকে না।

বিহারীলালের মধ্যে কোথাও বিন্দুমাত্র অস্পষ্টতা নেই এ আমাদের বক্তব্য নয়। আমরা যে বক্তব্যটি উপস্থিত করছি, তা হ'ল এই যে বিহারীলালের কাব্যে অস্পষ্টতা ও দুরূহতা মূলত তাঁর কাব্যগুলিকে

বিচ্ছিন্নভাবে গ্রহণ করা থেকেই পাঠকের মনের মধ্যে উদ্ভূত। যা আমাদের কাছে অস্পষ্ট বা দুরূহ তা যে আমাদেরই শক্তি-সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতাজনিত নয়, এ কথা বড় করে বলার জো নেই। শক্তিমত্তা ও রসসত্তার অধিকারভেদ আছে।

কবি বিহারীলালের যোগমগ্ন কবিসত্তা তাঁকে একটি মিষ্টিক অনুভূতির স্তরে উপনীত করেছে। কবি যখন বলেন—

বিচিত্র এ মত্ত দশা—
ভাব-ভরে যোগে বসা,
হৃদয়ে উদার জ্যোতি কি বিচিত্র জ্বলে!
কি বিচিত্র সুরতান
ভরপুর করে প্রাণ
কে তুমি গাহিছ গান আকাশ মণ্ডলে। (৩।১)

তখনই অনুভব করতে পারি যে কবিসত্তার সঙ্গে বিশ্বসত্তার একটি অলৌকিক সত্যবন্ধন ঘটেছে। বলাবাহুল্য এ সত্যোপলব্ধির সহায়ক কবির বোধি, তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি নয়; এই বোধিলব্ধ চিন্ময় সত্য একমাত্র সেই জীবনরসিকই লাভ করতে পারেন যিনি ঐ 'মত্তদশা'য় উপনীত হতে পারেন আর অন্বিষ্ট সত্যের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যেতে পারেন। গীতায় একেই বলা হয়েছে 'যোযচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ'। এ হ'ল মিষ্টিক বা অতিলৌকিক চেতনার সারকথা।

বিহারীলালের কবিমানসী সৌন্দর্য ও তত্ত্বের সারাৎসারে পরিণত হয়ে বিশ্বচৈতন্যের স্তরে উন্নীত হয়েছেন সারদামঙ্গল কাব্যের মধ্যে। এতদিন যা কিছু দ্বন্দ্ব আর অসঙ্গতি কবির চিন্তাকে কখনো কখনো সংশয়ক্লিষ্ট করেছিল, সব কিছুর নিরসন হ'ল সারদামঙ্গল কাব্যের যুগে। কাব্যের পরিসমাপ্তিতে 'শান্তি' অধ্যায় সংযুক্ত হ'ল। মুক্ত বিদেহী কবিস্বরূপ বিশ্বরহস্যের শুক্তিভেদ করে মুক্তার সন্ধান পেল।

এ কাব্যের নামকরণের মধ্যে মঙ্গলকাব্যের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত 'সারদা' এই নামটির প্রতি কবির পক্ষপাতিত্ব চোখে

পড়ে যখন দেখি দেবী সরস্বতীর নামাবলী থেকে ঐ একটি নাম তিনি সযত্নে তুলে নিলেন। ইনি মেধা, প্রজ্ঞা প্রভৃতি নবশক্তির উৎস এবং এঁর আশিসে মানুষের অন্তরে প্রেম ও সৌন্দর্যানুভূতিমূলক বৃত্তিগুলি সদাজাগ্রত থাকে, তাই এঁর মহিমাকীর্তন বা 'মঙ্গলগান' সুসঙ্গত। নামকরণের মধ্যে স্বভাবতই কাব্যটির মূলভাব ধরা পড়েছে, আর সেই সঙ্গে শ্রুতিসুভগতাও রক্ষিত হয়েছে। অতএব বলা উচিত যে কাব্যটির নামকরণ সার্থক হয়েছে। ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ও এই কথা বলেছেন। তাঁর মতে 'এই দেবী সৌন্দর্য বিধায়িত্রী! ইঁহাকে সারদাই বল বা সর্বমঙ্গলাই বল, মিউজই বল আর মহেশ্বরীই বল—ইনিই এই কবি কর্তৃক অর্চিত, পূজিত, ইহারই মঙ্গলগীতি তিনি গাহিয়াছেন।'[১৭]

'সারদামঙ্গল' কাব্যের স্তবকবিন্যাসে কোন সুনির্দিষ্ট রীতি অনুসৃত হয়নি। প্রথম স্তবকটি বাদ দিলেও কুড়ি একুশ পংক্তির স্তবক অনেক গুলিই আছে। তবে ছ'পঙ্‌ক্তির স্তবকসংখ্যাই বেশী; আর এগুলি মূলত দুটি ত্রিপদীর যোগফল। কবি সারদামঙ্গলে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে (৮.৮।১৪) ত্রিপদীই ব্যবহার করেছেন। এ ছাড়া ছন্দের প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয়েছে স্তবকের শেষ দুই বা তিন পংক্তির অন্ত্যানুপ্রাস ঘটিয়ে। ছয় পঙ্‌ক্তির স্তবকগুলিতে প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও তৃতীয়, ষষ্ঠ পঙ্‌ক্তির মধ্যে অনুপ্রাস লক্ষ্য করা যায়। রীতি যাই হোক না কেন, সমগ্র কাব্যের মধ্যে ছন্দোগত যে সাবলীলতা আছে তা পাঠকমাত্রকেই অভিভূত করে। শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন বলেছেন যে কাব্যটিতে 'মার্জনার অভাব আছে কিন্তু কুণ্ঠা বা কৃত্রিমতা নাই।'[১৮]

'সারদামঙ্গল' কাব্যটিকে বিহারীলালের কাব্যমালিকার মধ্যমণি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। 'সাধের আসন' কাব্যের নবম সর্গে কবিও বলেছেন, 'সাক্ষাৎ আমার প্রাণ, সারদামঙ্গল গান'। আপাতত এর আলোচনা সমাপ্ত হলেও মনে রাখতে হবে যে এখানেই 'বাউল বিংশতি' আর 'সাধের আসন' কাব্য দুটির ক্ষেত্র রচিত হ'ল। কবি যখন বলেন—

কার আর মুখ চেয়ে—

অবিশ্রাম যাব বেয়ে

ভাসায়ে তনুর তরী অকূল সাগরে। (২।৮)

তখন বুঝতে পারি কবির চিন্তায় বাউলদর্শনের প্রভাব ছায়াপাত করেছে। তাছাড়া—

তোমারে হৃদয়ে রাখি

সদানন্দ মনে থাকি,

শ্মশান অমরাবতী দু-ই ভাল লাগে। (১।৩০)

কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে 'বাউল বিংশতি'তে এসেছে এইভাবে,

তোমারে হৃদয়ে রাখি

সদাই আনন্দে থাকি

আমার, প্রাণে পূর্ণ চন্দ্রোদয় সারা দিবারজনী। (১২)

'বাউল' শব্দটিকে কেউ কেউ বাতুল শব্দ থেকে উদ্ভূত বলে মনে করেন। যোগী এক অর্থে বাতুলই তো!

উল্লেখপঞ্জী

(১) অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ—সরস্বতী, ১ম খণ্ড, ১৩৬৫ সংস্করণ

(২) শশিভূষণ দাশগুপ্ত—বাংলা সাহিত্যের নবযুগ, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পৃঃ ২৫৪

(৩) বৈষ্ণব পদাবলী, (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)—সম্পাদক—খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ৭ম সংস্করণ, পৃঃ ॥৵

(৪) শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃত—সম্পাদক, বিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্ত সরস্বতী, ১ম সংস্করণ, পৃঃ-২৩৪৯

(৫) বিহারীলাল রচনাসম্ভার—সম্পাদক, প্রমথনাথ বিশী, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ৵

(৬) 'ভ্রান্তি' প্রসঙ্গে স্মরণীয়, যে জগদ্ধাত্রী বা দুর্গা ভ্রান্তিরূপিণীও বটে। শ্রীশ্রীচণ্ডী ৫।৭৬

(৭) সমালোচনা সাহিত্য—সম্পাদক, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রফুল্ল চন্দ্র পাল, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ২৯১

(৮) প্রমথনাথ চৌধুরী—গুণগ্রাহী রবীন্দ্রনাথ। বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৫০ পৃঃ ১৩৪৯

(৯) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—রবীন্দ্ররচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১ম সংস্করণ, ১০মখণ্ড, (আনন্দরূপ) পৃঃ ৮৮৯

(১০) বিহারীলাল রচনা সম্ভার—সম্পাদক, প্রমথনাথ বিশী, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ৵—।.

(১১) বিহারীলাল কাব্যসংগ্রহ—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ১০৫

(১২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—রবীন্দ্ররচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১ম সংস্করণ, ১৩শ খণ্ড (বিহারীলাল) পৃঃ ৯০৭

(১৩) শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা, ৩য় সংস্করণ, আধুনিক যুগ পৃঃ ১০৬

(১৪) বিহারীলাল রচনা সম্ভার—সম্পাদক, প্রমথনাথ বিশী ১ম সংস্করণ, পৃঃ-৶

(১৫) সাহিত্য সাধক চরিতমালা—সম্পাদক, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড ৫ম সংস্করণ, : বিহারীলাল : পৃঃ ৩১-৩২

(১৬) সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—সম্পাদক, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড, ৫ম সংস্করণ, : বিহারীলাল : পৃঃ ৩১-৩২

(১৭) সমালোচনা সাহিত্য—সম্পাদক : শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রফুল্ল চন্দ্র পাল, ২য় সংস্করণ পৃঃ ২৯

(১৮) সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড ৫ম সংস্করণ, পৃঃ ৪৪৫

॥ ৭ ॥

বিহারীলালের 'মায়াদেবী', 'শরৎকাল' ও 'দেবরাণী' প্রভৃতি কাব্য-গুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন। 'মায়াদেবী' ও 'দেবরাণী' প্রকাশিত হয় ১৮৮২ সালে। ঐগুলির প্রত্যেকটিতে একটি করে সঙ্গীত ও দীর্ঘ কবিতা আছে। 'শরৎকাল' আংশিকভাবে প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ সালে। এই কাব্যগ্রন্থটির মধ্যে আছে দু'টি সঙ্গীত ও চারটি কবিতা।

'মায়াদেবী' কাব্যগ্রন্থের প্রথম তিনটি স্তবক কবির জ্যেষ্ঠপুত্র অবিনাশ চক্রবর্তীর রচনা। এই বিশ্বভুবন মায়াদেবীর বিচিত্র মায়ারই প্রকাশ। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে সর্বত্র তাঁর লীলারহস্য লিপিবদ্ধ, কিন্তু যোগ্য পাঠক ছাড়া তার পাঠোদ্ধার সম্ভব নয়। শ্রদ্ধাবান পাঠক তাঁর ইন্দ্রিয় ও অনুভূতির সাহায্যে বিশ্বপ্রকৃতির পটভূমিতে মায়াদেবীর মায়া-প্রকাশক প্রতিটি শ্লোক পাঠ করেন।

পরমাত্মা থেকে মায়াবলে এই পরিদৃশ্যমান জগতের উদ্ভব। ব্রহ্ম নির্বিকার, নির্বিশেষ আর নির্বিকল্প। সেইজন্যই তিনি অচিন্ত্য এবং মানববুদ্ধির অতীত। কিন্তু তাঁর সৎ, চিৎ এবং আনন্দস্বরূপ জড় এবং চেতন জগতের মধ্যে বিচিত্ররূপে প্রকাশিত। যিনি রূপের মধ্যে রূপাতীতকে দর্শন করতে পারেন, যিনি সচেতনচিত্ত, তিনিই এ সবের রহস্য ভেদ করতে সক্ষম। কবির তাই শেষ প্রার্থনা—'কিরণে কিরণে, চেতাও চেতনে, জাগ মা, জাগ মা, জাগো।' প্রকৃতপক্ষে এই জাগৃতিই সব। অচেতচিত্তবৃত্তি ধ্বংস হলেই শুদ্ধ-জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। মানুষ তখনই পরিচ্ছন্ন দৃষ্টির অধিকারী হ'তে পারে। বৈদান্তিক এবং যোগী কবি বিহারীলালের মধ্যে এই বোধোদয়ে কোন বাধা ছিলনা।

'মায়াদেবী' কবিতাটির প্রথম আটটি স্তবকে (কবিপুত্র অবিনাশ চক্রবর্তী রচিত তিনটি স্তবক সহ) মায়াদেবীর নিজস্ব বক্তব্য উদ্ধৃত। তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে, ঝটিকাবিক্ষুব্ধ গগনাঙ্গনে তাঁরই প্রকাশ। তাঁর

প্রকাশ তারকাখচিত উদার নীলাকাশে, মৃদুমন্দ সমীরণের স্পর্শে পুলকিত ও হিল্লোলিত পুষ্পকুঞ্জে। আপাতবিরোধী ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য রূপরাশির মধ্যে তাঁরই অদ্বয় প্রকাশ।

কবির অনুভূতিলোকে মায়াদেবীর এই বিচিত্র বিলাস ধরা পড়ল · তিনি দেখলেন,—

স্থির ধীর নীল অনন্ত অপার
এই যে বিরাট ব্যোম পারাবার,
তুমি আভাময়ী মায়াতরী তার
চলিয়াছ ভাসি ভাসি। (১০)

তারপরেই কবির মনে প্রশ্ন, ঐ যে চন্দ্র-সূর্য-তারকাখচিত অনন্ত আকাশ, ঐ যে আপাতদৃষ্ট শূন্যের অতীতে মহাশূন্য,

সেই কি আমার গৃহ চিরন্তন,
এই কিরে মৃদু নাট নিকেতন! (১৩)

আমাদের সৃষ্টি আর বিলয় কি সেইখানেই? শুধু সাময়িক স্থিতি এই পার্থিব নাট্য-শালায়? এই হাসিকান্না, এই বঙ্গরসাবিষ্ট জীবন, এই মূল্যবান বসনভূষণ সবই কি মিথ্যা? একদা ম্যাকবেথও জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় বলেছিল যে এই জীবন 'নাট নিকেতন', আর এখানে প্রতিটি মানুষ হল, 'A poor player, that struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more'.

যদি তাই হয় তাহলে আর,—

কেন, মায়াদেবী। ছেড়ে দাও দাও,
পথরোধ করি ঘুরিয়া বেড়াও!
উধাও উধাও ভেদিব আকাশ,
দেখিব আপন দেশ;
ডুবিব সে মহা তমান্ধ সাগরে
দূর দূর দূর অতি দূরান্তরে

অসংখ্য জগৎ দীপ্ দীপ্ করে
দীপকের পরিবেশ। (১৪)

এই চিন্তার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ কবিসত্তার মধ্যে অলৌকিক সত্যের প্রদীপ্ত উদ্‌ভাসন প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। কবি বলেন, অত্যন্ত সংক্ষেপেই—

মাটির শরীর তিমির গলিয়া,
পরান পুতলী উঠিছে জাগিয়া,
জাগিয়া উঠিছে আলোকে আলোক,
কি এক পুলক পাব। (১৫)

যোগী কবির ধ্যানলব্ধ সত্য সম্পূর্ণ নির্জন মনের ক্রিয়া-জাত কিনা, বলা দুরূহ। তবে এ কথা বলা যায় যে, এর যেটুকু স্মৃতিসম্পৃক্ত প্রেরণা তার সঙ্গে এই উদ্‌ভাসনের, এই প্রত্যয়ান্বিত উপলব্ধির একটি সামঞ্জস্য আছে। এই প্রসঙ্গে একথা বলাই বোধ হয় সঙ্গত যে কবি-কৃতির মধ্যে প্রেরণার স্থান যত বড়ই হোক না কেন তাকে জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা পরিমার্জিত হয়ে রসোত্তীর্ণ রূপ ধারণ করতে হয়। কিন্তু তারও অতীতে আছে mystic বা অতীন্দ্রিয় সংবিৎ। এর স্তরে উপনীত হতে দেখেছি কবিকে তাঁর 'সারদামঙ্গল' কাব্যরচনার সময়। সেই অতীন্দ্রিয় সংবিৎ বা mystic চেতনার প্রকাশ এ ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়।

বিহারীলালের পক্ষে যা স্বভাবধর্মের এ ক্ষেত্রেও তার প্রমাণ আছে। ভাব থেকে দ্রুতগতিতে ভাবান্তরে উপনীত হওয়া এবং ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বহু বর্ণে রঞ্জিত চিত্রের উপস্থাপন এ ক্ষেত্রেও চোখে পড়ে। স্বল্পকাল চিন্তার পরই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পৃথিবীতে কবির প্রত্যাবর্তন ঘটেছে। প্রেম ও সৌন্দর্যের জগতে ফিরে এসেছেন তিনি। বর্ণাঢ্য বিশ্বপ্রকৃতি ও স্নেহে আবদ্ধ মানবসমাজের দিকে কবির দৃষ্টি পড়েছে, তিনি বলেছেন—

সুখস্বপ্নময় অমৃত সাগর
ঈষৎ-ঈষৎ কাঁপে থরথর,

অপূর্ব সৌরভে আকুল পরান,
ফুলের পুলিন দেশ ;
বেড়ায় সকল যুবক যুবতী
কিবে অপরূপ রূপের স্ফুরতি,
সুধাংশু কলিত ললিত শরীর,
নিবিড় চাঁচর কেশ। (১৮)

এর পরেই শৈশবে প্রত্যাবর্তনের প্রার্থনা, 'কর দেব। পুন শিশু কর মোরে।' এর একটু আগেই মাতৃকোলে শিশুর স্বর্গীয় আনন্দের কথা ভেবেছিলেন কবি, বলেছিলেন যে শুধু শিশুই জানে—

যে দূর-সঙ্গীত শোনে মনে মনে
ফুটে তা বলিতে পারেনা বচনে,
হাসিয়া কাঁদিয়া কতই ব্যাকুল
চাহিয়া স্বর্গ পানে। (২৪)

যাই হোক, কবির প্রার্থনাটি সুন্দর—

কর, দেব। পুন শিশু কর মোরে,
আদরে মায়ের গলা ধোরে ধোরে,
দেখিব তাঁহার স্নেহের বয়ানে
তোমার মঙ্গল মুখ!
মার সোহাগের কথা সুললিত,
শুনিব তোমার সুমঙ্গল গীত ;
নাচিব হাসিব কাঁদিব হরষে
উদার স্বর্গ-সুখ। (২৫)

এর টীকাভাষ্য নিষ্প্রয়োজন। শুধু একটি তথ্যই এক্ষেত্রে স্মরণীয় এবং তা হ'ল এই যে কবি বিহারীলাল চারবছর বয়সের সময় মাতৃহারা হ'ন। মাতৃস্নেহের আস্বাদবঞ্চিত কবি তাঁর কাব্যজীবনে বহুবারই মাতৃস্নেহবুভুক্ষা প্রকাশ করছেন, মাতৃস্মৃতির প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়েছেন। অবচেতন মনে সঞ্চিত বেদনাটি

শৈশব পুনঃপ্রাপ্তির কামনায় প্রকাশিত হয়েছে উদ্ধৃত ছত্র-গুলিতে।

'মায়াদেবী' কাব্যেও কবির নিসর্গপ্রীতি এবং মানবপ্রীতি প্রকাশিত। সৌন্দর্যময় এই পৃথিবী যেন ঈশ্বরের আশীর্বাদ, কবিজীবনে স্রষ্টার উপহার। কবি বলেছেন—

কীট-পতঙ্গ-পশু-পক্ষী-প্রাণী,
ফল ফুল ভরা মনোহর ধরাখানি,
কোন দেব এনে দিয়েছে না জানি,
আমারি সুখের তরে। (২৮)

কবি আপন সুখের প্রতিফলনও লক্ষ্য করেন বিশ্বপ্রকৃতিতে এবং বলেন—

উন্মুখ আমারে হাসিতে দেখিয়া
কোটি কোটি তারা ফুটিছে হাসিয়া
ফুটিয়া হাসিছে অনন্ত কুসুম
ধরার উদার বুকে। (২৯)

'মায়াদেবী' কাব্যের শেষ স্তবকে সরস্বতীর উল্লেখ আছে—

জাগ সরস্বতী অমৃত-বিজলী,
জাগ মা আমার হৃদয় উজলি,
কিরণে কিরণে চেতাও চেতনে
জাগ মা জাগ মা জাগো!

এই সরস্বতী বীণাপাণি, জ্ঞানদাত্রী। ইনি সারদামঙ্গলের সারদা নন।

'শরৎকাল' কাব্যটিতে 'প্রভাত সঙ্গীত', 'সন্ধ্যা সঙ্গীত', 'শরৎকাল গীতি', 'নিশীথ সঙ্গীত' ও 'নিশান্ত সঙ্গীত' এই চারটি কবিতা এবং 'মধ্যাহ্ন সঙ্গীত' এবং 'শরৎকাল' শীর্ষক দু'টি সঙ্গীত।

প্রথম কবিতা 'প্রভাত সঙ্গীত'-এর অন্যতম নাম 'দুধের মেয়ে'। কবিতাটি নিজের কন্যা বরদারাণীকে উদ্দেশ্য করেই রচিত। কবি-স্বরূপের মধ্যে বিশেষ কীভাবে নির্বিশেষে রূপান্তরিত হয়, এ কবিতাটি তার একটি সার্থক নিদর্শন।

আপন শিশুকন্যার উপর নিবদ্ধদৃষ্টি কবির মনে মুহূর্তের মধ্যেই শৈশবসুষমা ও সারল্যের অপরিমেয়তা সম্পর্কে চিন্তা জেগেছে। শৈশব সৌন্দর্য সম্পর্কে চিন্তাগত গভীরতা মালার আকারে অজস্র বাক্-প্রতিমা নির্মাণ করেছে। কবি সারল্য আর সুষমার প্রতিমূর্তি শিশু-কন্যাকে 'স্বর্গের কুসুম' 'ত্রিদিবের মন্দাকিনী', 'সারদার বীণা', 'ঈশ্বরের কৃপা' আর 'জগতের জননী' রূপে অভিষিক্ত করেছেন। এ ক্ষেত্রে রূপ-কল্প নির্মিতিতে কবি শুধু আমাদের ঐতিহ্যভিত্তিক চিন্তারই সদ্ব্যবহার করেননি, করেছেন শ্রুতি আর দৃষ্টিকেও। এর ফলে আমাদের চেতনা সজাগ আর সরাগ হয়ে উঠেছে, কবিতার রসোপলব্ধিও সুখসাধ্য হয়েছে। এখানে আবার সারল্যচেতনাটিও প্রবল। যেখানেই প্রেম ও সৌন্দর্যচিন্তার সঙ্গে অধ্যাত্মচিন্তা একত্রিত হয়েছে সেখানেই ধ্যান-মগ্নতা এসেছে, আর সেই সঙ্গে এসেছে সারদার চেতনার স্পর্শ। এ সবের সঙ্গে মাতৃহারা কবির বেদনামথিত হৃদয় থেকে উৎসারিত প্রশ্ন 'হারায়েছি তোর কোল বহুদিন জননী, তাই কি দেখিতে মাগো আসিয়াছ অবনী?' এই বক্তব্য কবিতাটিকে আনন্দবেদনার দীর্ঘশ্বাসে পরিণত করেছে।

কবিতাটির মধ্যে নারীহৃদয়ের স্নেহ ও প্রেমপ্রবণতার উল্লেখ করেছেন কবি। বলেছেন, 'প্রেমেতে প্রধানা নারী', কিন্তু এর জন্য পুরুষ হিসেবে কবির কোন ক্ষোভ নেই। কারণ, পুরুষের 'স্বভাবে অভাব আছে।' তবু যতটুকু স্নেহ-ভালবাসা কবির হৃদয়ে সঞ্চিত ছিল তা নিঃশেষেই উজাড় করে দিয়েছেন শিশুকন্যার উদ্দেশ্যে আর এই মায়াময় পৃথিবীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছেন,—

অতি অপরূপ মায়া অপরূপ সমুদয়
বিশ্বের সৌন্দর্যরাশি কি এক পিরিতিময়!

'মধ্যাহ্ন সঙ্গীতে'র মধ্যে একটি মধ্যাহ্নের বর্ণনা স্থান পেয়েছে। প্রকৃতির উদাস উদার মূর্তি দর্শন করেছেন কবি এবং তার বহিরঙ্গে যে শান্ত সমাহিত ভাব সেটি কবির অন্তরে সঞ্চারিত হয়েছে। কিন্তু

কবিতাটির শেষাংশে 'বিরামদায়িনী—নিশীথিনী'র আগমন আগ্রহের সঙ্গেই প্রার্থনা করেছেন। হয়ত তাই স্বাভাবিক ভাবেই পরবর্তী কবিতাটি 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'। এই সঙ্গীতটি রচনা করার সময় কবির দৃষ্টি ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী যতখানি স্থান জুড়ে আছে কবিতার শিরোভাগে তার উল্লেখ করেছেন।

এই কবিতায় প্রকৃতিবর্ণনার সঙ্গে জাগতিক নিয়ম সম্পর্কে কবির অনুভূতিটি মিশে গিয়েছে। একদিকে—

নগরীর মনোরথ
পূর্ণ করি রাজপথ,
হাসিয়া উঠিল কিবা প্রসারিয়া কায়া!
সুন্দরী আলোক-মালা
সারি দিয়ে করে খেলা,
বাতাসে তরুর তলে খেলা করে ছায়া। (১০)

আবার অন্যদিকে—

প্রতিদিন কোলাহল,
প্রতিদিন চিতানল,
প্রতিদিন জগতের উদয় বিলয়। (১৩)
অনন্ত কালের সিন্ধু,
বিশ্ব বুদ্‌বুদের বিন্দু,
ওই ভাসে, এই হাসে, মিলায় আবার। (১৪)

একাধিকবার আলোচিত হয়েছে যে একটি বিশেষ মানসবৈশিষ্ট্যের বিচারে বিহারীলাল ধ্যানী কবি। এই ধ্যানমগ্নতা কবি হিসাবে তাঁর সার্থকতা ও অসার্থকতা দুয়েরই কারণ। এখানে অসার্থকতা হিসাবে কবির কিয়ৎ পরিমাণে চিন্তাগত পারম্পর্যহীনতা এবং কাব্যদেহ মার্জনায় বিরাগ লক্ষণীয়। অবশ্য এক বিচারে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে গিয়ে আবার প্রতিপাদ্য বিষয়ে প্রত্যাবর্তন শক্তিমত্তারই পরিচায়ক। তবু ভাবসঙ্গতি রক্ষিত না হওয়ার কারণ যদি এই ধ্যানমগ্নতা হয়, তবে

তা দূষণীয়। কবির ধ্যানমগ্নতা যে ক্ষেত্রে রচনাশৈলী সম্পর্কে উদাসীনতায় পর্যবসিত হয়,—সেও ত্রুটির পর্যায়ে পড়ে। আলোচিত কবিতাটিতে দৃষ্টিগ্রাহ্য বস্তুবর্ণনার মধ্যে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে চিন্তা কবির মনটিকে অধিকার .করেছে, আবার পরক্ষণেই দ্রুতগতিতে বর্ণনীয় বিষয়ে প্রত্যাবৃত্ত হয়েছেন কবি। এখানে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে যে কবি-ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে তার কিছু কিছু স্পর্শ পূর্ববর্তী কাব্যগুলিতেও পাওয়া গিয়েছে। 'নিসর্গসন্দর্শন', 'সারদামঙ্গল' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে সেই সব প্রমাণ ইতস্তত ছড়িয়ে আছে।

'শরৎকাল'-কাব্যের অন্তর্গত 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' কবিতাটির মধ্যে কবি বাইরের বহু দৃশ্য যেমন বর্ণনা করেছেন ঠিক তেমন নিজের বিচিত্র ভাবগুলিকেও বাঙ্‌ময় করে তুলেছেন। বাস্তবজগতের সঙ্গে ভাব-জগতের এই সংমিশ্রণ বেশ আকর্ষণীয় হয়েছে। কবি দেখেছেন আর শুনেছেন—

তীরভূমে তরুগণে,
বসিয়াছে যোগাসনে। (২)
* * *
নাবিকেরা খুলে প্রাণ,
দূরেতে ধরেছে গান। (৩)
* * *
টুপ্‌ টুপ্‌ শব্দ জলে,
আসিতেছে পলে পলে। (৪)
* * *
নিথর সলিল 'পরি
ধীরে ধীরে চলে তরী। (৫)
* * *
নৌকায় প্রদীপ জ্বলে,
তারকা ফুটেছে জলে। (৬)

*　　*　　*

দুপার জুড়িয়া সেতু,

যেন পড়ে ধূমকেতু। (৭)

*　　*　　*

উঠিল কাঁসররোল,

শঙ্খ ঘণ্টা উতরোল। (৮)

আবার ঐসব বাণীচিত্রের পাশে পাশেই আছে,—

কি যেন স্বপন দেখি মুদিয়া নয়ন

*　　*　　*　　*

কি সুধা করিছে পান ঘুমন্ত শ্রবণ। (৩)

হারানো প্রণয় কেন এত লাগে ভাল। (৬)

অনন্ত কালের সিন্ধু

বিশ্ব বুদ্বুদের বিন্দু

এই ভাসে, এই হাসে, মিলায় আবার ;

এসেছি বা কোথা হতে

ফিরে যাব কি জগতে,

কিছুই জানিনা ঠিক ঠিকানা তাহার। (১৪)

নিকটবর্তী কোন মন্দির থেকে সান্ধ্য-আরতি-কালীন শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনি—

উঠিল কাঁসর-রোল,

শঙ্খ ঘণ্টা উতরোল,

আরতি-প্রদীপ-মালা দোলে ঘাটে ঘাটে ;

আর্দ্র হয়ে ভক্তি ভরে

'মা-মা' শব্দ করে,

আনন্দের কোলাহলে দিক্ যেন ফাটে। (৮)

ঠিক তার পরের স্তবকেই—

আমার আনন্দ নাই,
আমার সে ভক্তি নাই।
সেই ভোলা খোলা প্রাণ হারায়ে আঁধারে;
করিয়া জ্ঞানীর ভাণ
পুষি বুকে অভিমান,
ঘোর পৌত্তলিক—সদা পূজি আপনারে।

অভিমান আছে, কিন্তু জ্ঞান বা ভক্তির লেশমাত্রও নেই সাধারণ মানুষের মধ্যে। মানুষ শাম্বোদর আর আত্মসেবায় মগ্ন। কবি যথেষ্ট পরিমাণেই ভক্তিমান, কিন্তু বিনম্র বেদনায় নিজেকে ভক্তিহীন মিথ্যা ব্রহ্মজ্ঞানী বলে চিহ্নিত করেছেন। অন্তর্নিহিত ব্যঙ্গটুকু লক্ষণীয়।

কবির ধর্মমত, পাশ্চাত্য দর্শন-বিজ্ঞান-ইতিহাস-চেতনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এগুলির সঙ্গে পরিচয়সাধনের সেতু ছিলেন আচার্য কৃষ্ণকমল। তিনি বিহারীলালের জীবনকাহিনী বলতে গিয়ে তাঁকে 'নাস্তিক' বলেছেন। তিনি বলেছেন যে 'বিহারীলাল এবং সমকালীন আরও কিছু কৃতী বঙ্গসন্তান 'Reason-এর পূজা করিতেন।' এর ফলস্বরূপ এঁদের 'ধর্মবিশ্বাস' টলিল, চিরকাল পোষিত হিন্দুর ভগবান সেই বন্যায় ভাসিয়া গেলেন।'[১]

পূর্বোল্লেখিত ছত্রগুলি পাঠ করে কবির অন্তর থেকে হিন্দুর ভগবান ভেসে গিয়েছিলেন সে কথা বিশ্বাস করা দুরূহ। কবি যে যুক্তিবাদের ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন, এমনকি হিন্দুর ক্রিয়াসর্বস্ব ধর্মচেতনার বিরোধী হয়ে উঠেছিলেন, এ সব কথা স্বীকার করতে বাধা নেই। তিনি 'নাস্তিক' ছিলেন, এ কথা ঠিক নয়। এ যে ঠিক নয় সে কথা স্বয়ং বিহারীলালই বলেছেন। অনাথ বন্ধু রায়কে লেখা একটি চিঠিতে কবি নিজেরই কথা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন—

'আমি হিন্দু, যেহেতু হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। অতি সৌভাগ্যক্রমে অন্যকোন ধর্মগ্রহণ করি নাই, করিবও না। আমার বাটীতে বিগ্রহ আছেন। নিত্য তাঁহার পূজা-ভোগ হইয়া থাকে।

তাঁহাকে লইয়া আমরা সপরিবারে সুখে আছি। বিনা চেষ্টায় আপনা আপনি সকলের মনে একটি নিঃস্বার্থ ভক্তিভাব বিরাজ করিতেছে।'[২] এই উক্তি কি অবিশ্বাসী নাস্তিকের?

'নিশীথ সঙ্গীত' ('শরৎকাল') শান্ত নিসর্গসৌন্দর্যের বর্ণনা, আর পাশেই তার জীবন্ত প্রতীক ঘুমন্ত কবিপত্নী। কবিচিন্তা কখনো কখনো দুই জনকেই স্পর্শ করে প্রেম ও প্রকৃতিকে একটি রমণীয় ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করে তুলেছে। নিদ্রাহীন নিশি-যাপন-রত কবির কণ্ঠে শোনা যায়,—

আমার নয়নে ঘুম নাই,
কেবল তোদের পানে চাই,
এক একবার ফিরে
চেয়ে দেখি প্রেয়সীরে;
আদরে গোলাপ তুলে অলকে পরাই। (৭)

কবিভাবনা পূর্ণিমার অনন্ত সৌন্দর্য উপভোগের মুহূর্তে কখনো সুদূর অতীতে যাত্রা করে। আপন পুত্রকে বনবাসে পাঠানোর আদেশ ঘোষণা করার পর দশরথ অথবা অশোকবনে বন্দিনী সীতাও নিশ্চয় এইভাবে পূর্ণিমার চাঁদ দেখেছিলেন, কিন্তু কী অনুভূতি দিয়ে তাঁরা চাঁদকে বরণ করে নিয়েছিলেন? ব্যাস-বাল্মীকির শৈশবে তপোবন-কুটিরে এই জ্যোৎস্না কতখানি আনন্দ ছড়িয়ে দিয়েছিল? এঁদের কবিত্ব-বিকাশের ক্ষেত্রে জ্যোৎস্নার বিশেষ ভূমিকা সম্বন্ধে কবির কল্পনেত্রে এক নূতন উদ্ভাসন।

কবিতার জন্ম হয় তোমার কিরণে,
ফুটে ওঠে বসন্তের ফুল্ল ফুলবনে। (১২)

এই কবিপ্রতিভা কখনো আবার আপন আদর্শ কল্পলোক পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। পার্থিব জটিলতার স্পর্শে তখন তার স্ফুরণ হয় ব্যাহত। সৃষ্টির জগৎ থেকে রূঢ় বাস্তব জগতে প্রত্যাবৃত্ত হয়ে সে যেন বেদনায় আর্তনাদ করে ওঠে। ব্যথাতুর সেই সারদাচেতনার বর্ণনা—

কখনো নামিয়া ভূমে
আছন্ন শোকের ধূমে,
শ্মশানে যোগিনী বালা কাঁদে উভরায়। (১৩)

কবিতার কথায় সমকালীন সমাজ ও সাহিত্যচিন্তার মধ্যে এসে পড়লেন কবি। বললেন—

এখন ভারতে ভাই
কবিতার জন্ম নাই,
গোরে বসে অট্টহাসে ফেরে কার ছায়া?
হা ধিক! ফেরঙ্গ বেশে
এই বাল্মীকির দেশে
কে তোরা বেড়াস সব উল্কিমুখী আয়া? (১৪)

বুঝতে অসুবিধে হয়না যে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবে বঙ্গসাহিত্যের তদানীন্তন রূপপরিবর্তনের সবটা কবির মনঃপূত ছিল না। সেই সাহিত্য কর্মের মধ্যে কবি অন্তঃসারশূন্যতা আর কৃত্রিমতা দেখেছিলেন। তাঁর ভাষায়,—

নেকড়ার গোলাপ ফুলে
বেঁধে খোঁপা পরচুলে
ছিটের গাউন পোরে আহ্লাদে আকুল। (১৫)

ফুল, খোঁপা সবই যেখানে কৃত্রিম সেখানে ঐ আহ্লাদও যে আন্তরিকতাহীন তা সহজেই অনুভব করা যায়। সারস্বতসাধনার ধারায় এই কলুষতা আর কৃত্রিমতা কবির কাছে অত্যন্ত নিন্দনীয়। পাশ্চাত্য কাব্য-সাহিত্যের অনুকরণাত্মক বঙ্গসাহিত্য সৃষ্টি করতে নিষেধ করে কবি বললেন, 'দিওনা মায়ের পায়ে, প্রসাদী কুসুম।' বরং ঐ কৃত্রিম গোলাপের পরিবর্তে কবি তাঁর ধ্যানের ধন সরস্বতীর শ্রীচরণে অতি সাধারণ দোপাটি ফুলের মালাই দেবেন—'গাঁথিয়া দোপাটি মালা দিব শ্রীচরণে।'

আচার্য সুকুমার সেন এই অংশে কবি মধুসূদনের প্রতি বিহারীলালের অবজ্ঞা লক্ষ্য করেছেন।'[৩] একথা ঠিক নয় যে, একমাত্র

মধুসূদনের মধ্যেই তৎকালীন পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুকরণাত্মক দিকটি প্রকট হয়ে উঠেছিল। তবু এ কথা স্বীকার করতেই হয় যে সাহিত্যরীতির নিন্দা আর সাহিত্যিকের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ এক কথা নয়। আমরা জানি, পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব বিহারীলালের কবি-জীবনের উপরও কম ছিল না। এঁর বহু কবিতার শিরোদেশে ইংরেজি সাহিত্য থেকে উদ্ধৃতি মুদ্রিত আছে। তবু বিহারীলাল নিছক অনুকরণাত্মক বৃত্তি গ্রহণ করেননি। তা যে করেননি, তার কারণ এর পিছনে ছিল তীব্র স্বাদেশিকতাবোধ আর আত্মমগ্নতা। সেই স্বাদেশিকতা স্বদেশের ভাষা ও সাহিত্য-রীতিকেও আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করেছিল, এবং গভীর আত্মমগ্নতা কবিকে সত্যের সন্ধান করতে প্রেরণা দিয়েছিল আপন অন্তরের মধ্যেই। কবি তাই সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে সমকালীন কবিদের পাশ্চাত্য ভাব ও রীতির অনুকরণস্পৃহাকে নিন্দা করেছেন।

এরপর কবি প্রেম ও সৌন্দর্যের জগতে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করেছেন। সুধাকরের সুধা পান করে অচেতন বস্তুও যে সচেতন হয়ে ওঠে, তাতে সন্দেহ নেই কবির। কবি বলেন,

সব চেয়ে সুধাকর
তব মুখ মনোহর,
হেরিয়া অমর নর পশুপক্ষী প্রাণী।
সচেতন অচেতন
সকলে প্রফুল্ল মন,
কি অমৃত আছে ওই আননে না জানি। (১৭)

আর এই অপরূপ সৌন্দর্যের সমান্তরাল ক্ষেত্রে দাম্পত্যপ্রেমের মাধুর্য নবরূপে নবভাবে অনুভূত হয়। কবি বলেন—

প্রিয়ার পবিত্র মুখ
উদার পবিত্র সুখ
কেবল আমারি তরে বিধির সৃজন;

কেহ নাই চরাচরে
প্রাণ ভরে ভোগ করে
কারো নাই এ প্রমত্ত নেশার নয়ন। (১৮)

'কেবল আমারি তরে' বলতে গিয়ে উত্তমপুরুষবাচক যে সর্বনাম পদ কবি ব্যবহার করলেন, তাতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক চিন্তার স্পর্শ থাকলেও এই আধুনিক মনোভঙ্গীকে অহংবোধের সমার্থক বলে গ্রহণ করা উচিত নয়। এ 'আমি' বা 'আমরা' কখনো কখনো কবি বা কবি-সম্প্রদায়ের পরিবর্তেও ব্যবহৃত হয়েছে। এখানেই তার প্রমাণ আছে,—

যোগীর প্রশান্ত মন
শান্তিময় ত্রিভুবন,
সমস্ত নক্ষত্র এক বিচিত্র স্বপন ;
তোমার সুধাংশু শশী
তাঁহার প্রাণেতে পশি
করেছে কি অপরূপ রূপের সৃজন। (২৩)
আনন্দ আনন্দ তাঁর
হৃদয়ে ধরে না আর
অমূর্ত আনন্দময় মূর্তি মনোহর !
আলিঙ্গন প্রাণে প্রাণে
কি এক উদয় ধ্যানে !
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড এক আনন্দ সাগর। (২৪)

প্রাচীন আলংকারিকেরা কবিপ্রতিভাকে জন্মান্তরগত সংস্কারবিশেষ বলেছেন। সে বিচারে কবি মাত্রেই এক শ্রেণীভুক্ত। সকলের মধ্যেই জগৎ ও জীবন সম্পর্কে অসীম কৌতূহল, জগৎ জীবনকে দেখার জন্য একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর অনুসরণপ্রবৃত্তি আর গভীর রসানুভূতি প্রচ্ছন্ন থাকে। অবশ্য একথা স্বীকার করতেই হয় যে দৃষ্টিভঙ্গীর কিছু কিছু পার্থক্য থাকে কবিদের মধ্যে। আর তার ফলেই একই বস্তু ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এক একজনের মনোমুকুরে প্রতিবিম্বিত হয়। বাংলা দেশের 'মধুর

মুরতি' দেখে কেউ আনন্দ পান, কেউ বা তার 'বিধুর মুরতি' দেখে পান দুঃখ। বিহারীলাল প্রমুখ কবিরা যেখানে চাঁদের দিকে তাকিয়ে এত কথা বলেছেন, সেই চাঁদের দিকে তাকিয়ে একালের কবির মনে হয়েছে ক্ষুধার রুটি। ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী যখন গদ্যময় তখন খাদ্যের কথাই প্রথমে মনে পড়তে বাধ্য। এ পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আমাদের বক্তব্য হল এই যে, কবিদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে যতই পার্থক্য থাক না কেন, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে উত্তম পুরুষকে প্রথম পুরুষের সঙ্গে মিলিয়ে না নিলে অবিচার করা হয়। বিশেষকে নির্বিশেষের পটভূমিতে দেখলে তবেই তার প্রকৃত মূল্যটি ধরা পড়ে। আলোচ্য কবিতাটির একটি স্তবকে আছে,—

ধিক্‌রে অধম ধিক্!
ভালবাসা 'প্লেটোনিক'
ছদ্মবেশী রসিক মধুর 'মিয়্ মিয়ু'। (৩১)

এ থেকে বুঝতে অসুবিধা নেই যে প্লেটোনিক প্রেমের প্রতি কবির সমর্থন ছিল না। প্লেটোর Symposium নামক পুস্তক বিহারীলাল স্বয়ং পাঠ যদি নাও করে থাকেন, কবিবন্ধু আচার্য কৃষ্ণকমলের সঙ্গে যে এ বিষয়ে তাঁর আলোচনা হয়েছিল আর প্লেটো বর্ণিত প্রেমস্বরূপ সম্পর্কে তাঁর ধারণা সুষ্ঠুভাবেই গড়ে উঠেছিল এ কথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে। এর পরেও কবি যখন প্লেটোনিক প্রেমের নিন্দা করেন, তখন প্রেম সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ধারণাটি সম্পর্কে সতর্ক ভাবে বিচার করতে হয়।

প্রকৃতপক্ষে মানুষের জৈবিক প্রয়াস-প্রয়োজনের উর্ধ্বে যে প্রেম একটি বিশুদ্ধ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল রচনা করে তাকেই প্লেটানিক ধারণার প্রেম বলে আমরা স্বীকার করে নিয়েছি। এর প্রকাশ ঘটেছে রবীন্দ্রকাব্যে সন্দেহাতীত ভাবেই। কিন্তু বিহারী-লালের প্রেমচিন্তা বিশ্বব্যাপ্ত হয়ে উঠলেও তার মূলটি অত্যন্ত দৃঢ়-ভাবেই মর্ত্যের মাটিতে নিহিত। এই কবির কাব্যসাধনার আদ্যন্ত

ধারা অনুসরণ করলে কবির প্রেমবোধ সম্পর্কে যে প্রতীতি জন্মায় তা হ'ল এই যে, এঁর কাব্যে আদর্শায়িত প্রেমেরই উপাসনাসঙ্গীত গীত হয়েছে। ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমের সমর্থক বিহারীলাল কোনদিনই ছিলেন না। বহুক্ষেত্রে দেহভোগের কামনার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ অত্যন্ত সরব। কিন্তু বিহারীলালের প্রেমচিন্তা পার্থিব আধারের মধ্যেই লালিত পালিত এবং বর্ধিত হয়েছে। দাম্পত্য প্রেমের নির্দিষ্ট গণ্ডীতে সৃজিত হয়ে এ প্রেম নির্বিশেষের ব্যঞ্জনা লাভ করেছে এবং ফিরে এসেছে সেই গণ্ডীরই মধ্যে। বিহারীলালের কাব্যে প্লেটোনিক প্রেমের ক্ষেত্রপ্রস্তুতি আর রবীন্দ্রনাথে তার বিকাশ। উনিশ শতকের গীতিকবিতার ধারা অনুসরণে প্রেমচিন্তার বিবর্তন লক্ষ্য করলে এ সত্যটি সহজেই অনুভূত হবে।

পূর্বোক্ত আলোচনার সাক্ষ্য হিসেবে 'নিশান্ত সঙ্গীত' স্মরণীয়। এ কবিতায় যে চিন্তা বাঙ্‌ময় হয়ে উঠেছে তার সূত্রপাত,—

আলু থালু হয়ে প্রিয়া
আছে সুখে ঘুমাইয়া। (১)

*　　*　　*

আহা এই মুখখানি—
প্রেম-মাখা মুখখানি—
ত্রিলোক-সৌন্দর্য আনি কে দিল আমায়!

কোথায় রাখিব বল,
ত্রিভুবনে নাই স্থল,
নয়ন মুদিতে নাহি চায়। (৩)

আর সমাপ্তি—

তোমার পবিত্র কায়া
প্রাণেতে পড়েছে ছায়া,
মনেতে জন্মেছে মায়া ভালবেসে সুখী হই।

ভালবাসি নারী নরে,
ভালবাসি চরাচরে,
সদাই আনন্দে আমি চাঁদের কিরণে রই। (৭)

যে নারীর সৌন্দর্য-আরতিতে কাব্যের সূত্রপাত, তিনি কবিপ্রিয়া। দাম্পত্যপ্রেমের আধারে যে অনুভূতি সৃজিত হল, তা কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই কবিকে নিয়ে গেল নিখিলবিশ্বের উদারতর আবেষ্টনীর মধ্যে। দাম্পত্যপ্রেম মুক্তি পেল বিশ্বপ্রেমের মধ্যে। সৌন্দর্যানুভূতি অবারিত হ'ল জল, স্থল আর অন্তরীক্ষে। সৌন্দর্যময়ী আর প্রেমময়ী কবি-গৃহিণী রূপান্তরিত হলেন প্রেম ও সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি সারদায়। কবির মনোজগতে নবীন উষার অভ্যুদয় সূচিত হল। এ প্রেম প্রসঙ্গে মোহিতলালের উক্তিটি স্মরণীয়। তিনি বলেছেন, 'এই নিশান্ত সঙ্গীত শুধুই দাম্পত্যপ্রেমের পূর্ণসুখ সম্ভোগ নয়, এ প্রেম বিশ্বনিখিলের সঙ্গে কবিহৃদয়কে যুক্ত করিয়াছে ; কবির চিত্তাকাশে দিগন্তব্যাপিনী উষার সমারোহে মঙ্গল আরতি গানের সঙ্গে সঙ্গে নিশি অবসান হইতেছে। এইখানেই এই গীতি কবিতার মৌলিকতা ; এই মানব-সুলভ স্বাভাবিক প্রেমই শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যধ্যানের সহায় হইয়াছে—বিশ্ব-প্রকৃতি ও মানব হৃদয়ের এই যে মিলনতীর্থ কবি আবিষ্কার করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার কাব্যসাধনার মূলমন্ত্র।'[৪]

প্রেমের প্রাণবন্ত মর্ত্যবিন্দুতে কবি বিহারীলাল কি ভাবে সৌন্দর্য-সিন্ধু দর্শন করেছেন তার অনবদ্য প্রকাশ লক্ষ্য করা গেল, কবি যখন বললেন—

মধুর মুরতি তব
ভরিয়ে রয়েছে ভব,
সম্মুখে ও মুখ-শশী জাগে অনিবার।
কি জানি কি ঘুম ঘোরে,
কি চক্ষে দেখেছি তোরে,
এ জনমে ভুলিতে রে পারিব না আর!
নয়ন অমৃতরাশি প্রেয়সী আমার। (৯)

'দেবরাণী' শীর্ষক কবিতার বক্তব্য পূর্ববর্তী কবিতাগুলির সঙ্গে প্রায় এক। এখানেও বিশ্বসৌন্দর্যের সঙ্গে কবিহৃদয়ের মিলন এবং সেই মিলনের ফলে প্রেম ও ঐশ্বরিক সত্তার বৈচিত্র্য-উপলব্ধি প্রকাশিত।

প্রথম তিনটি স্তবকে কবি বললেন তাঁর সৌন্দর্যপিপাসার কথা। কল্পনাসৃষ্ট জগতে সৌন্দর্যের অপরূপ বৈচিত্র্য আস্বাদন করতে গিয়ে হঠাৎ একসময় পৃথিবীর সবকিছুই যেন অস্পষ্ট হয়ে আসে। নদনদী পাহাড় পর্বত সমুদ্র তাদের আকৃতিবৈশিষ্ট্য হারিয়ে একাকার হয়ে যায়। সব কিছুর পরিবর্তে তখন কবিদৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়—

আহা আহা একি সম্মুখে আমার,
একি এ বিচিত্র আলোকোদয়!
চন্দ্র সূর্য নাই অপরূপ ঠাঁই,
কোটি কোটি যেন চাঁদের কিরণে
সদাই কিরণময়। (৫)

এর পরের যে উপলব্ধি প্রকাশিত হয়েছে কবিতায়, তার স্বরূপ ঐ সৌন্দর্য ও প্রেমানুভূতি হলেও তা এসেছে মূলত কবির ভাবতন্ময়তা থেকে। সে ভাবতন্ময়তার মধ্যে ঘটেছে লৌকিক আর আলৌকিকের সমন্বয়। কবি কখনো নিবদ্ধদৃষ্টি বহির্বিশ্বের সৌন্দর্যবৈচিত্র্যে, কখনো অন্তর্জগতের ভাবগভীরতায়। বিহারীলালের কবিস্বরূপের এই চরিত্রটি তাঁর কাব্যজগতের গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করেছে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। এ হ'ল এক প্রকার উপলব্ধি যার উদ্বোধন ঘটে সম্পূর্ণ আকস্মিক ভাবেই। বিহারীলালকে দিব্যোন্মাদ কবি বলে কেউ কেউ বিশেষিত করেছেন। সে বিশেষণ কবি-স্বরূপের এই চরিত্রবিচারেই যে করা হয়েছে তা অনুমান করা দুরূহ নয়। প্রকৃতপক্ষে যাকে অতীন্দ্রিয় বলে চিহ্নিত করা হয় তার স্বরূপই এই।

প্রেম ও সৌন্দর্যের পবিত্র সঙ্গমে প্রস্ফুটিত হয়েছে একটি মনোরম শতদল। আনন্দাশ্রুবিধৌত সেই শতদলে পাদপদ্ম স্থাপন করে দেখা দিলেন কবিমানসী সারদা আর তাঁর আবির্ভাবের মুহূর্তে ঘটল

'ত্রিদিবের চির অরুণোদয়'। দেবী সারদা চিরন্তনী সৌন্দর্য আর করুণার সমবায়ে গঠিত এবং তাঁর মহিমা কবির অন্তরে পরিব্যাপ্ত। কবি বলেছেন—

ফুলে ফুলময় কমল-কানন
কে তুমি মা হেথা করিছ খেলা!
ঢল ঢল তব বিমল মু'খানি,
হেরে জুড়াইল প্রাণের জ্বালা। (১৫)
ত্রিলোক-তর্পণ করুণ নয়ন
হৃদয়ে করুণা-কুসুম-হার,
সুধাংশু-কলিত ললিত শরীর
সহেনা বসন ভূষণ ভার। (১৬)

এই স্তবকে কাব্যদেহনির্ভর লাবণ্য যেন সারদাপরিকল্পনার উপযুক্ত হয়ে উঠেছে। আনন্দবেদনা, প্রেমসৌন্দর্য সব কিছু যেন একটি অপরূপ ভাবমূর্তি ধারণ করেছে, আর সেই ভাবমূর্তি অতুলনীয় দীপ্তিতে বিশ্বচরাচরের প্রাণকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অধরে উদার মৃদুমন্দ হাসি,
ভাসি ভাসি আসে স্নেহের তান,
দুলে দুলে কোলে বীণা বিনোদিনী
আধ আধ কিবে করিছে গান! (১৮)

আর এই অবশ্যম্ভাবী প্রভাবে কবি বলেন,—

জড়িমা জড়িত তনু প্রাণ মন,
মোহন স্বপন সাগরে ভাসি,
আধ ঘুমঘোরে শুনি ধীরে ধীরে
দূরে বাজে যেন ভোরের বাঁশি। (১৯)

শেষে সেই বহুশ্রুত প্রার্থনা আবার কবিকণ্ঠে উৎসারিত হয়,—

যেন মা ও পদ পরশি পরশি
হরষে আমার জীবন বয়।

মা তোমার রাঙা চরণ দু'খানি
ধরিলে থাকে না মরণভয়। (২৫)

বিহারীলালের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে স্মরণীয়, আন্তরিকতা-বোধক স্বতঃস্ফূর্ত এই ভাষা অকৃত্রিম একটি হৃদ্য পরিবেশ সৃজনে সহায়তা করেছে। কিন্তু বহুক্ষেত্রে শব্দদ্বিত্বের ব্যবহার যেন প্রায় রীতির মত এবং অর্থহীন মনে হয়। প্রতিটি কাব্যগ্রন্থ থেকে ছত্র উদ্ধৃত করে এর প্রমাণ দেওয়া যায়। 'দেবরাণী' কাব্যগ্রন্থেও এ রীতি অনুসৃত। একটি স্তবক—

বিমল সলিলা নদী মন্দাকিনী
দুলে দুলে যেন মনেরি রাগে
কুলু কুলু ধ্বনি আধ আধ বাণী
খেলিছে কেমন মেখলা ভাগে। (৯)

পূর্বে উদ্ধৃত অষ্টাদশ স্তবকের মধ্যে 'ভাসি ভাসি', 'দুলে দুলে', 'আধ আধ' শব্দযুগ্মগুলি লক্ষ্য করলে এই ধারণাই দৃঢ় হয় যে কবির রচনা-শৈলীতে এ প্রায় একটি রীতিতে পরিণত হয়েছে যা বহুক্ষেত্রে অর্থহীন আর ক্লান্তিকর। এই দুর্বল অংশগুলি বর্জন করলে বলা যায় যে সাধারণভাবে 'দেবরাণী' কবিতাটি ব্যঞ্জনাধর্মী ও লাবণ্যময়। বাস্তবাতীত সৌন্দর্যের ধ্যানে তন্ময় কবির স্বগত ভাষণ এখানে রসোত্তীর্ণতা লাভ করেছে।

উল্লেখ পঞ্জী :

(১) বিপিন বিহারী গুপ্ত—পুরাতন প্রসঙ্গ, বিশ্বভারতী সংস্করণ, পৃঃ ১৩২
(২) সাহিত্য সাধক চরিতমালা—সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড, ৫ম সংস্করণ, (বিহারীলাল) পৃঃ ৩২
(৩) সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ৫ম সংস্করণ, পৃঃ ৪৪৫
(৪) মোহিতলাল মজুমদার—আধুনিক বাংলা সাহিত্য, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৩৭-৩৮

॥ ৮ ॥

'ধূমকেতু' কবিতাটি কবির তিরোধানের পর ১৮৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'প্রভাস' প্রত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কবিতাটি রচিত হয়েছিল বহুপূর্বে ১৮৮২ সালে। যেদিন কবিতাটি রচিত হয়েছিল তার সাল তারিখ কবিতাটির নীচেই উল্লিখিত হয়েছে।

'ধূমকেতু'কে কেন্দ্র করে যে অন্ধসংস্কার কিছু মানুষ পোষণ করেন তার উল্লেখ করেই কবিতাটি শুরু হয়েছে। কবির বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট —যা সুদর্শন তা অমঙ্গলকর হতে পারে না। মুখমণ্ডলে অদৃশ্য মনেরই প্রতিচ্ছায়া দৃষ্ট হয়। কবি প্রশ্ন করেন আর নিজেই তার উত্তর দিয়ে বলেন,—

ওই যে উঠেছে ধূমকেতু
কে বলেরে অমঙ্গল হেতু ?
কি মহান শুভ্র পুচ্ছ
গ্রহতারা করি তুচ্ছ
ওড়ে যেন বিজয়ের কেতু ! (১)
ওই ! শুকতারার মতন
মুখপ্রভা প্রশান্ত কেমন !
যদিও আবৃত কায়া
কেমন উদার ছায়া !
মুখেই প্রকাশ পায় মানুষ কেমন ! (২)

উদয় আর অস্তের সঙ্গমে উদিত হয়েছে ধূমকেতু। 'একদিকে চন্দ্র অস্ত যায় অন্যদিকে অরুণ উদয়'—এরই পটভূমিতে প্রকাশিত অপূর্ব সুন্দর একটি ধূমকেতু। এই নৈসর্গিক পটভূমিতে ধূমকেতুটির দীপ্তি ও গৌরব যেন শতগুণে বর্ধিত হয়েছে। এর উপস্থিতি অত্যন্ত সাময়িক,

কিন্তু 'মহতের মন নাহি মরে'—এই সাময়িকতা তার মূল্য হ্রাস করেনা। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ধূমকেতুর বিলয় ঘটবে। কিন্তু সে চিন্তায় সে ম্লান নয়, বরং—

পূর্বদিক পানে চেয়ে
যেন মহানিধি পেয়ে
আনন্দে আপনি চলে যায়। (৫)

মানবসমাজে ধূমকেতুধর্মী মানুষেরও দর্শন মেলে। তারা তাদের প্রাণপ্রাচুর্যে কক্ষচ্যুত হয়ে ছুটে যায় আর মহাকালের বুকে বিলীন হয়ে যায়। যারা প্রেমিক, প্রেমময় অন্তরের প্রবল উচ্ছ্বাসে তারাও ধূমকেতুর মতই প্রেমাস্পদের সন্ধানে ছুটে যায়। কবি স্বয়ং তাদের দলে। তিনি বলেন—

বল কত তোমার মতন
ধায় ধূমকেতু অগণন,
পথের ঠিকানা নাই,
তারি কাছে ছুটে যাই—
পাই যারে মনের মতন! (৮)

বহুকাল পরে ধূমকেতুর আবির্ভাব। এই অতিথির সম্বর্ধনায় প্রকৃতিরাণী তৎপর,—

আসিয়াছ বহুদিন পরে,
ধরণীরে দেখিবার তরে,
আনন্দে ভগিনী তব
করেন মঙ্গলোৎসব,
দিকে দিকে পাখী গান করে। (১১)

এখানেই শেষ নয়। কবি যেন এই সম্বর্ধনার আয়োজন আরও ব্যাপকতার মধ্যেই অনুভব করেন,—সমীরণ কুসুমের সৌরভ নিয়ে চলেছে আর সেই সঙ্গে চলেছে উড়ে গীতিমুখর চাতকেরা। আকাশে বলাকা ধূমকেতুর পরিচর্যার জন্য ব্যস্ত; মেঘমালা অরুণোদয়কে

বিলম্বিত করে ধূমকেতুর স্থায়িত্বকে দীর্ঘায়িত করার জন্য যত্নবান। এর পরেও কবি দেখছেন,—

ঘেরে আছে দিগঙ্গনাগণ,
কিবে সব প্রফুল্ল আনন,
কেমন হরষভরে
তোমারে বরণ করে!
মাঝে তুমি কেতু বিমোহন! (১৪)

কিন্তু দুর্ভাগ্য মানুষের! এই অপূর্ব নৈসর্গিক সৌন্দর্য উপভোগ করার মত হৃদয়ের ঔদার্য তাদের নেই। তারা একন্তই 'হৃদিহীন মিছে বুদ্ধিমান'। এরা ধূমকেতুকে 'অমঙ্গলজ্ঞান' করে। এরা 'পরস্পরে সভ্যভব্য বলে' কিন্তু 'আজো আছে পশুদের দলে'। কাজকর্ম বিচার করলে কখনোই সভ্য বা সংস্কৃত মানুষ বলে এদের স্বীকার করে নেওয়া সম্ভব নয়। নরহত্যাকে এরা বীরত্ব বলে। বিশ্বজয়ীকে এরা সম্মান করে। পরবর্তী যুগের মানুষ আজকের মানুষের এই নরহত্যামূলক দেশজয়কে কখনই শ্রদ্ধা করবেনা, বরং—

যুগান্তরে লোক সবে
শুনিয়া অবাক হবে
মানুষে করিত বধ মানুষের প্রাণ (২২)

মানবসমাজের দিকে তাকিয়ে কবি দেখেন শতকরা দু'একটি মানুষ দেবপ্রতিমা, তাঁরা পরোপকারী আর পুণ্যবান। তাঁদের আনন্দময় ব্যক্তিত্বের প্রভাবে সংসার আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। 'হদ্দ আটজন আর কনিষ্ঠ সে দেবতার'—এরা শান্তি প্রিয়, অপরের মঙ্গল সাধনে ব্রতী না হলেও 'ভুলেও কখন কারো মন্দ নাহি করে।' বাকী যারা তাদের সম্বন্ধে কবির স্পষ্টোক্তি—

বাকী যে নব্বুইজন,
তমোগুণে অচেতন,
পূর্বজন্মে ছিল বন-মানুষ বানর,

স্বভাব রয়েছে তাই,
কেবল লাঙ্গুল নাই,
আহার-বিহার-পটু আসল বর্বর। (২৫)

এইসব মানুষদের দিকে দৃষ্টিপাত করাও উচিত নয়। ধূমকেতুর কাছে কবির তাই অনুরোধ—

কি আর দেখিবে তুমি
মানবের জন্মভূমি!
দেখেছ কতই পৃথ্বী কত পুণ্যলোক, (২৬)

* * *

যাও ভাই মন-সুখে
বিচর ব্যোমের বুকে
দেখগে, দেখেনি যাহা মানব নয়ন। (২৭)

ধূমকেতুকে উপলক্ষ করে মানবমন আর মানবসমাজের বর্ণনাটি বড় সুন্দর। সমকালীন সমাজের অধঃপতন যে কবিমনকে বেদনাদগ্ধ করেছিল তার অনাবরণ প্রকাশটি লক্ষণীয়, আর সেই সঙ্গে সৌন্দর্য-প্রেমিক কবির প্রকৃতি-বর্ণনাটিও!

এ কবিতাটির ছন্দোবিধি 'সারদামঙ্গল' আর 'সাধের আসনে'র অনুরূপ। এখানেও স্তবকগুলির মধ্যে ছত্রসংখ্যার সমধর্মিতা নেই। তবে মাত্র দু'শ্রেণীর স্তবকবিন্যাস এখানে চোখে পড়ে—হয় পাঁচ, নয়ত ছয় পঙ্‌ক্তির স্তবক।

(৯)

'বাউল বিংশতি' ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে 'কল্পনা' পত্রিকায় আংশিকভাবে প্রকাশিত হয়। গীতিকবিতার আত্মতন্ময়তা এগুলিতে স্পষ্ট। কবি কুড়িজন বাউলের মুখ দিয়ে কুড়িটি গান শুনিয়েছেন আর সেগুলিতে 'পরপর সূক্ষ্মতর' কোন তত্ত্ব পরিবেশিত হয়েছে। 'খোলা প্রাণে' শুনলে তবেই সে তত্ত্ব বোধগম্য হবে—তাই কবি প্রথমেই সে অনুরোধ জানিয়ে রেখেছেন।

প্রথম গানের বক্তব্য, এই বিশ্ব-সংসারে আনন্দ ছড়িয়ে আছে। প্রকৃতি মানবসমাজ সর্বত্রই আনন্দের বিচিত্র প্রকাশ। আমরা অন্তরের মধ্যে দ্বেষ হিংসা পোষণ করি বলেই সেই আনন্দের ভোগে বঞ্চিত হই। এর জন্য সমস্তটুকু অপরাধ আমাদের নিজেদেরই। দ্বিতীয় গানে পৃথিবীর রূপবৈচিত্র্য বর্ণিত। সেই বৈচিত্র্যে আপাতবিরোধিতা আছে, কিন্তু কবি বলেছেন যে সেই বিরোধী ভাবের অন্তঃস্থিত সত্যটি উপলব্ধি করতে পারলে পৃথিবীর এই 'চমৎকার খেলা'র অর্থবোধ হবে। এই উপলব্ধি শুধু জ্ঞানের সাহায্যে সম্ভব নয়। একে পেতে হয় 'হৃদা মনীষা মনসা'। 'মিটমিটে গ্রন্থকীট' এই পৃথিবীর মহিমা বোঝেনা —যিনি বিশ্বশাস্ত্রের পাঠক সেই উদারহৃদয় ব্যক্তির পক্ষেই এর ভাবাবিষ্কার সম্ভব।

তৃতীয় গানটিতে স্নেহভালবাসার কথা। কবি বলেন অবারিত হৃদয়ের স্নেহ ভালবাসা নিয়ে বিশ্বের মুখোমুখি হও, জীবনের সার্থকতা সেখানে। পশুপক্ষী, মানুষ, বৃক্ষলতা—সকলের সঙ্গেই ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। দুর্ভাগ্যের কথা, আমরা ভালবাসার মর্যাদা বুঝিনে। আমরা সবার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছি সারাজীবন। কবির প্রার্থনা, ঈশ্বরের আশীর্বাদে আমাদের জীবন স্নেহে প্রেমে

পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক। আর 'প্রেমের মানুষ' চেনার প্রশ্ন যদি ওঠে তাহলে কবির বক্তব্য—

প্রেমের মানুষ চেনা যায়।
তার হাসি হাসি মুখশশী, খুশী ফোটে চেহারায়।
সদাশিব সদানন্দ, সরল অন্তর,
কেহ নাহি আপন পর
সে জানেনা দুনিয়াদারি, ভালবাসে দুনিয়ায়।

এ হ'ল চতুর্থ গানের প্রতিপাদ্য বিষয়। পঞ্চম ও ষষ্ঠ গানেও প্রেমের কথা; কিন্তু সেখানে নারীপ্রেমের উল্লেখ করেছেন কবি বিশেষ ভাবে। 'বিশ্বজয়ী শক্তিময়ী নারী এ ধরায়', তারই সাহায্যে মানুষ প্রেমরূপ 'নিধি পায়'। কিন্তু কবি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—

বিষামৃতলতা রমণী,
ফলে ফুলে আলো করে আছে ধরণী,
তার, আননে অমিয় মাখা, নয়নেতে—
রমণীর নয়নেতে হলাহল। (৫)

অতএব অগ্রসর হতে হবে সাবধানতার সঙ্গে। যদি রূপবহ্নিতে কেউ জীবন বিসর্জন দিতে চায়, তাকে দগ্ধ হতেই হবে। সৌন্দর্যে অমৃতত্বের দিকটি হৃদয়ে ধারণ করে অগ্রসর হলে আর ভয় নেই।

কিন্তু এদিকে জীবনপ্রবাহ কালসিন্ধুর দিকে দুর্দমনীয় বেগে ছুটে চলেছে। বেলা বয়ে যায়, আর দিনও শেষ হয়ে আসে। যাবার আগে যে 'রসের খেলা' শেষ করে নিতে হবে। কবি সে কথা স্মরণ করিয়ে দেন সপ্তম গানটিতে। কিন্তু পরের গানেই বলে ওঠেন 'প্রেমের আনন্দমাঝে মরণের ভয় নাই।' মৃত্যুর অন্তরে প্রবেশ করে অমৃত আহরণ করার শক্তি ঐ প্রেমময়তার মধ্যেই নিহিত। অতএব 'জাগহে প্রাণের প্রাণ, দাও মনের ধাঁদা খুলে' (৯)। আত্মার ভূমানন্দে অভিষিক্ত হবার পথ নির্বাধ হ'ক। প্রেমসমুদ্রের কূলে উপবিষ্ট মানুষের প্রেমাস্বাদবঞ্চিত অবস্থা সমুদ্রে পিপাসার্ত প্রাণীর

একবিন্দু পানীয় না পাওয়ার মতই করুণ। বিহারীলালের সমভাবাত্মক ছত্রটি,—

পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত বসে সুধা-সিন্ধু-কূলে। (৯)

আশা পূর্ণ হয়ে গেলে পৃথিবীতে দীর্ঘতর জীবনযাপন অর্থহীন। যে প্রেমের আস্বাদনই কাম্য, তার সাফল্য অর্জন হয়ে গেলে 'রুধিয়া অন্তের আশা থাকিবনা আর'—এই আন্তরিক ইচ্ছার প্রকাশ দশম সংগীতে। 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা, এ সমুদ্রে আর কভু হবনাকো পথহারা' বলেছেন যে কবি, তাঁর কবিগুরু বললেন—

হইবনা পথহারা

ওই জ্বলে শুকতারা। (১১)

এ শুকতারা হ'ল প্রেম। প্রেমে যদি অন্তর পূর্ণ থাকে তাহলে সমগ্র জগতই সৌন্দর্যময় হয়ে ওঠে। তাই কবির একমাত্র কামনা এই প্রেম এবং প্রেমের যিনি অধিষ্ঠাত্রী সেই দেবী সারদার সাধনা। তাঁর কৃপায় শুধু কবির অন্তর্জগতই আলোকিত নয়, সমগ্র পৃথিবী তাঁর প্রেমকিরণে উদ্ভাসিত। কবি বলেন—

কে তুমি সুষমা মেয়ে,

আছ মুখপানে চেয়ে,

আলো করে অন্তরাত্মা, আলো করে ধরণী? (১২)

'সারদামঙ্গল' কাব্যে কবিকণ্ঠে দেবী সারদার উদ্দেশ্যে যে স্তুতি উদ্গীত হয়েছিল এখানে তারই প্রতিধ্বনি শুনি—

ও রাঙা চরণতলে,

ধর্ম অর্থ মোক্ষ ফলে,

তুমি, মৃত্যুর অমৃতলতা পাপতাপহারিণী।

তোমারে হৃদয়ে রাখি

সদাই আনন্দে থাকি,

আমার, প্রাণে পূর্ণ চন্দ্রোদয় সারা দিবা-রজনী। (১২)

ইতিমধ্যে একবার বাস্তব সচেতনতা কবিকে কল্পনার জগত থেকে প্রত্যাবর্তনে অনুপ্রাণিত করে। কবি বলেন—

কল্পনা ললনা বুকে
ঘুমায়ে ছিলেম সুখে,
দিনমণি দরশনে লাজে মনে মরে যাই। (১১)

'ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মত' কবি বিহারীলালও বাস্তব বিস্মৃত হয়ে কল্পনার জগতে বাসা বেঁধেছিলেন। আজ সেজন্য ক্ষোভ প্রকাশিত হ'ল। কবি বললেন যা মহান্ সত্য এবং যা অতিপ্রত্যক্ষ, তাতেই যেন কবির দৃষ্টি এবার থেকে নিবদ্ধ থাকে। 'বাউল বিংশতি'র বাকী ক'টি গানের মধ্যে প্রেমেরই বিচিত্র অভিব্যক্তি। সব শেষের গানটিতে এসে কবি বললেন প্রেমের সার্থক প্রকাশ নরনারীকে অবলম্বন করে। একজন অন্যের কাছে সম্পূর্ণভাবে যতক্ষণ না নিজেকে সমর্পণ করে দিতে পারছে, ততক্ষণ প্রেমের সার্থকতা নেই। এই একাত্মতাই প্রেম। দ্বৈতভাবের বিলোপই প্রেম, তার সার্থক উদাহরণ এই পৃথিবীরই নরনারী। কবির ভাষায়—

দ্বন্দ্বে কি পরমানন্দ, কি মহান উদার উল্লাস!
জগতে নরনারী অবতরি, আহা! কি প্রেম করেছে প্রকাশ। (২০)

বাউল সঙ্গীতের ধারা অতি প্রাচীন, কিন্তু তার প্রচার ছিল বিচ্ছিন্ন। দেহতত্ত্বাশ্রয়ী এই লোকসঙ্গীতের ধারাটি বিদগ্ধ সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায়। উনিশ শতকের কবি মধুসূদন প্রমুখ পূর্বসূরীরা 'বাউল' ধারা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব ছিলেন। বিহারীলালের কাব্যে সর্বপ্রথম 'বাউল' এই বিশেষণে বিশেষিত হয়ে নবযুগের বাউল-সঙ্গীত রচিত হল। 'দেহ কারাগারে' আত্মার তৃপ্তি কিসে তার কিছু বিচার বিশ্লেষণও শ্রুত হ'ল এই প্রথম। কবি 'তনুর তরী' ভাসিয়ে যেদিন যাত্রার কথা বলেছিলেন, সেই 'সারদামঙ্গল' কাব্যরচনার সময় আমরা লক্ষ্য করেছিলাম দেহভিত্তিক সাধনার ইঙ্গিত। এখানে এসে বাউল দর্শনের আরো কিছু প্রভাব লক্ষ্য করা গেল। প্রেম আর সত্য এই

দুটিই বাউল দর্শনের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে উপনীত হতে সাহায্য করে মানবদেহ, সংক্ষিপ্ত পরিসরে বিহারীলাল এ সব কথাই বলেছেন গীতগুলির মধ্যে।

বিহারীলাল যখন 'বাউল বিংশতি' রচনা করেন তারও আগে (১৮৮৪) রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' পত্রিকায় বাউলগীত সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রবন্ধটি 'বাউল গীত' নামক একটি ক্ষুদ্র গীতি-সংকলনকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল।

(১০)

সাতটি কবিতা আর ন'টি গান সংকলিত হয়েছে বিহারীলালের 'কবিতা ও সঙ্গীত' কাব্যগ্রন্থে। কবিতাগুলি নিসর্গ সঙ্গীত, গোধূলি, নিশীথগগন, শ্মশানভূমি, বসন্ত পূর্ণিমা, শারদ পূর্ণিমা ও নিয়তি সঙ্গীত। সবই প্রকৃতি-ভাবনাকেন্দ্রিক কবিতা।

সূর্যোদয়, চন্দ্রোদয়, নক্ষত্রখচিত আকাশ, নির্জন শ্মশান প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের বিষয় অবলম্বিত হয়েছে কবিতাগুলিতে। গীতগুলিতে প্রাধান্য পেয়েছে প্রেমচিন্তা। প্রথম গীতটিতে 'বাউল বিংশতি'র একাদশ সংখ্যক গানের কিছু অংশ ব্যবহৃত হয়েছে। 'প্রভাত হয়েছে নিশি···মরে যাই' পর্যন্ত অংশ পূর্বোক্ত গানের মধ্যে আছে। এগুলির ভাষা ছন্দ অনেক বেশী সুষমামণ্ডিত হয়ে উঠেছে। স্বল্পাক্ষর আয়তনের মধ্যে কোথাও কোথাও বক্তব্য নিটোল মুক্তার রূপ ধারণ করেছে। কতগুলি বিচ্ছিন্ন উদাহরণ—

শারদ পূর্ণিমা আজি সেজেছে কেমন !
লইয়ে নীরদমালা,
কতই করিছে খেলা,
ক্ষণে আধ-দরশন ক্ষণে অদর্শন। (শারদ পূর্ণিমা)

এ নীল মানস-সর,
আহা কি উদারতর,
উদার রূপসী শশী, সকলি উদার ! (গীত—২)

কেন কেন ত্রিভুবন তিমিরে মগন প্রায়
এলোকেশী কে রূপসী
বলেতে হৃদয়ে পশি
দামিনী বজ্রাগ্নি যেন মাতিয়ে বেড়ায়। (গীত-৪)

এই সংকলনগ্রন্থের মধ্যে বিভিন্ন কবিতায় আর গানে রোম্যান্টিক বিষাদের ভাবটি যেন প্রাধান্য পেয়েছে। প্রকৃতিভাবনা আর প্রেম-চিন্তা যেন বিষাদের লঘুপক্ষ মেঘমালায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। মাঝে মাঝেই খানিক পরে যখন মেঘমালা অপসৃত হয়, তখনই ঐ বিশেষ চিন্তাটি স্পষ্টতর হয়। রোম্যান্টিক মনের চরিত্রই এই।

এখানেও বিহারীলালের সৌন্দর্য আর প্রেমচেতনা বহির্বিশ্বে পূর্ণতার আস্বাদসন্ধানে রত। কবির অন্তরে এই দুই চেতনা যে আদর্শায়িত রূপে সৃজিত হয়েছে তার সমান্তরাল পূর্ণতা কিন্তু জগত ও জীবনে দুষ্প্রাপ্য। এই দুষ্প্রাপ্যতাই রোমান্টিক বিষাদের কারণ। আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান শাশ্বত কালের। এই ব্যবধান আদর্শকে সুদুর্লভ এবং পরম রমণীয় করে রাখে। প্রাপ্তির মালিন্য থেকে তাকে সযত্নে দূরে সরিয়ে রাখে। সেই দূরবর্তিতাতেই তার মূল্য, তার প্রতি রোম্যান্টিক মনের সীমাহীন আকর্ষণের প্রধান কারণও ঐখানে। সাধ ও সাধ্য, আদর্শ আর বাস্তব এ দু'য়ের মধ্যে যে ব্যবধান, সেইখানেই রোম্যান্টিক মনে অভিমানমিশ্রিত এক ধরণের কোমল বিষাদ সৃজিত হয়। অপ্রাপণীয়ের জন্য এই বিষাদের মধ্যে কিন্তু একটি অলৌকিক আনন্দচেতনা অনুস্যূত হয়ে থাকে। হয়ত বা এই আনন্দ-বেদনার স্পর্শকাতর মনটি মেলে ধরার জন্যই রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে শুনি—

ভালোবেসেছিনু এই ধরণীরে সেই স্মৃতি মনে আসে ফিরে ফিরে
কত বসন্তে দখিন সমীরে ভরেছে আমারি সাজি।
নয়নের জল গভীর গহনে আছে হৃদয়ের স্তরে,
বেদনার রসে গোপনে গোপনে সাধনা সফল করে।
মাঝে মাঝে বটে ছিঁড়েছিল তার, তাই নিয়ে কেবা করে হাহাকার,
সুর তবু লেগেছিল বারে বার মনে পড়ে তাই আজি।

তবে রোম্যান্টিক কবিমন যখন বিশেষ ভাবটিকে অবলম্বন করে আরও অগ্রসর হয়ে জগত ও জীবনের গভীরে নিহিত পরম সত্যটির সন্ধান

পায়, কবিচেতনা তখনই সেই প্রাপ্তির মূল্যে প্রত্যয়নিষ্ঠ হয়ে ওঠে, এবং তখনই তাকে বলা যায় মিষ্টিক। রোম্যান্টিক চেতনার প্রত্যয়ান্বিত আর সত্যনিষ্ঠ রূপটিই মিষ্টিক চেতনা। বিহারীলালের এই মিষ্টিক চেতনা সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি। এগুলিতে তার স্পর্শ অনায়াসলভ্য।

'কবিতা ও সঙ্গীত'-এর মধ্যে সারদার জন্য কবির অন্তর্গূঢ় বেদনার প্রকাশ বহুক্ষেত্রেই স্পষ্ট,—

প্রাণে সহেনা সহেনা সহেনাক আর !
জীবন কুসুমলতা কোথারে আমার !
কোথা সে ত্রিদিব জ্যোতি,
কোথা সে অমরাবতী,
ফুরাল স্বপন খেলা সকলি আঁধার ! (গীত—২)

অথবা কি হ'ল, কি হ'ল হ'লরে, কি হ'ল আমায়,
কেন কেন ত্রিভুবন তিমিরে মগন প্রায়। (গীত-৪)

এই অংশগুলিতে যে সারদাবিরহেরই হাহাকার প্রকাশিত তা অত্যন্ত সহজেই অনুভূত হয়। পরে কবির বেদনা স্পষ্টতর হয়, তিনি বলেন—

সারদা-সারদা-সারদা কোথারে আমার
এ জন্মে তোমারে আমি দেখিতে পাবনা আর !
ত্যেজে এ মরতভূমি,
কোথা চলে গেলে তুমি ?
এস দেবী, এস, এস দেখি একবার। (গীত-৯)

'নিয়তি সঙ্গীতে'র উদ্দিষ্ট হলেন,—
শ্রীরাম-গেহিনী,
জনক নন্দিনী
সীতা সীমন্তিনী জনম দুঃখিনা।

এ কবিতাটি ভাষা ও ছন্দের বিন্যাসে অত্যন্ত সুখপাঠ্য। জনমদুঃখিনী সীতার বেদনাটি কবি অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে তুলে ধরেছেন—

কি বেজেছে বুকে,
কথা নাই মুখে,
চায় চারিদিকে কেন পাগলিনী।
যান যথা যথা
কাঁদে তরুলতা
কাঁদেরে নীরবে বনের হরিণী।

এই কবিতাটির মধ্যে নিয়তির অলঙ্ঘনীয় বিধানই প্রকাশিত হয়েছে। সিংহাসন ত্যাগ করে বনবাসে আসা নিয়তির পরিহাস ছাড়া যে অন্য কিছুই নয় তা অতি সহজেই অনুমান করা যায়। সারদাবিরহে কবির অন্তরে যে বেদনা, পতি-বিরহে অশোকবনে সীতার যে বেদনা, এদের স্থান-কাল-পাত্রগত তারতম্য থাকলেও চরিত্রবিচারে এগুলি একই। বেদনার কোন শ্রেণী বিভাগ সম্ভব নয়, তার ব্যাপ্তি ও গভীরতায় তারতম্য থাকতে পারে, কিন্তু সমস্ত বেদনাই মূলে এক বেদনা। হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত আর রক্তাপ্লুত করে তুলতে সমস্ত বেদনাই সক্ষম।

অক্ষরমাত্রিক রীতির ৮ মাত্রার পর্বের প্রতি কবির আকর্ষণ সহজেই চোখে পড়ে। অপেক্ষাকৃত স্বল্পসংখ্যক ছত্রে এর ব্যত্যয় ঘটেছে। ছন্দ-ব্যবহারে দক্ষতা এবং সতর্কতা এ দুয়ের সমন্বয় 'সারদামঙ্গল' কাব্যে দুর্নিরীক্ষ্য নয়। তবে স্তবকগঠনে কবি যথেষ্ট স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন। কোন একটি রীতি আগাগোড়া অনুসৃত হয়নি। ছয় পঙ্‌ক্তির স্তবকসংখ্যাই বেশী, আর সেগুলি সাজানো হয়েছে দুটি হ্রস্ব একটি দীর্ঘ, আবার দুটি হ্রস্ব একটি দীর্ঘ পঙ্‌ক্তি দিয়ে। হ্রস্বপঙ্‌ক্তিগুলি একপর্বিক এবং আট মাত্রার। দীর্ঘ পঙ্‌ক্তির মধ্যে মাত্রাসমকতা নেই, ৮।৬ আছে, আবার ৮।৮ মাত্রাব দ্বিপর্বিক পঙ্‌ক্তিও আছে। তবে পঙ্‌ক্তি ও স্তবক গঠনে কবি সর্বদাই ব্যতিক্রমধর্মী। পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থগুলিতে চলিতভাষায় প্রয়োগবাহুল্য যতখানি দেখা গিয়েছে, সারদামঙ্গলে তা নেই। অনুমানে বাধা নেই যে কবিপ্রতিভা আপন শক্তির সন্ধান পেয়েছে।

কাব্যসাধনায় প্রায় তিনদশক অতিক্রান্ত। 'বন্ধুবিয়োগ' রচনার

কাল থেকে 'সাধের আসন' রচনার দূরত্ব উনত্রিশ বছর। বাঙ্গালী কবিদের নিয়ে ভাবলে এ কাল পরিমাণে যথেষ্ট দীর্ঘ। কবিও বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন। জীবনের বৃহত্তর অংশ অতীত। অবশিষ্ট অল্প কয়েকটি বছর আনন্দ-বেদনার স্মৃতি বহন করে অস্তাচলেরই অভিমুখী। কিন্তু নীতিমান আর রুচিমান কবির কাছে প্রতিশ্রুতির রক্ষা বড় পবিত্র কর্তব্য, তা সে যতই বেদনাদায়ক হোক। সেই প্রতিশ্রুতি-রক্ষার 'আর্যতম' মানসভূমিতে জন্ম 'সাধের আসন' কাব্যের। এ কাব্য দীর্ঘ জীবনের চিন্তা, অভিজ্ঞতা, সাফল্য আর ব্যর্থতার নির্যাস। কবিজীবনে বিচিত্র রাগিণীতে বহু বিচিত্র সঙ্গীতের অন্তরালে যে ঐকতানটি সৃজিত হয়েছিল, এখানে তারই আভোগ আর আবর্তন। যে সুবলয়িত চিন্তার সূত্রপাত হয়েছিল 'সঙ্গীত শতকে'র প্রথম সঙ্গীতে, তারই ভাব-কেন্দ্রে সাগ্রহ প্রত্যাবর্তন 'সাধের আসন' কাব্যগ্রন্থে।

'সাধের আসন' কাব্যরচনার ইতিহাস সর্ববিদিত, কিন্তু সর্ববিদিত বহু কাহিনীর স্মৃতিচারণও প্রয়োজন হয়। কাহিনীটি কাব্যের ভূমিকা হিসেবে কবির দ্বারাই উপস্থাপিত। কবি বলেছেন—

'কোন সম্ভ্রান্ত সীমন্তিনী আমার 'সারদামঙ্গল' পাঠে সন্তুষ্ট হইয়া চারিমাস যাবৎ স্বহস্তে বুনিয়া একখানি উৎকৃষ্ট আসন আমাকে উপহার দেন। এই আসনের নাম 'সাধের আসন'। 'সাধের আসনে' অতি সুন্দর সুন্দর অক্ষর বুনিয়া সারদামঙ্গল হইতে এই শ্লোকার্ধ উদ্ধৃত করা হইয়াছে—

"হে যোগেন্দ্র ! যোগাসনে
ঢুলুঢুলু ঢু-নয়নে
বিভোর বিহ্বলমনে কাঁহারে ধেয়াও ?"

প্রদানকালে আসনদাত্রী উদ্ধৃত শ্লোকার্ধের উত্তর চাহেন। আমি উত্তর লিখিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া আসি। এবং বাটিতে আসিয়া তিনটি শ্লোক লিখি। কিছুদিন গত হইলে উত্তর লিখিবার কথা একপ্রকার ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এই আসনদাত্রী দেবী এখন জীবিত

নাই। তাঁহার মৃত্যুর পরে উত্তর সাঙ্গ হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র খণ্ডকাব্যের উপহৃত আসনের নামে নাম রহিল 'সাধের আসন'।"

আসনটির নাম কিন্তু 'সাধের আসন' বলে আসনের গায়ে উল্লেখিত নেই। উদ্ধৃত কবিতাংশ ছাড়া "উপহার' শব্দটি এবং আসনদাত্রীর নামের আদ্যক্ষর 'কা' আসনের ওপর উল্লিখিত আছে। অতএব 'সাধের আসন' শব্দ দু'টি আসন উপহারদাত্রীর মৌখিক উল্লেখের মধ্যেই ছিল, এ অনুমানে বাধা নেই। কবি সেই শব্দযুগলেই কাব্যের নামকরণ করেছেন আর তারই মধ্যে পরলোকগতা মহিলার প্রতি তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পঞ্চম পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। তাঁর পত্নী 'কাদম্বরী' দেবীই যে কবির উল্লেখিত 'সম্ভ্রান্ত সীমন্তিনী', এ তথ্য বাংলা সাহিত্যের প্রতিটি পাঠক পাঠিকার জানা আছে। ১৮৬৮ সালে ন'বছর বয়সে এই মহিলা ঠাকুরবাড়ীতে আসেন। প্রায় ষোল বছর ঠাকুরপরিবারে বসবাস করার পর এই মহিলা ১৮৮৪ সালে আত্মহত্যা করেন। এই আত্মাহুতিকে কেন্দ্র করে বাঙালী বিদগ্ধ সমাজে তখনি একটা সন্দিগ্ধ জিজ্ঞাসা সৃষ্ট হয়েছিল। আজও তার সম্পূর্ণ নিরসন হয়েছে মনে হয় না। সাম্প্রতিককালেও এ নিয়ে আলোচনা চোখে পড়ে। যাই হোক, ঠাকুরবাড়ীর সাহিত্য-সঙ্গীত ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের প্রাণকেন্দ্রে যে অনন্যা মহিলাটি ছিলেন, তিনি এই কাদম্বরী দেবী। কবি বিহারীলালের তিনি ছিলেন গুণমুগ্ধ কাব্যপাঠিকা।[১] কাদম্বরী দেবী যখন 'সারদামঙ্গল' পাঠ করেন তখন তাঁর বয়স আনুমানিক বিংশতি বৎসর। অনুমিত হয় যে 'সারদামঙ্গলে'র প্রকাশের পর পরই কাদম্বরী দেবী তাঁর 'সাধের আসন' কবিকে উপহার দেন। কিন্তু আসনের পটভূমিতে উত্থাপিত প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তররচনায় কবি যখন বসলেন, তার চারবছর আগে আসনদাত্রী লোকান্তরিত হয়েছেন।

আনন্দ-বেদনার মধ্যবর্তী কোন একটি বিন্দুতে রোম্যান্টিক অনু-

ভূতির উদ্ভব আর বিকাশ। প্রতিটি রোম্যান্টিক শিল্পকর্মে এর ছায়া তাই বড় বেশী করেই চোখে পড়ে। এই আনন্দ-বেদনার আলো-অন্ধকারে যাত্রা করে বিহারীলাল 'সারদামঙ্গল' রচনার অধ্যায়ে উপনীত হয়েছিলেন। বিশ্বরহস্যের মূল ধরা পড়ে সত্যানুভূতিতে। একে চিহ্নিত করা হয়েছে 'মিষ্টিক চেতনা' এই অভিধায়। এক সময় 'সারদমঙ্গলে'র ছত্রবিশেষকে আশ্রয় করে একটি সাত্ত্বিক প্রশ্ন উত্থাপিত হ'ল। কিন্তু সে প্রশ্নের উত্তর-রচনা যখন সম্পূর্ণ, তখন সেই প্রশ্নকর্ত্রী আর নেই। ঘটনার এই ধারাটিকে চিন্তা করলে 'সাধের আসন'কে কবি বিহারীলালের বেদনাময় অন্তরের প্রকাশ বলেই গ্রহণ করতে হয়। অন্য অর্থে 'সারদামঙ্গলে'র পরিশিষ্ট 'সাধের আসন'। প্রশ্নোত্তর সূত্রে উভয় কাব্যগ্রন্থ নিগূঢ় ভাবেই সম্পর্কিত।

আসনদাত্রী সীমান্তনী যে প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন তার উত্তরদান-প্রসঙ্গে কবি স্বীকার করলেন যে, স্বীয় কাব্যসাধনার কেন্দ্রবিন্দুতে যে মানসীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত, তার স্বরূপ বিশ্লেষণ তাঁর পক্ষে খুব সহজ নয়। অনুভূতিলোকে তাঁর যে প্রকাশ প্রেরণাময়ীর মূর্তিতে, তার বাঙ্‌নির্মিতি দুরূহ। আপন হৃদয়াসীনা দেবীকে সর্বজনগ্রাহ্য করে তুলতে হ'লে যে চিত্রণপ্রতিভার প্রয়োজন, কবি সবিনয়ে স্বীকার করলেন সে প্রতিভা তাঁর নেই। কিন্তু এ কথাও বললেন—

কহে সে রূপের কথা
বসন্তের তরুলতা ;
সমীরণে ডেকে বলে, নির্জন কাননে ফুল। (১৷২)

বিশ্বময়ী সেই যোগেন্দ্রবালার মাধুরী আকাশের ইন্দ্রধনুতে, প্রভাতের উজ্জ্বল শুকতারায়, অনন্তবিস্তৃত অম্বুরাশিতে, এমনকি প্রসন্নবদনা স্বামী-সোহাগিনী নারীর মুখমণ্ডলেও তা প্রকাশিত। 'যা দেবী সর্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা' তাঁকে প্রণাম। (শ্রীশ্রীচণ্ডী ৫।৫৫) সমগ্র বিশ্ব-সৌন্দর্যের স্বর্গীয় উৎস, 'অত্যুল্লাসকরী অয়ি পরম আনন্দময়ী' তোমাকে বারবার নমস্কার। কিন্তু তুমি কে? তোমাকে তোমার স্বরূপলক্ষণসহ

ভাষার বন্ধনে বন্দী করি, সে সাধ্য কই? প্রথম সর্গে কবি এই বিশ্ব-বিমোহিনী মায়ার মাধুরী দর্শন করছেন, আর বার বার প্রশ্ন করেছেন, কে তুমি?

বিহারীলাল ভাবতন্ময়তার চরম অবস্থায় এসেও আপন উপলব্ধির সত্যটিকে নিখাদ অবস্থায় প্রকাশ করেন। সে সত্য চিরন্তন, দেশকাল-পাত্র-ভেদে তার রূপান্তর নেই। কবি যখন বলেন—

কে তুমি, ভক্তজন
জুড়াইতে প্রাণমন
মনের মতন তার মূরতি-ধারিণী। (১।৭)

তখন বুঝি যে ভারতীয় দর্শনের একটি নিগূঢ় বক্তব্য স্বল্পতম পরিসরে তুলে ধরলেন কবি।

নির্গুণ ব্রহ্ম উপাসনার বিষয়ীভূত হতে পারেন না। উপাসনার জন্য তাই প্রয়োজন হয় সাকার মূর্তি। উপাসনার অর্থই সগুণ ব্রহ্মধ্যান। ভারতবাসী এই উপাসনার ক্ষেত্রে আপন আপন অভিরুচিমত মূর্তি কল্পনা করে নিয়েছে। সেই বিচারে কেউ বৈষ্ণব, কেউ শক্তি, শৈব ইত্যাদি। কিন্তু একথাও ভোলেনি যে, 'ঐ যে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম সকল আমার এলোকেশী'—মূলত সবই এক। এই যে রূপভেদ, নাম-ভেদ আর উপাসনার জন্য উপচারভেদ, এ শুধু উপাসকদের মানসিক সন্তোষের জন্যই। সবই এক, তবে ভক্তের মনের মত অর্থাৎ তারই ভাবভক্তির সাহায্যে তিনি ভিন্ন ভিন্ন রূপে উপাসনার বিষয়ীভূত হবার জন্য আকারত হন।

বিহারীলাল বিশ্বময়ী সারদাকে দেখলেন সীমিত পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যে, অসীম স্নেহ-প্রেম-প্রীতির প্রতিমূর্তি 'জননী, পিতা, নন্দিনী, রমণী আর মিতা'র মধ্যে। আবার তাকেই অনুভব করলেন 'কোটি কোটি সূর্যতারার' মধ্যে, 'ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতর' তৃণেরও মধ্যে। এই বিপরীত কোটিতে যাঁর মহিমা প্রকাশিত তাঁর বন্দনায় কবি বললেন—

চাহি এ সৌন্দর্য পানে,
কি যেন উদয় প্রাণে !
কে যেন কতই রূপে একা লীলা খেলা করে। (১।১১)

আবার সৃষ্টির দুঃখবেদনা, ধ্বংস প্রলয়ের দিকেও কবির দৃষ্টি পতিত হয়। বলেন—

উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে
প্রলয় ধেয়েছে রঙ্গে
জীবনের সঙ্গে সঙ্গে ধেয়েছে মরণ।
আপনি সময় হ'লে
সূর্য্য চলে অস্তাচলে,
আবার সময়ে হয় উদয় কেমন। (১।১৩)

সৃষ্টি স্থিতি আর বিলয়ে বিধৃত এই জড় ও চেতন জগতের স্বরূপটি কবি যেন একদৃষ্টিতে দেখেন। দেখেন—

বিশ্বের প্রকৃতি এই
একেবারে লয় নেই ;
এক যায়, আর আসে
তরুণ সৌন্দর্যে ভাসে। (১৫)

এক এক সময় কবি যেন এক একটি সমস্যার মুখোমুখি। বলেন—

বিশ্ব গেছে, কান্তি আছে,—অনুভবে আসেনা,
দেহখানি ধ্বংস হ'লে কান্তিটুকু থাকে না। (১।১৫)
তেমনি এ বিশ্ব থেকে
কান্তিখানি দূরে রেখে,
চাও, বিশ্ব পানে চাও
কিছু কি দেখিতে পাও ? (১।১৬)

না, তা সম্ভব নয়। কায়া-কান্তি অবিচ্ছেদ্য। একটি বর্জন করে অন্যটিকে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। সমগ্র সৌরজগতকে যদি বলি কায়া, তার কান্তি এই আলো। বিশ্ববিকাশিনী আলোর স্পর্শ

যদি মুছে যায়, সমগ্র বিশ্বসংসার অতল অন্ধকারের মধ্যে চিরকালের জন্যই নিমজ্জিত হয়ে যাবে। সে অবস্থা কবির পক্ষে অকল্পনীয়। তাই কবি ভীত স্বরে প্রার্থনা জানান—

কোথা? কোথা? কোথা তুমি বিশ্ববিকাশিনী?
এস মা! ঘোরান্ধকারে তিষ্ঠিতে পারিনি।
তুমিই বিশ্বের আলো, তুমি বিশ্বরূপিণী। (১।১৬)

বিশ্বমাতার মূর্তি বিশ্বমন্দিরে সুপ্রতিষ্ঠিত। সেখানে চলেছে 'নিত্য মহোৎসব।' তিনি নয়ন-লোভন বিশ্বেশ্বরী মূর্তিতে সদা প্রকাশমান। তবু তাঁর স্বরূপ উদ্ঘাটন করা সম্ভব নয়। কবি বলেন,—

কে তুমি মা বিশ্বেশ্বরী!
দাঁড়ায়েছ আলো করি?
সদাই সম্মুখে দেখি তবু তোরে চিনি না।
যখন যা আসে মনে
ডাকি সেই সম্বোধনে;
মা ছাড়া মায়ের কোন নাম আমি জানি না। (১।১৭)

মাতৃস্বরূপের ব্যাখ্যা যে ধর্মগ্রন্থে বা দর্শন-উপনিষদে পুরো ধরা দেয়নি, এ বিষয়ে কবি নিঃসন্দিগ্ধ। তিনি বলেন—

বাইবেল কোরান বেদ,
মেটেনা মনের খেদ,
দর্শন শাস্ত্রের গাদা,
কেবল বাড়ায় ধাঁদা। (১।২০)

মাতৃস্বরূপ উপলব্ধির বস্তু এবং সে উপলব্ধি মাতার আশিসসাপেক্ষ। তাই কবির শেষ অনুরোধ, 'আপন রহস্য মাতঃ! আপনি খুলিয়া দাও।' (১।২০)

এই বিশ্বরূপের রহস্য সন্ধান করতে গিয়ে কবি অনুভব করেন তিনি মহাপ্রলয়ের মুখোমুখি হয়েছেন। পরিদৃশ্যমান জগত মুহূর্তের মধ্যেই বিলুপ্ত, কবি ভীত সন্ত্রস্ত। কাতর হয়ে প্রার্থনা জানালেন—

হও অবোধের প্রতি
প্রসন্না প্রকৃতি সতী!
রহস্য ভেদিতে তব আর আমি চাবনা।
না বুঝিয়া থাকা ভাল,
বুঝিলেই নেবে আলো,
সে মহাপ্রলয় পথে ভুলে কভু ধাবনা। (১।২১)

কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনের পর অর্জুনের কাতর প্রার্থনা মনে পড়ে।

অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥ (১১।৪৫)

কবিও জগন্মাতার বিশ্বব্যাপ্ত ভয়ংকরী রূপ দর্শন করে ব্যথিত। আর সে রূপের দর্শনকামনা তাঁর নেই। যিনি রহস্যময়ী, তিনি তাঁর সেই অনাদি অনন্ত রহস্যময়তায় প্রতিষ্ঠিত থাকুন। 'এ ব্রহ্মাণ্ডে রহস্যই সব'। কবির মিষ্টিক অনুভূতি সত্যোপলব্ধির আলোকময় তীর্থে উপনীত হয়, বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেন—

রহস্য বিশ্বের প্রাণ,
রহস্যই স্ফূর্তিমান,
রহস্যে বিরাজমান ভব।
ভাই বন্ধু কেবা কার,
রহস্যেই আপনার।
প্রেম, স্নেহ, সুত, দারা,
বায়ু, বহ্নি, সূর্য্য, তারা,
সকলি রহস্যময়,
এ ব্রহ্মাণ্ডে রহস্যই সব। (১২২)

শুদ্ধজ্ঞানের মধ্যে কোন দ্বিধা থাকে না। সে জ্ঞানের অধিকারী বিশ্বরহস্যের তলদেশ পর্যন্ত নির্বাধ দৃষ্টিতে দেখতে পারেন, বলা যায় বিশ্বরহস্য তাঁদের কালিমাহীন মনোমুকুরে আপন স্বরূপে প্রতিবিম্বিত হয়।

বিহারীলাল—১৪

কবি বলেন—

রহস্য, মাধুরীমালা,
রহস্য, রূপের ডালা,
রহস্য, স্বপনবালা
খেলা করে মাথার ভিতরে,
চন্দ্রবিম্ব স্বচ্ছ সরোবরে। (১।২৪)

যাঁদের মনোমুকুর 'স্বচ্ছ সরোবরের' মত, তাঁদের কাছে বিশ্বরহস্যের সূত্রসন্ধান বিলম্বিত হয় না। যাঁরা সূত্রসন্ধানী নন, জ্ঞানমার্গের পথিক নন, তাঁরা এই বিশ্ববিমোহিনী দেবীকে 'মায়া' নামেই অভিহিত করেন। এই মায়া ভ্রান্তি বা অবিদ্যার সমার্থক নয়, বরং রহস্য শব্দের সমগোত্রীয়। কবিও এঁকে মায়াদেবী বলেই সম্বোধন করেন আর কে তাঁকে কোন দৃষ্টিতে দেখেছেন তার বর্ণনায় বলেন—

কবিরা দেখেছে তাঁরে নেশার নয়নে।
যোগীরা দেখেছে তাঁরে যোগের সাধনে। (২৪)

যাঁরা এই অনন্ত সৌন্দর্যের দেবীকে অস্বীকার করতে চায় করুক বা 'মায়া' নামে অভিহিত করে সবকিছুকে দৃষ্টি বিভ্রম বলে প্রচার করতে চায় করুক। কবির কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস, এই মায়া 'মানবের সকলেরি আন্তরিক অতি আদরিণী'। কবি প্রথম সর্গের উপসংহারে তাই ঘোষণা করেন—

প্রত্যক্ষে বিরাজমান,
সর্বভূতে অধিষ্ঠান,
তুমি বিশ্বময়ী কান্তি, দীপ্তি অনুপমা,
কবির যোগীর ধ্যান
ভোলা প্রেমিকের প্রাণ,
মানবমনের তুমি উদার সুষমা। (১।৩০)

দ্বিতীয় সর্গের 'গোধূলি' আর 'নিশীথে' কবিতা দু'টিতে শৈশব-স্মৃতি রোমন্থন লক্ষণীয়। সেই স্মৃতিচারণের মধ্যে এসেছে প্রকৃতির

রূপবর্ণনা স্মৃতিচারণের সার্থক পটভূমি হিসাবে। এ স্মৃতিচারণের কেন্দ্র-বিন্দুতে কবির মাতৃমূর্তি স্থাপিত। অতি শৈশবেই মাতৃহারা বিহারীলাল অন্তরের মধ্যে অনির্বাণ ক্ষোভ পোষণ করে চলেছেন—'পড়েও পড়ে না মনে, জীবনের কি অসুখ।' সেই অবিস্মরণীয় মাতৃস্মৃতি কবিকে বার বার ব্যাকুল করে, কবি উন্মনা হয়ে উঠেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর বিশ্বাসনিষ্ঠ কণ্ঠে শুনি—

তোমারি কৃপায়, মাগো, তোমারি কৃপায়
তরঙ্গে জীবনতরী সুখে চলে যায়,
শুধু তোমারি কৃপায়। (২।১০)

তিনি যে চারবছর বয়সে মাকে হারিয়েছিলেন একথা কিছুতেই ভুলতে পারেন না। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে অভিমানভরে প্রশ্ন করেন—

চারি বছরের ছেলে
কেন ফেলে স্বর্গে গেলে ?
আমি অতি শিশু-মতি চিনিতে পারিনি গো !
প্রত্যক্ষ দেবতা তুমি, তোমারে পূজিনি গো ! (২।১১)

কবিকল্পনায় মাতৃদেবী এখন প্রত্যাবৃত্ত। এবার মনের সাধ মিটিয়ে তাঁর পূজো করবেন কবি। তাঁর কামনা—

দাঁড়াও চরণে ধরি,
প্রাণভোরে পূজা করি
সুশীতল অশ্রু জলে ধুয়াইব শ্রীচরণ। (২।১৩)

কিন্তু কবির কল্পনায় শুধু থাকলেই চলবে না। তাঁকে যে ঘরে এসে ছেলেমেয়েদের দেখতে হয়, কবিপত্নীকে আশীর্বাদ করে যেতে হয়। এখানকার অশ্রুসজল ছত্রগুলি পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে। কবি মাকে প্রশ্ন করেন—

কোথায় যাইবে বল ?
হিমেল বাতাস কিগো ভাল লাগিছে না গায় ?
ঘরে কি মা যাইবে না,

ছেলে মেয়ে দেখিবে না?

পাবে না কি বধূ তব প্রণাম করিতে পায়? (২।১৪)

স্বপ্নমধুর রাত্রি প্রভাত হ'ল। পূর্বদিগন্তে উষার আগমনবার্তা ঘোষিত। পৃথিবী অরুণরাগে রঞ্জিত। মনোলীনা মাতার কাছে কবির প্রশ্ন 'বলগো বল বল কা'র তুমি করুণা?'

বিশ্বপ্রকৃতি আর মানবজীবনের মধ্যে যে নিবিড় যোগসূত্রটি আছে কবি তাকে বার বার অনুভব করেছেন। দ্বিতীয় সর্গের সূত্রপাতেই কবি বলেছেন—

সুশান্ত গোধূলি বেলা!
ননীর পুতুলগুলি ভুলিয়াছে খেলা দেলা।
চেয়ে চেয়ে কুতূহলে
সূর্য যায় অস্তাচলে,—
কেমন প্রশান্ত মূর্তি কোথায় চলিয়া গেল!

এরপরই বলেছেন—

চিবুক ধরিয়ে মা'র
শুধাইছে বারেবার
কত কথা শতবার, ফুরাইতে পারে না!
দিগন্তের কালো গায়
মেঘ চলে পায় পায়,
চাতক বেড়ায় উড়ে, কোথা যায় জানে না!

বিহারীলালের অন্তর্জগতে মানবজীবন-সম্পৃক্ত প্রকৃতির রূপটি তাঁর কাব্যরচনার প্রথম যুগ থেকেই দেখা গেছে। প্রকৃতি শুধু সৌন্দর্যানুভূতির সহায়ক নয়, কবির দৃষ্টিতে প্রকৃতি আর মানবজীবন এক বৃন্তে দুটি ফুল। অবিচ্ছেদ্য তাদের সম্পর্ক। এই অনুভূতিটিকে রূপ দিতে গিয়ে ছোটখাট প্রযুক্তিগত ত্রুটি অবশ্যই ঘটেছে এবং তার ফলে এই সব বহুমূল্য ভাব পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বহুলাংশে ব্যর্থ হয়। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহোদয়ের এ মত স্বীকার্য।

প্রভাত ও যোগেন্দ্রবালার বর্ণনা দিয়ে রচিত তৃতীয় সর্গ। প্রভাত কবিতাটির প্রকৃতির রূপবর্ণনায় কবির মৌলিকতা লক্ষণীয়।

সহর্ষ কেতকীকুঞ্জ,
প্রফুল্ল চম্পকপুঞ্জ,
সোনার কদম্ব সব রসে রোমাঞ্চিত কায়,
উল্লাসে মাঠের কোলে
তৃণের তরঙ্গ দোলে,
কাশের চামরগুলি সোহাগে গড়িয়ে যায়! (প্রভাত-৪)

এই প্রফুল্ল প্রকৃতির উদার পটভূমিতে যোগেন্দ্রবালার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করছেন কবি। তাঁর আবির্ভাবে শুধু কবিই নন, সমগ্র পৃথিবী হর্ষোৎফুল্ল। অপূর্ব কেশবাস আর অপূর্ব দেহসুষমা এই ত্রিদিবরাণীর। তাঁর কটাক্ষেই পৃথিবীতে দয়া, করুণা, স্নেহ প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তিগুলির উদ্ভব হয়েছে যেন। প্রকৃতিদেবী তাঁর পদসেবায় নিরত। কবিরও প্রার্থনা—

আমিও এনেছি বালা,
প্রেমের প্রফুল্ল মালা,
সৌরভে আকুল হ'য়ে পারিনি পরাতে গায়;
সজল নয়নে শুধু চেয়ে আছি রাঙা পায়!

(যোগেন্দ্রবালা-৯)

'দিগন্ত ললাট পটে সাধের নন্দনবন' আছে। সেই বনের বর্ণনা দিয়ে চতুর্থ সর্গ শুরু। দেবতা-বাঞ্ছিত নন্দনবনের সৌন্দর্যচিত্র অঙ্কন করার পর কবির দৃষ্টি পতিত হয়েছে নিদ্রিতা কবিপ্রিয়ার ওপর। কবির মনে হয়— কি ফুল রয়েছে ফুটে

কি এক আলোয় গৃহ আলো হয়েছে কেমন!

*   *   *   *

মধুর মূরতি দেবী কি মধুর অচেতন!
নিমীলিত নেত্র দুটি যেন ধ্যানে নিমগন! (৪।৬)

কবি তাঁকে আহ্বান করেন—

উঠ, প্রেয়সী আমার—
উঠ, প্রেয়সী আমার!
জীবন-জুড়ান ধন, হৃদি ফুলহার!
উঠ, প্রেয়সী আমার। (৪।৯)

কবি অকপটে স্বীকার করেন—

তোমার পবিত্র কায়া,
প্রাণেতে পড়েছে ছায়া,
মনেতে জন্মেছে মায়া, ভালবেসে সুখী হই।
ভালবাসি নারী-নরে,
ভালবাসি চরাচরে,
ভালবাসি আপনারে, মনের আনন্দে রই!
প্রেয়সী আমার!
নয়ন-অমৃত রাশি প্রেয়সী আমার! (৪।১১)

কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই প্রিয়ার পার্থিব রূপের আধারে বিশ্বজননীর রূপ-দর্শন করেন কবি। প্রিয়ার স্তবগান রচিত হয়—

উদার লাবণ্যে তব
ভরিয়া রয়েছে ভব;
তুমিই বিশ্বের জ্যোতি,
হৃদপদ্মে সরস্বতী;
স্নেহ প্রেম ভক্তি ভাবে দেখি অনিবার!
প্রেয়সী আমার!
নয়ন-অমৃতরাশি প্রেয়সী আমার। (৪।১২)

হৃদয়ের প্রেমময়তা যে এই প্রেয়সীরই দান, তাতে কবি নিঃসন্দেহ। সেই প্রেমময় অঞ্জনলিপ্ত চোখে বিশ্বপ্রকৃতি কবির কাছে লাবণ্যময়ী আর এ সব কিছুর সমবায়ে কবির অন্তরে সারস্বত প্রেরণার উদ্ভব। কবির রূপমোহ কল্যাণধর্মী এবং তা রূপাতীতের দিকেই কবির

দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। আবার কবিমানসীকে আশ্রয় করে যে রূপ-মুগ্ধতা তাই পরিব্যাপ্ত হয় বিশ্বপ্রকৃতিতে; পাহাড় পর্বত, নদনদী, বৃক্ষলতা সব কিছুই অপূর্ব সৌন্দর্যে কবির মানসচক্ষে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। আবার এই দুই চেতনার সঙ্গে সারস্বতচেতনা মিশ্রিত হয়, কিন্তু তারও প্রত্যাবর্তন ঘটে কবিপ্রেয়সীতে। কেন্দ্রবিন্দুতে তিনিই। তাঁকেই অবলম্বন করে প্রেম, প্রকৃতি-প্রীতি আর সারস্বত চেতনা। এ কথা 'সারদামঙ্গল' কাব্য পাঠের সময় আলোচিত হয়েছে, এখানে যে ছত্রগুলি উদ্ধৃত হয়েছে, তার মধ্যেও সেই এক অতীন্দ্রিয় চেতনা প্রকাশিত।

দেহের আধারে দেহভোগের কামনা-বিরহিত শান্তি আর তৃপ্তি-সন্ধানী কবির মূলধন প্রেম। এই প্রেমময় হৃদয় নিয়ে কবি নিদ্রিত প্র য় মুখে যে সৌন্দর্য আর পবিত্রতা দর্শন করেন তা দেবদুর্লভ। কবি বলেন,—

ত্রিলোক-সৌন্দর্য সেই, প্রিয়া। তোর প্রিয়মুখ,
হৃদয়ে রয়েছে জেগে দেব-সুদুর্লভ সুখ।
শচীর ঘুমন্ত মুখ দেবরাজ! দেখনি?
মহাসুখে মহীয়সী আমাদের অবনী। (৪।১৪)

এই প্রেমের সাধনাই অমরত্বের সাধনা। 'প্রেমের আনন্দধামে মরণের ভয় নাই' এতো মহাসত্য। কবি সেই সত্যের উপলব্ধিতে সুপ্রতিষ্ঠিত। ভোলা মহেশ্বরের প্রেম, যোগিনী রাধিকার কৃষ্ণ-প্রেম আর কৃষ্ণের আপন হ্লাদিনী শক্তি রাধাপ্রেম, সব কথা কবির মনে পড়ে। কিন্তু দেবদেবীর প্রেমলীলা চিন্তায় কবির তৃপ্তি নেই। তাঁর তৃপ্তি আর শান্তির নিকেতন আপন হৃদয়, যেখানে যোগেন্দ্রবালার অধিষ্ঠান শাশ্বত। সেই শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তনের কামনা ঘোষিত এই সর্গের শেষ ছত্রগুলিতে,—

নানা কথা ওঠে মনে;
যাব না নন্দনবনে,

যাই আমি ফিরে যাই সে কমল-কাননে,
দেখিগে যোগেন্দ্রবালা যোগ-ভোলা নয়নে। (২৫)

আসনদাত্রী কাদম্বরী দেবীর কাছে উত্তরদানে প্রতিশ্রুত কবি প্রথমে তিনটি মাত্র শ্লোক রচনা করেন। পরে কাদম্বরী দেবী লোকান্তরিত হ'লে উত্তরচনার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবেই অনুভব করে সম্পূর্ণ 'সাধের আসন' কাব্য রচিত হয়। প্রকাশিত হয় কবির মৃত্যুর পরে। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে কবির দ্বিতীয়া পত্নীর নামও ছিল কাদম্বরী দেবী। কবি ভাবনিমগ্ন অবস্থায় সারদার মধ্যেই দুই কাদম্বরীকে দেখেন; প্রেম, প্রীতি ও ভক্তির পবিত্র সঙ্গম সৃজিত হয় কবির হৃদয়ের মধ্যে। আপন পত্নীর জন্য প্রেম, কাদম্বরী দেবীর জন্য প্রীতি আর কবিমানসী সারদার জন্য ভক্তির ত্রিবেণীসঙ্গমে এই আত্মভোলা কবির কাব্যকুসুম প্রস্ফুটিত। কবিস্বরূপের এই পরিচয় লাভের মধ্যেই তাঁর কবিকৃতির সার্থক রসাস্বাদন নির্ভরশীল।

পঞ্চম সর্গে যোগেন্দ্রবালার সন্ধানে অমরাবতীর পথে কবির যাত্রা। বহুদূর থেকে বিচিত্র শোভার আকর অমরাবতীকে দেখেন কবি,—

দৃষ্টিপথ-প্রান্তভাগে ওই কি অমরাবতী?
মহান বিচিত্র মূর্তি, কি উদার জ্যোতিষ্মতী!
অতিশুভ্র মেঘ-মাঝে
সোনার কিরণে রাজে,
সহস্র ধারায় যেন বহে স্বর্ণ-স্রোতস্বতী। (৫।১)

অপার্থিব সৌন্দর্যের লীলাভূমি এই নন্দনকাননেই প্রবেশ করেছেন দেবী সারদা; গিয়েছেন স্বর্গবাসিনী দেবীগণের আরাধনার জন্যে—

এই পথ দিয়া বুঝি সে সুধাংশুময়ীগণে
পূজিতে যোগেন্দ্রবালা গেছেন কমলবনে? (৫।৫)

নন্দনকাননে নিবদ্ধদৃষ্টি কবি শুধু সেই দেববাঞ্ছিত সৌন্দর্য-লোকের রূপরাশিই দর্শন করেন না, ওখানে যাঁদের বসতি তাঁদেরও দেখেন তিনি। কিন্তু সে নন্দনকাননে কবির প্রবেশ নিষেধ। দূর থেকে

স্বর্গকন্যাদের বিচিত্র দেবারাধনা লক্ষ্য করেন আর মনে মনে প্রশ্ন করেন—

কে তোরা স্বর্গের মেয়ে,
জ্যোৎস্না-সলিলে নেয়ে,
কিরণ-বসন পরি আলু করি কাল চুল,
নক্ষত্রের শিব গড়ি,
তান লয়ে মন্ত্র পড়ি,
অঞ্জলি পূরিয়া দিস প্রফুল্ল মন্দার ফুল ? (৫।১৪)

এর পরেই 'মন চল নিজ নিকেতনে'। চিন্তার দিক্ পরিবর্তন। 'থাকো স্বর্গ হাস্যমুখে' কবির প্রত্যাবর্তন ঘটল তাঁর আপন হৃদয়ে, যেখানে সারদার ভাবমূর্তি চিরপ্রতিষ্ঠিত। কবি বলেন—

যাই, বাছা, ফিরে যাই সে কমল-কাননে ;
দেখিগে যোগেন্দ্রবালা যোগ-ভোলা নয়নে ! (৫।১৬)

লোকান্তরিতা কাদম্বরী দেবীর চিন্তাই যে কবির কাব্য পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত, তা আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। তাঁর সেই পরলোকগমন চিন্তাতেই কবির মনে অমরাবতীর চিত্র জাগ্রত হয়েছে, কিন্তু কবির পক্ষে সেখানে প্রবেশ করা জীবিতাবস্থায় সম্ভব নয়। কবি তাই প্রত্যাবৃত্ত হন আপনার মনোজগতে। সেখানে সারদার ভাবরূপে নিজের চিন্তাভাবনাকে কেন্দ্রীভূত করেই কবির তৃপ্তি।

পরবর্তী ষষ্ঠ সর্গের নাম 'কে তুমি'। উদয়াচলে উষার আবির্ভাব দর্শন করে পরিতৃপ্ত কবির সানন্দ স্বীকৃতি—

উদয় অচল হতে
আপনার গৃহপথে
আসে বুঝি উষারাণী—
কি মধুর মুখখানি !
এমন সুন্দর মেয়ে দেখি নাই নয়নে। (৬।১)

কিন্তু পরক্ষণেই কবির সংশয়। ইনি কি উদয়াচল-বাসিনী উষা, নাকি 'মর্ত্যের নির্মল দিবা জীব-লীলা অবসানে' কোন 'পতিব্রতা সতী'

উদয়াচল উদ্ভাসিত করে আবির্ভূতা। অদূর অতীতে সেই মর্ত্যবাসিনী রমণীর প্রসঙ্গ কবিকে বেদনায় অভিভূত করে। সে অনুভূতির অলঙ্কৃত অথচ হৃদয়স্পর্শী প্রকাশ ঘটে অল্প ক'টি ছত্রে—

অকারণ কি কারণ
কেঁদে কেঁদে ওঠে মন!
এই যে কি স্বপ্ন দেখে
চমকিয়া ঘুম থেকে
উঠিলাম—
ভাবিলাম—
হায় সে স্বপন কেন আর মনে পড়ে না? (৬।৩)

অভিমানিনীর আত্মাহুতির স্মৃতি বিহারীলালকে উদ্বেল করে। যে রমণী একদিন স্নেহে, প্রেমে আর ভক্তিতে রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আর বিহারীলালকে একসূত্রে বন্দী করেছিলেন, যাঁর অনুপ্রেরণা ছিল এই তিন ব্যক্তির প্রতিভাবিকাশে অপরিমেয় সহায়ক, জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের সেই 'শ্রীময়ী প্রাণময়ী ও কল্যাণময়ী নারী'র জন্য বেদনাবিহ্বল কবির আত্মপ্রকাশ এই কাব্যে।[৩]

লোকান্তরিতা সেই কন্যার জ্যোতির্ময়ী মূর্তির ধ্যানে নিমগ্ন কবি বলেন—

এস, এস, শুভাননা,
সুমঙ্গল-দরশনা!
কাহার সুকন্যা তুমি, কার শুভ ঘরণী?
কি খেদে মানিনী সতী,
ত্যজেছ প্রাণের পতি?
এসেছ অমরপুরে কাঁদাইয়া ধরণী? (৬।৪)

কবি ভক্তিমতী কাদম্বরী দেবীর মর্ত্যজীবনের সমমর্মিতা স্মরণ করেন। মনে হয় সেই সহানুভূতির আকর্ষণেই স্বর্গবাসিনীর চোখেও দেখা দেয় অশ্রুবিন্দু। কবি প্রশ্ন করেন—

কেন পতিব্রতা মেয়ে,
আমারও পানে চেয়ে
করুণা-নয়নে তব ভরিয়া আসিল জল ?
আহা, সম সুখী দুখী,
অকলঙ্ক শশিমুখী।
ত্যজেছ মানবী কায়া,
ত্যজনি মানব-মায়া!
তোমাদেরি আশীর্বাদে বেঁচে আছে ভূমণ্ডল। (৬।৫)

'মানবী কায়া' ত্যাগ করেও 'মানবী মায়া' ত্যাগ করতে পারেননি তিনি। প্রকৃতপক্ষে, কবির কাছে সেখানেই অনেক শান্তি আর সান্ত্বনা। পরদুঃখকাতর এই অভিমানিনীর চোখে কবির জন্য দু'ফোঁটা জল, বহন করে আনে অসীম তৃপ্তি। কবি বলেন 'তব অশ্রুকণাটুকু অমৃত অধিক ধন'। এককালে এই কাদম্বরী দেবীই যে বিহারীলালের শ্রদ্ধাশীলা কাব্য-পাঠিকা ছিলেন; কাব্যরসাস্বাদানের শক্তিও যে তাঁর ছিল অপরিসীম, সে চিন্তা এখন কবিকে উন্মনা করে। কবি ঘোষণা করেন, সহৃদয়হৃদয়সংবেদ্য কাব্যের আস্বাদন কারোর পক্ষেই আজ আর বোধ হয় সম্ভব নয়। আজ যে পূর্বের সে অনুকূল আনন্দময় পরিবেশ নেই, কবি তা বিস্মৃত নন—

পদে পদে বাধা পাই,
তবু স্নেহে ধেয়ে যাই;
আপনার ভাব ভুলে
কহি আমি প্রাণ খুলে
মধুর উজ্জ্বল ভাষা,
পরিপূর্ণ ভালবাসা।
বুঝি কি কিম্ভূত ঠ্যাকে,
মুখ-পানে চেয়ে দ্যাখে,
সদয় হৃদয় ধীর হয়ে শোনে না:

বুঝিতেও পারে না ;
কোন কথা কহে না। (৬।৯)

এত গেল কবির কথা। ঠাকুর পরিবারের ?

আজি মা অভাবে তব
ধরাধাম নিরুৎসব ;
শ্রীহীন মলিন পতি বুঝি প্রাণে বেঁচে নাই ;
বাছারা শোকের ভরে
কি যে হাহাকার করে,
কল্পনা করিয়া আমি ভাবিতেও ভয় পাই ! (৬।১১)

এ সংসারে বাস করাই আজ অর্থহীন কবির কাছে—

আর—কি করি হেথায় !
একটুও যে সুখে সুখী,
একটুও যে দুখে দুখী,
অমরের অমরায় ওই যে চলিয়া যায় !
কি করি হেথায় ! (৬ ১৬)

কিন্তু ওইটিই পতিব্রতা রমণীর যোগ্যস্থান, সেখানেই তাঁর যাওয়া উচিত। কবি তাই বলেন—

থাক্ পৃথিবীর কথা ;
যাও তুমি পতিব্রতা !
সতীরা যে লোকে যায়
পদ্মফুল ফোটে তায়, (৬।১২)

তাঁকে আবাহন জানানোর জন্য অমরাবতী আজ যেন উন্মুখ—

ওই শুন, ওই শুন,
আঘোষে তোমার গুণ,
পুরমাঝে উঠিয়াছে কি মধুর বাজনা !
শঙ্খের মঙ্গলধ্বনি, আগমনী-গাহনা। (৬।১৪)

সমন্বয়ধর্মী কবিমন একসময় এই পরলোকগতা রমণীকে দেবী সারদার

সঙ্গে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করে নেন আর এই চিন্তাই শেষ পর্যন্ত কবিকে সান্ত্বনা দেয়। কবি বলেন—

অয়ি-অয়ি সরস্বতী !
তব পাদপদ্মে মতি
নির্মলা অচলা হয়ে থাকে যেন চিরদিন !
সেই বিজয়ার দিনে
বাজায়ে প্রাণের বীণে,
ভরি ভরি দু'নয়ন
তোর এই শুভানন
দেখিতে দেখিতে হই কালের সাগরে লীন ! (৬।২৩)

বহির্লোক থেকে অন্তর্লোকে এই প্রত্যাবর্তন বারে বারে ঘটেছে। কবিমনের তৃপ্তি যে বহির্লোকে নেই, এত স্বাভাবিক কথা। কবি তাই বারে বারে ফিরে আসেন স্বসৃষ্ট জগতে। সেখানে তিনি একচ্ছত্র সম্রাট, সেখানে তাঁর একাধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার শক্তি নেই কারোর।

সপ্তম সর্গের নাম 'মায়া'। এখানেও সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। মর্তমানবী মর্ত্যকায়া পরিত্যাগ করে আজ অমরানিবাসী। কবির বাসনা মর্ত্যের সেই 'শশাংক শ্যামিকা' স্বর্গে কীভাবে আছেন 'মনে মনে ভাবি তাই দেখে শুনে চলে যাই'। কিন্তু 'অমরার দ্বারবতী', 'কামধেনু কপিলা' কবির প্রবেশপথ রুদ্ধ করে আছে। কবির সেখানে প্রবেশ নিষেধ। 'বশিষ্ঠের হোমধেনু নন্দিনী'কে কেন্দ্র করে রাজা দিলীপের পৌরাণিক কাহিনীটি কবির স্মৃতিপথে উদিত হয়। অমরাবতীর আকর্ষণ তীব্র, কিন্তু প্রবেশপথে কপিলাসৃষ্ট বাধা তীব্রতর। স্বর্গের দেবতাদের পক্ষপাতিত্বের দিকে কটাক্ষ করেন কবি, বলেন—

দেবতা দেখিতে ভাল,
তাই তোর লাগে ভাল।

মায়া-দুগ্ধ পানে তোর,
তারাও নেশায় ভোর,
যেজন যেমন, বিধি তেমনি মিলায়। (৭।২৫)

শেষে বলিষ্ঠ কণ্ঠে কবি আপনার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন—

আজি এ জন্মের মত
ছাড়িলাম পদ্ম-পথ।
সীমা মাড়াবো না আর
কুহকিনী কপিলার। (৭।২৭)

মর্ত্যসম্বন্ধ ছিন্ন করে—

পারিজাত পুষ্পরথে
আসি এই পদ্ম-পথে
সতী, সেই প্রবেশিল, আর ফিরে এল না। (৭।৩০)

আর এদিকে— এখনো সে মুখখানি
হেরিতে আকুল প্রাণী,
নাহি জানি কি সম্বন্ধ আছে তাঁর সনে,
যতই ভুলিতে চাই, তত পড়ে মনে। (৭।৩১)

এর একমাত্র সমাধান পাওয়া গেল কবির অন্তর্লোকেই। আত্মবিভোর কবির গভীর আত্মমগ্নতায় তার সমাধান। কবি তাই বলেন—

চলিলাম খোলা প্রাণে সে কমল কাননে,
দেখিগে যোগেন্দ্রবালা যোগ-ভোলা নয়নে। (৩৩)

আসনদাত্রী দেবীর রূপত্রয়ী—শশিকলা, স্থির সৌদামিনী আর বীণা বর্ণিত হয়েছে অষ্টম সর্গে। এ সবই নিখিল সৌন্দর্যের বিভিন্ন রূপ মাত্র। বিশ্বে একই সৌন্দর্যলক্ষ্মীর বহু বিচিত্র প্রকাশ, অথবা বলা যায় বহির্বিশ্বে যে বিচিত্র সৌন্দর্যের বহুমুখী প্রকাশ কবির অন্তর্জগতে তারই একক মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা' কাব্যের বক্তব্য যেন ভিন্ন আধারে। 'জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে, তুমি বিচিত্ররূপিণী' আর 'অন্তরমাঝে তুমি শুধু একা একাকী তুমি অন্তর বাসিনী'।

সৌদামিনী সদাচঞ্চল। কলায় কলায় হ্রাস বৃদ্ধির মধ্যে তার সেই চাঞ্চল্য আর পরিবর্তনশীলতা। তার অনিন্দ্যরূপরাশি সে নিজেকে দর্শন করে আর পরিতৃপ্ত হয়। সেই সৌন্দর্যের ভাণ্ডার অপরের কাছে গুপ্তই থাকে—

আপনার রূপরাশি
আখে মেয়ে হাসি হাসি,
আননে লোচনে আহা আনন্দ ধরে না।
দিয়েছে তাহারে বিধি
কি যেন নূতন নিধি,
আখে সুখে আঁখি ভরি, দেখাতে চাহে না। (৮।৫)

এই রূপরাশি চর্মচক্ষু-গ্রাহ্য নয়, মনশ্চক্ষু দ্বারাই উপভোগ্য। কবি সেই পথেরই পথিক—

স্থির-সৌদামিনী কভু পড়েনি নয়নে,
আমি দেখেছি স্বপনে। (৮।৬)

প্রথমে চক্ষুগ্রাহ্য, দ্বিতীয়ে মনোগ্রাহ্য, আর সবশেষে শ্রুতিগ্রাহ্য সৌন্দর্যের বর্ণনা করেন কবি। সে শ্রুতিগ্রাহ্য মাধুর্য সঙ্গীতের মতই সমীরণের মর্মরধ্বনিতে, মেঘের মৃদঙ্গগর্জনে আর বর্ষণমুখর নিশীথিনীর নূপুরনিক্কণে শ্রুত হয়।

সৌন্দর্যের অনুভূতি মানসিক শক্তিসম্ভূত, কিন্তু বস্তুস্বরূপের সংস্পর্শে এসেই এই অনুভূতি জাগ্রত হয়। অষ্টম সর্গে এই বক্তব্যই নানাভাবে প্রকাশিত। সৌন্দর্যের প্রকারভেদটিও কবিমনে যে ভাবে ধরা দিয়েছে তার ইঙ্গিত কবিতা তিনটির নামকরণের মধ্যেই আছে। যে সৌন্দর্য দৃষ্টিনির্ভর ও প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল—'ভাসি ভাসি চলে যায়' তাকে হ্রাসবৃদ্ধির স্বভাবযুক্ত শশিকলার সঙ্গেই তুলনা করেছেন। কিন্তু সৌন্দর্যভিত্তিক যে অসীমানুভূতি অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত তা চক্ষুগ্রাহ্য নয়, তার পরিবর্তনশীলতা নাই। তাকে উদ্দেশ্য করে কবি বলেন, 'স্থির-সৌদামিনী কভু পড়েনি নয়নে, আমি দেখেছি স্বপনে।' শ্রুতি-

নির্ভর সৌন্দর্যের দিকটি 'বীণা' নামকরণের মধ্যে উদাহৃত। গীতপ্রিয় কবির কাছে সে সৌন্দর্য অনাহত ধ্বনির মত চির-প্রবহমাণ এবং চির-আস্বাদ্য। তিনি বলেন—

কিবা নিশা দিনমান,
প্রাণে লেগে আছে তান,
সুস্বপ্ন-সংগীতময়ী স্বরগের কাহিনী।
মধুর মধুর চির-পূর্ণিমা যামিনী! (৮৷১১)

'কিন্নর গীতি' শীর্ষক সমাপ্তিসঙ্গীতেও সেই বক্তব্য। স্বপনরূপিণী সেই মায়াময়ীর সৌন্দর্য বিশ্বের অণুতে পরমাণুতে বিধৃত। তার রসাস্বাদন বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য যতখানি, অন্তরেন্দ্রিয়গ্রাহ্য তার চাইতে অনেক বেশী। কবি তাই ঐ পবিত্র রমণীর তিনটি রূপ ধ্যান করেন আপন অন্তরে।

'আসনদাত্রী দেবী' শীর্ষক নবম সর্গে কাদম্বরী দেবীর স্মৃতিচারণ। কাদম্বরী দেবীর জীবনচিত্র অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই অংকিত হয়েছে এ কবিতায়। এই রমণী যে ঠাকুরবাড়ীর প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ছিলেন, প্রধানত এঁরই উৎসাহে আর প্রেরণাদানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির সৃজনশীল প্রতিভা পথের সন্ধান লাভ করেছিল, এর অকপট স্বীকৃতি বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠায় আছে। কবির নিজের রচনা 'সারদামঙ্গল' সম্পর্কেও বক্তব্য সেই এক। সেই অসম্পূর্ণ কাব্যের পূর্ণাঙ্গতা কবি আনতে পেরেছিলেন প্রধানত কাদম্বরী দেবীরই প্রেরণায়। কবির সেই প্রিয় কাব্য সম্পর্কে অসঙ্কোচ স্বীকৃতি—

সাক্ষাৎ আমার প্রাণ
'সারদামঙ্গল' গান,
অসম্পূর্ণ পড়ে ছিল, যেন ম'রে গিয়েছে।
বে-সুরা বীণার মত
জানিনা কি দশা হ'ত,
তোমারি আদরে, দেবি, ফিরে প্রাণ পেয়েছে। (৯৷২)

সৃজনী প্রতিভাও অনুকূল পরিবেশ আর স্নেহ প্রেমের হৃদ্য এবং সঞ্জীবনী স্পর্শের অপেক্ষা রাখে। প্রতিভার যথাযথ বিকাশের পক্ষে এগুলির ভূমিকা বৃহৎ। শুধু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আর রবীন্দ্রনাথই নন, বিহারীলালও তাঁর সৃষ্টির জন্য এই মহীয়সী মহিলার কাছে ঋণী। বিহারীলালের কবিতায় তার সশ্রদ্ধ উল্লেখ—

সাহিত্য-সংসারে তুমি
সুকুমার ফুলভূমি
তোমার স্নেহের গুণে কতরকমের ফুল
ফুটে আছে থরে থরে ;
কেমন সৌরভ ভরে
সোহাগ সমীরে কিবে করিতেছে ঢুলু ঢুল। (৯৩)

কাদম্বরী দেবীর স্নেহের গুণে ফুটে ওঠা ফুলকুল যে কবিকুল সে বিষয়ে কোন পাঠকের সন্দেহ থাকে না। তাঁরই প্রেরণায় জ্যোতি-রিন্দ্রনাথের প্রতিভা বিকশিত হয়েছিল, এর মধ্যে অতিরঞ্জন নেই। সে কথা বিহারীলালও উল্লেখ করেছেন—

তোমার উৎসাহ-ধারা
বিচিত্র বিদ্যুৎ পারা,
কতই পরমানন্দে,
কতমত ছন্দবন্দে
কত ভাব ভঙ্গিমায়,
ইংরেজী ফরাসী কত বাঙ্গালায় বলেছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শিল্প ও সাহিত্যসৃষ্টিমূলক প্রতিভা কত বিচিত্র পথে প্রকাশিত হয়েছিল তার একটি সম্পূর্ণ তালিকা ডঃ সুশীল রায় প্রকাশ করেছেন।

একাধিক শক্তিমান স্রষ্টার প্রেরণাদাত্রী এই রমণীর আত্মাহুতির ফলে বিষাদের যে ছায়া নেমে এসেছে তার বর্ণনায় বিহারীলাল বলেন—

নিকুঞ্জ কাননে আর কোন পাখী ডাকে না।
ভাগীরথী তীর থেকে আর বাঁশী বাজে না।
মানস সরসে হায় পদ্ম ফুটে হাসে না।
স্বর্গের বীণার ধ্বনি ভেসে ভেসে আসে না।
এদেশে ভারতী দেবী বুঝি প্রাণে বাঁচে না। (৯।৫)

শোকগ্রস্ত কবির এই বর্ণনাটি মর্মস্পর্শী। 'ভারতী দেবী' এ ক্ষেত্রে দ্ব্যর্থক। সারস্বত আলোচনার ক্ষেত্র এই রমণীর তিরোধানে সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল একথাটিও যেমন ঠিক, তেমনি 'ভারতী' পত্রিকারও প্রাণহানির সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল। কাদম্বরীদেবীর মৃত্যুর পর দ্বিজেন্দ্রনাথ 'ভারতী'র সম্পাদকপদ ত্যাগ করলেন। 'তত্ত্ব-বোধিনী' পত্রিকার (জ্যৈষ্ঠ ১২৯১ সাল) একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হ'ল, 'ভারতী বিশেষ কারণে আর প্রকাশ হইবে না।'[৫] অনুমানে বাধা নেই, ঠাকুর পরিবারের এই আকস্মিক শোকাভিঘাতই 'ভারতী' পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করে দেবার অন্যতম কারণ ছিল সেদিন।

কবির স্মৃতিচারণপ্রসঙ্গে ঠাকুরবাড়ীর ছাদের ওপর সান্ধ্যকালীন 'সঙ্গীত ও সাহিত্য' আসরের কথা স্মরণ করেছেন। বলেছেন—

সেই প্রিয় মুখ সব, সেই প্রিয় নিকেতন,
সেই ছাদে তরুরাজি শূন্যে শোভে উপবন,
সেই জাল-ঘেরা-পাখী, সেই খুদে হরিণী,
সেই প্রাণ-খোলা গান, সেই মধু যামিনী,
কি যেন কি হয়ে গেছে!
কি যেন কি হারায়েছে!
কেন গো সেথায় যেতে কিছুতে সরে না মন? (৬)

সবই আছে তবু যেন কিছু নেই। প্রাণহীন দেহ, আনন্দহীন নিকেতন যখনি উল্লিখিত হয়, তখনি অনুভব করা যায় কাদম্বরীদেবী সমকালীন ঠাকুরপরিবারে কতখানি স্থান অধিকার করেছিলেন। এক একটি বিশেষ মানুষের অবর্তমানে যে শূন্যতা সৃজিত হয়, কোনক্রমেই তা

বোধহয় আর পূর্ণ হয় না। সে শূন্যতা পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু, ব্যক্তি আর ঘটনাকে অবলম্বন করে বারবার নিজেকে প্রকাশ করে। সেই অভাব মনের মধ্যে শুধু একটা সীমাহীন হাহাকার সৃষ্টি করে, স্মরণ করিয়ে দেয় যে মনোমন্দিরের আনন্দের বিগ্রহ নেই। যা যায় তা আর আসে না। শুধু হাহাকার-ঘেরা স্মৃতিটুকু নিয়ে অসহায় মানুষ মহাকালের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। বেদনায় মথিতহৃদয় মানুষ তখন সৃষ্টির মধ্যে অসঙ্গতি দেখে, আর দেখে স্রষ্টার অবিচার ও পক্ষপাতিত্ব। বিশ্ববিধানের মধ্যে সেই পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে অভিযোগ ধ্বনিত হয় কবিকণ্ঠে—

ওই যে সুন্দরী শশী
আলো করে আছে বসি।
চিরদিন হিমালয়,
কি সুন্দর জেগে রয়।
সুন্দরী জাহ্নবী চির বহে কলস্বনে;
সুন্দর মানব কেন,
গোলাপ কুসুম যেন—
ঝরে যায়, মরে যায় অতি অল্পক্ষণে। (৯।১১)

কিন্তু সীমিত শক্তির অধিকারী মানুষের সম্বল এই আর্তনাদ আর অশ্রুজল। কবি বিহারীলালের সেই অশ্রুতর্পণ—

ভোরের গানের মত,
ভোরের তারার মত,
মধুর সুন্দর মূর্তি ত্রিদিব-ললনা;
ভোরে ভোরে আসে, যায়,
কেহ নাহি দেখে তায়,
রেখে যায় কোমল কুসুমদলে
নির্মল দুয়েক ফোঁটা শিশিরাশ্রুকণা। (৯।১২)

মৃত্যুর বিরুদ্ধে অভিযোগ অর্থহীন। কারণ, সেতো জন্মের সঙ্গে এক

সূত্রেই গ্রথিত হয়েই আছে। কিন্তু যেখানে মৃত্যু স্বেচ্ছায় আলিঙ্গিত, আত্মাহুতি যে ক্ষেত্রে জীবনের আদি পর্বেই সংঘটিত, সেখানে বেদনা অপরিসীম। প্রিয়পরিজনের নিষ্ঠুরতা গৃহপরিবেশের প্রতিকূলতা যে এ আত্মাহুতির কারণ, কবির কাছে তা সন্দেহাতীত। কবির তাই সরব অনুযোগ—

সোনার প্রতিমা জলে কে দিলরে বিসর্জন?
কারো বাজিল না মনে,
বজ্রাঘাত ফুলবনে!
সাহিত্যসুখের তারা নিবে গেল কি কারণ? (৯।১০)

এ অনুযোগ যে মূলত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে তা অনায়াসেই অনুমেয়। বাংলা সাহিত্যে এ ধরণের অনুযোগের আরো সাক্ষ্য মেলে।

সম্পূর্ণ নবম সর্গটি কাদম্বরী দেবীর স্মৃতিতর্পণে অশ্রুসিক্ত। কবির স্বগত-ভাষণ যদি তাঁর কবিস্বরূপেরই দর্পণ হয়, তাহলে একথা স্বীকার করতেই হবে যে কবি বিহারীলাল বহুলাংশে কাদম্বরী দেবীরই সৃষ্টি— আর তাঁর তিরোধানে বিহারীলালের ব্যক্তিসত্তা এবং কবিসত্তা একই কালে বেদনাবিহ্বল। সেই বেদনা-বিহ্বল অন্তরের প্রকাশ 'সাধের আসনে'র প্রতিটি ক্ষেত্রেই সুস্পষ্ট। একদিকে কৃতজ্ঞতা অন্যদিকে শ্রদ্ধা এবং স্নেহ—এই ত্রিবেণীসংগমে কবি বিহারীলাল কাদম্বরী দেবীর স্মৃতিতর্পণ করেছেন। বাংলা কাব্যধারায় এ সৃষ্টি অদ্বিতীয়।

দশম সর্গটি 'পতিব্রতা' রূপে চিহ্নিত। এই পতিব্রতা আজ মর্ত্যমানবী নন। পঞ্চভূতে গঠিত মরদেহধারিণী নারী নন। ইনি আদর্শায়িত প্রেম ও মঙ্গলময়তার সংমিশ্রিত মূর্তি। ইনি কায়াহীন মায়া, বিশেষের অতীত নির্বিশেষ প্রেম ও সৌন্দর্যের প্রতীক। লৌকিক জগত পরিত্যাগ করেও এই শুদ্ধান্তঃকরণের অধিকারিণী নারী তাঁর প্রিয় পরিজনকে আপন প্রভাবে রক্ষা করেন। তাঁর অলৌকিক শক্তি রক্ষাকবচের মত সারাক্ষণ ঘিরে থাকে তাঁর আপনজনদের।

লোকান্তরিতা পত্নীর জন্য স্বামীর অনুতাপও আজ সীমাহীন। তাঁর বেদনা-মথিত দীর্ঘশ্বাস চঞ্চলা প্রকৃতিকেও নিস্তব্ধ করে দেয়। হতভাগ্য স্বামী—

সে অবধি স্বপ্ন প্রায়
সদাই দেখিতে পায়
পত্নীর করুণ ছায়া বেড়াইছে কাছে কাছে,
চারিদিকে মৃদুমন্দ
অপূর্ব ফুলের গন্ধ,
করুণ নয়ন দুটি মুখপানে চেয়ে আছে। (১০১৪)

কবি তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন—

তুমি প্রভাতের উষা
স্বর্গের ললাট ভূষা,
ব্রহ্মার মানসসরে প্রফুল্ল নলিনী গো! (১০১৭)

কিন্তু মাঝে মাঝেই একটা বেদনাবোধ কবিকে সচকিত করে তোলে। কবির পক্ষে যেন বিস্মৃত হওয়া দুষ্কর যে গভীর অভিমানবশেই এই পতিব্রতা মহিলা আত্মবিসর্জন দিয়েছেন। কবিকণ্ঠে তাই বারে বারেই ধ্বনিত হয়—

কে ছিঁড়েছে আশালতা? কি মানে মানিনী গো? (১০১৭)

কবির এই অভিযোগ ক্রমশ ব্যাপকতালাভ করে। সাধারণ ভাবে তখন সমগ্র পুরুষ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধেই সরব হয়ে ওঠেন কবি, বলেন—

এসনা ধরায় আর, এসনা ধরায়!
পুরুষ কিম্ভূতমতি চেনে না তোমায়।
মনঃপ্রাণ যৌবন—
কি দিয়া পাইবে মন!
পশুর মতন এরা নিতুই নতুন চায়।
এসনা ধরায়। (১০১৯)

যে নারী পবিত্র প্রেমের আধার, যাঁর মধ্য দিয়ে এ পৃথিবীতে ভাগবত আশীর্বাদের ধারা প্রবাহিত হয়ে আসে, যাঁকে পুণ্যাত্মারাও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, সেই নারীর প্রতি 'কুরসিক পুরুষের কি ঘোর চাহনি'। অতএব—

যাও মা অমরাবতী, এসনা ধরায়!
আর এসনা ধরায়! (১০।১১)

এইসব স্নেহ-প্রেমময়ী নারীদের কাছে কবির প্রার্থনা—

দুর্বহ প্রেমের ভার—
যদিনা বহিতে পার—
ঢেলে দাও আকাশে, বাতাসে, ধরাতলে। (১০।১২)

নারীর যে অনন্ত প্রেম বিশেষ মানবমুখী ছিল, তাকে সমগ্র বিশ্বের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার প্রার্থনা জানালেন কবি। কবির দৃঢ় বিশ্বাস ভূমার মধ্যেই সে প্রেমের যথার্থ সার্থকতা।

'সাধের আসন' কাব্যগ্রন্থের 'উপসংহার' অংশে একটি কবিতা, একটি শোকসংগীত ও একটি শান্তিগীতি সংকলিত আছে।

প্রথম কবিতাটিতে 'সাধের আসন' কাব্যরচনার কারণ বর্ণিত হয়েছে। এখানে সেই প্রিয় ঘটনাটিকে পুনরায় স্মরণ করেছেন কবি, বলেছেন—

আহা সেই দেবী সুলোচনা,
'সারদামঙ্গল' গানে প্রসন্ন আননা,
বাড়ায়ে কোমল পাণি,
সাধের আসন খানি
পাতিলেন, সুধালেন বসায়ে আমায়
নিমগন মনে আমি ধেয়াই কাহায়? (৪)

আসনদাত্রী দেবীর প্রশ্ন মনে রেখে তার উত্তর রচনায় বিলম্ব ঘটল, ইত্যবসরে ঘটল বিপর্যয়। কাদম্বরী দেবী আত্মাহুতি দিলেন। আজ তাঁর প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত, কিন্তু—

হায় তিনি কোথায় এখন,
অস্তগত তারার মতন।
এতক্ষণ বরাবর
করিলাম প্রশ্নোত্তর।
দেখাতে ধ্যানের রূপ,
রচিলাম প্রতিরূপ,
শূন্যে যেন ইন্দ্রধনু
কান্ত, সুজীবন্ত তনু,
পরালেম আবরি আনন
কল্পনার বিশদ বসন।
এ অবগুণ্ঠন মাঝে
না জানি কেমন রাজে,
কেমন সুন্দর সাজে,
কার মুখে করিব শ্রবণ!
হায়, তিনি কোথায় এখন। (৫)

কবির আনন্দ, তিনি প্রতিশ্রুতি পালনে সক্ষম হয়েছেন। প্রশ্ন-কর্ত্রী আজ নেই। তাঁর উদ্দেশ্যে রচিত উত্তরবঙ্গের পাঠকসম্প্রদায় হয়ত 'করি অনুরাগ স্নেহ' পাঠ বা শ্রবণ করবেই না। তবু কিন্তু দুঃখ নেই কবির মনে।

তিনি বলেন—

প্রাণ খুলে ধরিয়াছি গান,
আপনার জুড়াইতে প্রাণ,
গাহিতে তোমার গুণগান
করিতে তাঁহার স্তুতি, যাঁরে করি ধ্যান। (৮)

এখন কবির প্রশ্ন শুধু সেই প্রশ্নকর্ত্রীরই কাছে—

শূন্য করি বঙ্গভূমি
কোথায় রয়েছ তুমি?

বসি কোন দিব্য লোকে
চিরপূর্ণ চন্দ্রালোকে
শ্রোত্রপুটে করিতেছ পান ?
আমার এ হৃদয়ের গান। (৮)

শোকসংগীতের উপসংহার অংশে আবার সেই ভাববৃত্তের প্রারম্ভবিন্দুতে প্রত্যাবর্তন। কবির জীবনদর্শনের প্রতিফলন গভীর অর্থদ্যোতক ছত্রচতুষ্টয়ে—

প্রেয়সীর ঢল ঢল বিকশিত আননে,
দেখিগে যোগেন্দ্রবালা যোগভোলা নয়নে।
প্রেমের প্রসন্ন মুখ, সারদার স্তোত্রগান,
এ জগতে এই দুই আছে জুড়াবার স্থান!

কবির দ্বিতীয়া পত্নী কাদম্বরী দেবী এবং লোকান্তরিত এককালের ভক্তপাঠিকা কাদম্বরী দেবীর নামগত ঐক্য আত্মমগ্ন কবির চিত্তকে একটি অপূর্ব উপলব্ধির ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ করেছে। উপলব্ধি বিশেষের আধারে নির্বিশেষের ব্যঞ্জনায় অনুরঞ্জিত।

এই অনুভবেই বিহারীলালের কাব্যমূল্য স্বীকৃত। কবির বৈশিষ্ট্যচিহ্নিত ক্ষেত্র সেইটি। রসজ্ঞ সমালোচকের একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তিনি বলেছেন, 'এই কবি কবিজনোচিত গীত না গাইতেন, না গাইয়াছিলেন, এমন নয়, আত্মভাবে বিভোর হইয়া, বিগলিত ও বিমোহিত হইয়া ইনি আপন মনে আপনি গাইতেন। সে গান মিষ্ট ও মহান বটে, কিন্তু গান অপেক্ষা ধ্যানই অধিক পরিমাণে ব্যয়িত হইয়াছিল, পরন্তু গান অপেক্ষা ধ্যানেই ইহার বিশেষত্ব ও ব্যক্তিত্ব অধিকতর অনুভবনীয়।'[৬] নিজের কাব্য সম্পর্কে স্বয়ং কবিরও উক্তি তাই, 'দেখাতে ধ্যানের রূপ রচিলাম প্রতিরূপ'।

সব শেষে 'শান্তি গীতি' রূপে যেটি সংযোজিত সেটি 'বাউল বিংশতি'র দ্বাদশ সংখ্যক গীত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'সাধের আসন' কাব্যগ্রন্থের দশম সর্গের দ্বাদশ স্তবকটি 'নিশীথ সঙ্গীতে'র (শরৎকাল) দ্বাত্রিংশতি সংখ্যক স্তবকের অনুরূপ।

ছন্দোবিচারে কবি 'সাধের আসনে' অক্ষরমাত্রিক কিন্তু অসম পার্বিক ছত্র ব্যবহার করেছেন। এমনকি স্তবকগঠনেও ছত্রসংখ্যার সমতা নেই। কাব্যের সূত্রপাতে কবি ৮,৭ পর্বের ১৫ মাত্রার তিনটি ছত্র, আর তার মধ্যে ৮ মাত্রার এক-পার্বিক ক্ষুদ্রায়তন তিনটি ছত্র ব্যবহার করেছেন। কিন্তু স্তবকগঠনে কোথাও একটি বিশেষ রীতি অনুসৃত হয়নি। এমনকি দীর্ঘ ছত্রগুলি কোথাও আট মাত্রার দুটি করে পর্বের দ্বারা গঠিত হয়েছে। তবে 'সাধের আসনে' ৮ মাত্রারই পর্ব-প্রাধান্য। এখানে ক্রমে ভাষা অনেক বেশী কাব্যধর্মী আর সুষমা-মণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

বিহারীলালের প্রেমভাবনার চরিত্র প্লেটোনিক কিনা এ প্রশ্ন আমাদের বিবেচ্য ছিল। আমরা বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ বিশ্লেষণপ্রসঙ্গে দেখেছি যে কবির প্রেমচিন্তা নির্বিশেষ হবার সাধনায় উত্তীর্ণ হয়েও বারে বারে বিশেষের আধারে প্রত্যাবর্তন করেছে। বিহারীলাল ইন্দ্রিয়-সুখ-প্রয়াসী; কিন্তু ইন্দ্রিয়-সর্বস্ব নয় তাঁর ভোগচিন্তা। কবি তাই কল্যাণধর্মকে আশ্রয় করেই অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে কবি-মানসী ও সৃষ্টির মূলীভূত প্রেরণাদাত্রীকে অক্ষয় মূর্তিতে পরিণত করেছেন। যিনি যোগেন্দ্রবালা ছিলেন, যিনি বাল্মীকি আর কালিদাসের প্রেরণাদাত্রী ছিলেন, তাঁরা সব এক আর অভিন্ন হয়ে 'আসনদাত্রী'কে আশ্রয় করেই যেন কবিপ্রেয়সীতে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। সমগ্রভাবে কাব্যপরিকল্পনার ধারাটি চিন্তা করলে কবি বিহারলালের মৌলিকতা এবং কবিকৃতি সম্পর্কে কোন প্রকার দ্বিধার অবকাশ থকে না।

উল্লেখপঞ্জী

(১) প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়: রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংস্করণ পৃঃ ৬৮

(২) শশিভূষণ দাশগুপ্ত: বাংলা সাহিত্যের নবযুগ, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পৃঃ ২৭১

(৩) জগদীশ ভট্টাচার্য: কবিমানসী, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ৪৩
(৪) সুশীল রায়: জ্যোতিরিন্দ্র নাথ: ১ম সংস্করণ, পৃঃ ২২৭-৭৪
(৫) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়: রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ১৯১
(৬) সমালোচনা সাহিত্য: সম্পাদক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রফুল্লচন্দ্র পাল, ২য় সংস্করণ, (কবি বিহারীলাল) পৃঃ ২১৬

॥ ১২ ॥

কবি বিহারীলালের রচনাবৈচিত্র্য সম্পর্কে আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকে তাঁর গদ্যরচনা 'স্বপ্নদর্শন' সম্পর্কে নীরব থাকলে। এটি কাব্য নয়। তবু আমাদের আলোচ্য। কালবিচারে এটি কাব্যগুলির অগ্রজ। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এই রচনাটি প্রকাশিত হয়। শ্রদ্ধেয় ভূদেব চৌধুরী এটিকে 'গদ্যরূপক কাব্য' বলে অভিহিত করেছেন।[১] আচার্য সুকুমার সেনের মতে এটি 'গদ্য নিবন্ধ'।

'স্বপ্নদর্শন' রূপকাশ্রিত গদ্য। স্বদেশচিন্তায় কাতর কবির নিদ্রাবেশে বঙ্গদেশের তদানীন্তন দুরবস্থার চিত্রদর্শনই এই গদ্যরচনার বিষয়। কবিকল্পনার সূচনাকার্যে এ জাতীয় রচনার মূল্য অপরিসীম।

নিদ্রিত অবস্থায় রোরুদ্যমানা বঙ্গমাতার দর্শনমুহূর্ত থেকে কবির বর্ণনা শুরু। কবি দেশ-মাতৃকার ক্রন্দনের কারণ জানতে চাইলে তিনি কারণ হিসেবে দেশের শস্যহানি ও মহামারীর প্রকোপে দেশবাসীর দুরবস্থাটি নির্দেশ করলেন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে মানুষের যে পরিমাণ দুঃখভোগ হয়েছিল, দেশমাতৃকার মতে এবারের দুঃখকষ্ট নাকি তার চাইতে অনেক অনেক বেশী হবে। প্রকৃতপক্ষে সেই চিন্তাই তাঁকে কাতর করেছে। এর পর কবি আর দেশলক্ষ্মীর মধ্যে কথোপকথন এবং তারপর দেশের দুরবস্থার চিত্রদর্শনে কবির হৃদয়বেদনা বর্ণিত হয়েছে এই গদ্যরচনায়।

এই রচনার মধ্যে 'বঙ্গদেশের ভাবীপথ' বলে ভবিষ্যৎবর্ণনা প্রসঙ্গে দেশের প্রতি কবির প্রগাঢ় আকর্ষণটি অনায়াসে অনুভব করা যায়। এই স্বদেশানুরাগ স্বদেশের দুঃখচিন্তায় কাতর এবং উন্নতিচিন্তায় তৎপর। কীভাবে দেশের দুঃখ দূর করা যায়, তার পথনির্দেশও রচনাটির মধ্যে বর্তমান। যে সব কথা কবি এই প্রবন্ধে বলেছেন, সে সব কথা শতাধিক বছর পরেও সমভাবে বর্তমান ভারতবর্ষ সম্বন্ধে

প্রযোজ্য। ব্যবসায়ীদের দ্বারা দেশের সমূহ অমঙ্গলসাধন সেকালেও ঘটেছে। তা থেকে মুক্তিলাভের জন্য কবি দেশবাসীর ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করেছেন। যাঁরা ধনী তাঁরা ইংরেজ প্রভুদের তুষ্টিসাধনে তৎপর। স্বদেশানুরাগ তাঁদের নেই বললেই হয়। অতএব মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় যদি দেশহিতে ব্রতী না হন তাহলে জনসাধারণের দুঃখমোচন সম্ভব নয়।

এই প্রবন্ধের মধ্যে কবির ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গীর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে। কবির ধর্মমত আবেগপ্রবণতা পরিহার করে যুক্তিমার্গ অবলম্বন করেছিল। ধর্মের নামে প্রচারধর্মী ক্রিয়াকর্মের বাহুল্যকে তিনি নিন্দা করে বলেছেন, যারা 'কেবল বাহিরেই কুঁড়োজালি ও নামাবলী ধারণ করিয়া আপনাকে ধার্মিক, জ্ঞানবান ও বিজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দিতে ব্যগ্র রহিয়াছে' তারা কখনও দেশবাসীর দুঃখ দূর করবার জন্য যত্নবান হয়না, তাদের ধর্মকর্ম কেবল 'বাহ্যিক আড়ম্বর মাত্র'। কবির মতে ধর্ম আর পরোপকারবৃত্তি সমার্থক। মানুষের মঙ্গলচিন্তা আর ঐকান্তিক আগ্রহ নিয়ে পরোপকারব্রতে রত হওয়াই প্রকৃত ধর্ম। বিহারীলালের কাব্য আলোচনাপ্রসঙ্গে ইতিপূর্বেই এই ধর্মচিন্তার উল্লেখ করা হয়েছে। কবির জীবনী থেকে পাওয়া যায় যে পাশ্চাত্য দর্শন, বিশেষ করে কোঁতের মতবাদ আলোচনার ফলে, কবির ধর্ম ও সমাজচিন্তা গভীরভাব প্রভাবিত হয়েছিল। এই ধর্মীয় চিন্তার কেন্দ্রে ছিল মানবতাবাদ বা পরোপচিকীর্ষা। কোঁতের পরোপকারমূলক ধর্মমতকে স্পেন্সার Religion না বলে Ecstatic Philanthropy বলতে চেয়েছিলেন।[২] সে যাই হোক, কোঁতের ধর্মীয় চিন্তার মৌলিকতা কবিকে বিশেষভাবেই প্রভাবিত করেছিল। এই গদ্যনিবন্ধের মধ্যেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

সহস্র সহস্র বিশ্বাসঘাতকতা ও লক্ষ লক্ষ প্রতারণার সাহায্যে যারা 'পরিপক্ক ব্যবসায়ী' তারা দেশের দুঃখদুর্দশার দিকে লক্ষ্য করে না। তারা 'বড় যুড়িতে বড় বড় ভুঁড়ি' দেখিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তাদের

উদ্দেশ্যে কবির সাবধানবাণীটি লক্ষণীয়। তিনি বলেছেন, 'হাঁ, মেঘাড়ম্বরে তোমাদের কিছুমাত্র শংকা নাই বটে, কিন্তু যখন চতুর্দিকে ভয়ানক বজ্র তীব্রবেগে নিপতিত হইতে থাকিবেক, তখন অবশ্যই তোমরা পর্যন্ত আহত হইয়া বিলুণ্ঠিত হইবে ; যখন দশদিকে দুর্ভিক্ষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবেক, তখন অবশ্যই তোমরা দগ্ধ হইতে থাকিবে।' অসম্ভব নয়, এই সামাজিক বিপ্লবের ইতিহাস কবির স্মৃতিপথে উদিত হয়েছিল। সমকালীন বাবুসমাজের বিরুদ্ধেও কবির নিন্দাবাদ অশ্রুত নয়। তাঁরা 'শ্বেতাঙ্গদিগের সম্মুখে চাঁদায় নাম স্বাক্ষর করেন' কিন্তু জনসাধারণের দুঃখ তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। এই 'দাতাবাবুদিগের দয়ানদী কতদূর প্রবাহিত ও বিস্তৃত' তা কবির অজ্ঞাত নয়।

প্রসঙ্গক্রমে দরিদ্র জনসাধারণের উপর শাসক সম্প্রদায়ের অমানুষিক অত্যাচারের কথাও কবি উল্লেখ করেছেন। সেই অত্যাচারী সম্প্রদায়ের কাছে বঙ্গদেশীয় নরনারীর জীবন, এমনকি মানসম্মানও যে মূল্যহীন ছিল তার বেদনাপূর্ণ উল্লেখ আছে রচনার মধ্যে। সমকালীন বঙ্গসমাজের এই অসহায় অবস্থা ও ব্যথাবেদনা কবিকে কী পরিমাণে অভিভূত করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় নিম্নলিখিত ছত্রগুলিতে।

'হা, এখন আর কিছুই নাই। আর স্বভাবের প্রলয়মূর্তি দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। আর মানবেরা কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতেছেন না, আর বিহঙ্গেরা কলরব করিতেছে না, সকলি থামিয়া গিয়াছে। সকল দিকই ভয়ানক নিস্তব্ধ। আহা! যে সকল প্রান্তরে কিষানেরা গান গাইতে গাইতে হল চালনা করিত, সেই সকল প্রান্তর অস্থিপুঞ্জে ধবলীকৃত হইয়া অতি খেদময় দর্শন ধারণ করিয়াছে। ভবন সকল হাঁ হাঁ করিতেছে। কি ভ্রূভঙ্গ সদৃশ তরঙ্গবাহিনী তরঙ্গিণী, কি নানাবর্ণ বিভূষিণী, নীরদশ্রেণী, কি নির্মল জলপূর্ণ জলাশয়, কি শিখরশোভিত পর্বতমালা, সকলই বিরূপ ভাবাপন্ন। সকলই যেন বিপদে বিষণ্ণ রহিয়াছে। প্রকৃতিদেবী যেন শোকবসনে অবগুণ্ঠিত হইয়া

অশ্রুজলে ভাসিয়া যাইতেছেন। দিবাকর সহস্র কর বর্ষণ করিয়া প্রকৃষ্ট আলোক প্রদান করিলেও চতুর্দিক যেন তমঃসাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। হা, দেশের দুর্দশা দেখিয়া খেদ করে এমন একটিও প্রাণী বিদ্যমান নাই, কেবল নিরানন্দ চতুর্দিকে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে।'

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে, কবিদের রচিত গদ্যও কাব্যিক সুষমা লাভ করে। বাংলা সাহিত্যের মধ্যে এর উদাহরণ সুপ্রচুর। বিহারীলালের অন্তরের মধ্যে যখন কাব্যধারার উৎসমুখ সৃজিত হচ্ছে, তখনই তাঁর সৃজনীপ্রতিভা গদ্যভঙ্গীতে আত্মপ্রকাশ করল। বিহারীলালের গদ্যভঙ্গীতে অক্ষয়কুমার দত্তের 'স্বপ্নদর্শন' জাতীয় রচনার প্রভাব সুস্পষ্ট।

'সাহিত্য সাধক চরিতমালা'য় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ১২৭১ সালের ১৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে লেখা বিহারীলালের একটি পত্র প্রকাশিত হয়েছে। ইতিমধ্যে 'সঙ্গীত শতক' প্রকাশিত হয়েছে, আর তাকে কেন্দ্র করে দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিহারীলালের মৈত্রীবন্ধনও স্থাপিত হয়েছে। এই পত্রে অন্যান্য কথার পর এই প্রবন্ধটির উল্লেখ আছে। কবি এই প্রবন্ধ আর কিছু কবিতা পাঠিয়েছেন বন্ধুকে। প্রবন্ধ সম্বন্ধে নিজে বলেছেন 'আমার সে সময়ের কাঁচা গদ্য এ সময় পাঠ করিতে তোমার অবশ্যই অরুচি জন্মিবে। ইহার শেষ প্রস্তাবের মধ্যস্থল অতিশয় অসংলগ্ন; 'স্বপ্নদর্শনে'র স্থানে স্থানে নিতান্ত অহৃদয়তা, বালকতা প্রকাশ পাইয়াছে। তথাপি তুমি যদি বন্ধুর বস্তু বলিয়া আদর কর, চারিপাঁচ বছর পূর্বে আমার ধর্মের ভাব যেরূপ ছিল, অনেক বুঝিতে পারিবে, এবং তাহা হইলেই আমার গদ্য প্রেরণের প্রধান উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল।'[৩] 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় কবির এই 'স্বপ্নদর্শন' রচনাটি অভিনন্দিত হয়েছিল, এবং রচয়িতা যে 'একজন প্রধান লেখকরূপে পরিগণিত হইবেন' সে ভবিষ্যৎবাণীও করা হয়েছিল।[৪]

বিহারীলালের গদ্যরচনার কারণ দুর্লক্ষ্য নয়। ১৮৫৮ সালে

বিহারীলালের পক্ষে সম্ভব ছিল একমাত্র ঈশ্বরগুপ্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁরই পন্থানুসরণ। ঈশ্বরগুপ্ত গদ্যে আর পদ্যে সব্যসাচীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর গদ্য রচনায় যে প্রগতিশীল মনোভঙ্গীর পরিচয় দেখা গিয়েছিল তা কিন্তু পদ্যে দেখা যায়নি। পদ্যরচনার ক্ষেত্রে গুপ্তকবি মূলতঃ রক্ষণশীল প্রাচীন কাব্যাদর্শের অনুবর্তী। বিষয় নির্বাচনে যে বৈচিত্র্য তিনি প্রদর্শন করেছিলেন, সে ক্ষেত্রে অবশ্য প্রাচীন ও নবীন দুই পন্থার প্রতিই তাঁর অনুরাগ প্রকাশিত। যাইহোক, বিহারীলাল যে ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যজগত থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করলেও পরে গভীরতার দিক থেকে গুরুকে অতিক্রম করেছিলেন, এ আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখেনা। রঙ্গলাল তখনো কাব্যের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়ে স্বীয় মর্যাদার আসন অধিকার করেননি। যদিও ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দেই তিনি তাঁর 'পদ্মিনী' উপাখ্যান নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন।

বিহারীলালের গদ্যনিবন্ধটি আপন প্রতিভার জন্য পথ সন্ধানের উপায় হিসাবেই রচিত। ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য অক্ষয় কুমার দত্তের গদ্যধারা অনুসরণ করে নিবন্ধ রচনা করলেন বিহারীলাল, কিন্তু তাঁর স্বপ্নচারী মন তাতে তৃপ্তি পেল না। নিজের রচনাকে নিজেই অসংলগ্নতা আর অহৃদয়তার অভিযোগে অভিযুক্ত করলেন তিনি। শ্রেয় মনে হল রামনিধি গুপ্ত প্রমুখ গীতিকারদের পথ। নিধুবাবু আপন অগোচরেই অনাগত কালের জন্য পথনির্মাণ করে চলেছিলেন। নিধুবাবুদের বাংলা গানের সূত্রে 'সঙ্গীত শতক'-হাতে কবি বিহারীলালের দর্শন পাওয়া গেল 'স্বপ্নদর্শন' প্রকাশের চারবছর পরে। সেই 'সঙ্গীত শতকে'র মধ্যেই পাওয়া গিয়েছিল কবি বিহারীলালের সমগ্র কাব্যের বীজ। হীরকখণ্ডের মত গানগুলির বিভিন্ন বর্ণচ্ছটায় কবির বহুমুখী কল্পনার পরিচয় অভ্রান্তভাবে প্রকাশিত।

'স্বপ্ন দর্শন' আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের একটি প্রশ্ন, এর নামকরণ কি কবিবন্ধু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রভাবিত করেছিল? 'স্বপ্নদর্শন'

আর 'স্বপ্নপ্রয়াণ' দুই বন্ধুর মত অচ্ছেদ্য বন্ধনেই যেন যুক্ত মনে হয়।

উল্লেখপঞ্জী

(১) ভূদেব চৌধুরী : বাংলাসাহিত্যের ইতিকথা, ২য় পর্যায়, (৩য় সংস্করণ) পৃঃ ৫৬৩

(২) বিপিন বিহারী গুপ্ত : পুরাতন প্রসঙ্গ, ২য়, বিশ্বভারতী সংস্করণ পৃঃ ৩৩৪-৩৫

(৩) সাহিত্য সাধক চরিতমালা : সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড, ৫ম সংস্করণ (বিহারীলাল) পৃঃ ২৮

(৪) ঐ ঐ ঐ পৃঃ ১৬

(গ) দক্ষতা প্রসঙ্গ—

'Many are called but few are chosen'—বাইবেলের এই কথাটিকে আমাদের বর্তমান আলোচনার ভূমিকা আর উপসংহার উভয় হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। উনিশ শতকের বাংলাদেশ সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করেছে। সাহিত্য, ধর্মনীতি, রাজনীতি—জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রেই ভারতবর্ষের ইতিহাস রচিত হয়েছে মূলত বাংলাদেশেই। নানাকারণে তদানীন্তন বঙ্গসমাজে যে মানসিক উর্বরতা আর ধারণাতীত কর্মপ্রবণতা দেখা দিয়েছিল, তার ফল আজও আমরা ভোগ করছি। কিন্তু সেই নির্মাণযজ্ঞে সেদিন যে বিপুল সংখ্যক নরনারী অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাগটি বিস্মৃত। সেখানে প্রতিটি অধ্যায়ে যে স্বল্পসংখ্যক মানুষকে আমরা আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি, তাঁরা আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। এই বৈশিষ্ট্য তাঁদের স্বকীয় ক্ষেত্রে দক্ষতারই প্রমাণ বহন করে। গ্রহণ-বর্জনের যে নীতি বিবর্তনধারায় অনুসৃত, সেখানে এই দক্ষতাই টিঁকে থাকার একমাত্র ছাড়পত্র। পৃথক করে দেখলেও, সাহিত্য ক্ষেত্রেও এ সত্য ব্যতিক্রমধর্মী নয়। সেখানেও এই দক্ষতা কালজয়ের একক ছাড়পত্র।

যে কোনো কবির ক্ষেত্রে এই দক্ষতা বহুদিক থেকেই বিচার্য, সেখানে সৃষ্টির প্রাচুর্য যেমন উদ্দিষ্ট, তেমনি উদ্দিষ্ট সৃষ্ট কাব্যের লাবণ্য আর আন্তরিকতা। প্রাচুর্য শব্দটি নিতান্তই আপেক্ষিক। কিন্তু এটুকু অনুমান করতে বাধা নেই যে আমরা কবি বা সাহিত্যিকের কাছে সেই পরিমাণ সৃষ্টির প্রত্যাশী যা দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে গিয়ে হারিয়ে যাবে না। তা যদি সমগ্র দেশের মনোভূমিকে উর্বর করে তোলার দায়িত্ব নাও নেয়, তৃষ্ণার্তকে পানীয় জোগানোর সীমিত

শক্তিটুকু যেন তার অক্ষুণ্ণ থাকে। এই প্রসঙ্গে এলিয়টের একটি আলোচনা আমাদের দুদিক থেকে সহায়তা করবে।

Minor আর Major poet নিয়ে আমাদের যে ধারণা তা খুব স্পষ্ট নয়। এই প্রসঙ্গ পূর্বেও স্বল্প পরিসরে আলোচিত হয়েছে। এলিয়টের বক্তব্যটির যে অংশটুকু এখানে প্রাসঙ্গিক তা হ'ল, তাঁর মতে এমন কিছু কবি আছেন যাঁদের কেবল মাত্র anthology বা কবিতাসংকলনে পাওয়া যায়। তাঁরা হয়তো দুএক খানাই ভালো কবিতা লিখেছেন আর যত কবিতাসংগ্রহ প্রকাশিত হোক, সেগুলিতে ওই কবিতাগুলো থাকবেই থাকবে। এঁরা Minor poet বলে পরিচিত হতে পারেন, কিন্তু এলিয়ট সাবধান করে দিয়েছেন, এই Minor শব্দটি কোনোক্রমেই অসম্মান-সূচক বিশেষণ নয়।

বিহারীলাল উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলনের মধ্যেই সীমিত নন। তাঁর রচনার পরিমাণ যে রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত অন্য কোন বাঙালী কবির চাইতে খুব কম নয়, একথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। সৃষ্টির প্রাচুর্যে কবির যেটুকু দক্ষতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, বিহারীলালের ক্ষেত্রে তা দুর্লক্ষ্য নয়। কিন্তু শুধুমাত্র পৃথুলতাই দক্ষতা নয়। তার সঙ্গে একই কালে অন্যান্য গুণাবলীও বিচার্য।

কাব্যদেহের লাবণ্যও কবির দক্ষতা প্রমাণিত করে। বাঙ্‌নির্মিতিকে আশ্রয় করে যে লাবণ্য আমাদের চোখে পড়ে বা অনুভূত হয় তা যে মূলত কবির প্রতীতিনির্ভর এই ধারণাটিকে এবার স্পষ্ট করে নিতে হয়। কাব্যদেহ আর তাকে আশ্রয় করে যে প্রতীতি অভিব্যক্ত, তা যে অবিভাজ্য এ নিয়ে আজ আর মতভেদ থাকার কথা নয়। কাব্যালোচনা আর রসাস্বাদনের যে ঐতিহ্য বাংলা সাহিত্যের আশ্রয়ে গড়ে উঠেছে, এ মতবাদ বহুদিন স্বীকৃত। কবির উপলব্ধি আর উপলব্ধি প্রকাশক বাণীভঙ্গীর মধ্যে একটা নিবিড় ঐক্য থাকে। আমরা যাকে উপলব্ধি বলছি তারও মাধ্যম ভাষা। সেই ভাষা-সম্পদেই যদি দৈন্য নিহিত থাকে, উপলব্ধির নিবিড়তা ক্ষুণ্ণ হতে

বাধা। এ মত ভাষাবিচার আর সাহিত্যতত্ত্ব উভয়ক্ষেত্রেই স্বীকৃত।

অতএব কবির এই প্রতীতি যদি পাঠকের অন্তরে সমান্তরাল অনুভূতি সৃজন করতে সমর্থ হয়, তাহলেই প্রমাণিত হয়ে যায় যে কাব্যদেহ সৌষ্ঠব আর লাবণ্যের অধিকারী। প্রতীতির অকৃত্রিমতা ও নিবিড়তাই সৌষ্ঠব আর লাবণ্য সৃষ্টি করে। 'যাঁহা যাঁহা অরুণ-চরণ চল চলই, তাঁহা তাঁহা থল-কমল-দল খলই'—এত সেই এক কথা। কৃষ্ণপ্রেমের গভীরতা শ্রীরাধার পদচারণায় যেন একটির পর একটি স্থলপদ্ম প্রস্ফুটিত করে চলেছে। কৃষ্ণপ্রেম, শ্রীরাধিকার চরণ যুগলের সৌন্দর্য আর পদচারণার সৌন্দর্য এই তিন একই সূত্রে গ্রথিত। আবার এক সূত্রে গ্রথিত বলেই এক্ষেত্রে দর্শক শ্রীকৃষ্ণের কাছে এত রমণীয় আর ভাবব্যঞ্জক।

বিহারীলালের কাব্যদেহ সম্পর্কে অভিযোগ আছে। এ অভিযোগ যে কাব্যের প্রতীতি-সংক্রান্ত অনুপপত্তি থেকেই সৃষ্টি, তা সহজেই অনুমেয়। অন্তত যে আলোচনা আমরা এ পর্যন্ত করেছি তারই ভিত্তিতে এ সম্বন্ধে কোন প্রকার অস্পষ্টতা আর থাকার কথা নয়।

কাব্যপ্রতীতি বা কাব্যসত্য যে তথ্যভিত্তিক হবেই, একথা কেউ বলেননি। আর তা হয়ও না। মিল্টনের 'প্যারাডাইস লষ্ট' পড়ার পর তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু, গণিতের অধ্যাপক মিল্টনের কাছে নাকি চিঠি লিখে জানতে চেয়েছিলেন, তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় কী। প্রকৃতপক্ষে কাব্য যেহেতু কোন কিছু প্রতিপাদনে সচেষ্ট নয়, তার মূল্য স্বমহিমায়। ইতিহাস, বিজ্ঞান আর দর্শনের সঙ্গে কাব্যের পার্থক্য ঐ একটি ক্ষেত্রে।

পরিদৃশ্যমান জল, স্থল, বা অন্তরীক্ষে যে দিব্য আলোক নেই, তারই মুহূর্তস্থায়ী উদ্ভাসনে কবির অন্তরে সত্যোপলব্ধি ঘটে। এ উদ্ভাসনের মৌল উপাদান কবিকল্পনা, কিন্তু উপলব্ধির আলম্বন আর

উদ্দীপন উপাদান জগৎ ও জীবন থেকেই সংগৃহীত। যে মুষ্টিমেয় কবি তাঁদের কাব্যসৃষ্টির ইতিহাস সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন, তাঁদের জীবন থেকে জানা গিয়েছে যে তাঁদের জীবনে ঐ উপলব্ধি ও তার কাব্যিক প্রকাশ ঘটেছে যুগপৎ। এর একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি অকল্পনীয়।

বিহারীলালের বক্তব্যও সমধর্মী। 'সারদামঙ্গল' কাব্যরচনার ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে দুটো কথাই স্পষ্ট করে লিখেছেন তিনি।

'সর্ব্বাদৌ প্রথম সর্গের প্রথম কবিতা হইতে চতুর্থ কবিতা পর্য্যন্ত রচনা করিয়া বাগেশ্রী রাগিণীতে পুনঃপুনঃ গান করিতে লাগিলাম, সময় শুক্লপক্ষের দ্বিপ্রহর রজনী, স্থান ছাদের উপর। গাহিতে গাহিতে সহসা বাল্মীকি মুনির পূর্ব্ববর্ত্তীকাল মনে উদয় হইল, তৎপরে বাল্মীকির কাল, তৎপরে কালিদাসের। এই ত্রিকালের ত্রিবিধ সরস্বতী-মূর্ত্তি রচনানন্তর আমার চির-আনন্দময়ী বিষাদিনী সারদা কখন স্পষ্ট, কখন অস্পষ্ট, কখন বা তিরোহিত ভাবে বিরাজ করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য যে, এই বিষাদময়ী মূর্ত্তির সহিত বিরহিত মৈত্রীপ্রীতির ম্লান করুণামূর্ত্তি মিশ্রিত হইয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। এখন বোধ করি বুঝিতে পারিলেন যে, আমি কোন উদ্দেশ্যেই সারদামঙ্গল লিখি নাই।'[২]

আমরা যে উদ্ভাসনসঞ্জাত সত্যোপলব্ধির কথা উল্লেখ করেছি, আর এ কাব্যের শাস্ত্রজাতীয় রচনার মত প্রতিপাদ্য বিষয় কিছুই নেই ব'লে আলোচনা করেছি, উপরের উদ্ধৃতিটিতে এ দু'য়েরই সমর্থন আছে।

এত কথা বলার পরও বলতে হয় যে কবির কাব্যরচনার আঙ্গিক-গত দুর্বলতা সর্বস্বীকৃত। কবির ভাবগভীরতা কোন কোন ক্ষেত্রে এই দুর্বল আঙ্গিকের জন্যই শিল্পনৈপুণ্যে প্রকাশিত হতে পারেনি। সেই দুর্বল অংশগুলি আবার বহুক্ষেত্রেই কবির নিবিড় ভাবনা চিন্তার ধারক। এই অংশগুলিতে ভাবের অনলংকৃত প্রকাশ দেখা গিয়েছে। তবু এ সব ক্ষেত্রে কবির অনবধানতা অবশ্য স্বীকার্য।

এবার আমরা দেখব কবি বিহারীলালের উপলব্ধির স্বরূপ। কিন্তু এই দায়িত্ব গ্রহণ করার পূর্বমুহূর্তেই স্মরণ করা উচিত, সাধারণভাবে কাব্যপাঠকের একটি অক্ষমতার কথা। কবিহৃদয়ে উদ্ভাসন ঘটে তাঁর কল্পনাশক্তির সাহায্যে আর সত্যোপলব্ধিতে তিনি উপনীত হন অনুভাবকতার সাহায্যে। ঐ অনুভাবকতা বিষয় এবং বিষয়ীকে এক করে দেয়। প্রকৃত পক্ষে অনুভব শব্দটির তাৎপর্যই ঐটি। যে ঐক্যসূত্র বিষয় আর বিষয়ীকে একাত্ম করে আর যে একাত্মতার ভাবঘন মুহূর্তে কাব্যের জন্ম, বহুল পরিমাণে সেই অনুভাবকতা কাব্য-পাঠকের অন্তরে না থাকলে কাব্যের রসাস্বাদন ব্যাহত হতে বাধ্য। স্রষ্টা ও পাঠকের মধ্যে একটি ভাবগত ঐক্য স্থাপিত হওয়া এ ক্ষেত্রে নিতান্তই প্রয়োজন। সহৃদয়তা যে কাব্যরসাস্বাদনের প্রধান অবলম্বন এ সত্য সর্বস্বীকৃত। এ যাঁদের নেই তাঁরা অরসিক বলে চিহ্নিত আর নিন্দিত।

বিহারীলালের কবিস্বরূপের মধ্যে প্রেম সৌন্দর্য ও সারস্বত চেতনা একীভূত। এই সারস্বত চেতনাকে সারদা-চেতনা বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটি অধ্যাত্মচেতনারই নামান্তর। এই চেতনার অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়া হলেও 'মৈত্রী ও প্রীতি-চেতনা' সম্পর্কে সংশয় প্রকাশিত হয়েছিল। আমরা মৈত্রীকে প্রেম ও প্রীতিকে সৌন্দর্যপ্রিয়তার সমার্থক বলে গ্রহণ করে এবং 'সারদামঙ্গল' কাব্যপাঠ প্রসঙ্গে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছি। বাস্তবিক পক্ষে, কবির যদি কোন একটি বক্তব্য সমগ্র রচনার মধ্যে প্রাধান্য পেয়ে থাকে, তা হ'ল প্রেম ও সৌন্দর্যপ্রীতি। এ দুয়ের সংযোগস্থলে অধিষ্ঠিতা দেবী সারদা, যিনি কবির কাব্যসৃষ্টির অন্তরালে অলৌকিক প্রেরণারূপিণী। এই ত্রয়ী পরিকল্পনা এমনি ঐক্যবদ্ধ যে এর একটিকে বর্জন করে অন্য দুটিকে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। প্রেমাস্পদের বিরহে কাতর কবি যেমনি বিশ্বসৌন্দর্যের প্রতি বীতরাগ, দেবী সারদার অনুপস্থিতির মুহূর্তেও তেমনি অমনোযোগী সবকিছুর প্রতি।

কবির কাব্যপ্রসঙ্গ উত্থাপনের দক্ষতা বিচার করতে গিয়ে বলা যায় যে এটি মূলত তাঁর ঐক্যবদ্ধ ভাবনানির্ভর। কাব্যরচনা ধারার আদ্যন্ত বিশ্লেষণ করে যদি দেখা যায় যে কবির ভাবনা একটি বিশেষ প্রতীতিনির্ভর ; বক্তব্য উপস্থাপনের উপাদানগত বিভিন্নতা সত্ত্বেও সেই প্রতীতির সামঞ্জস্য পূর্বাপর সুরক্ষিত, তাহলে এই শক্তিকে দক্ষতা বলে অবশ্যই চিহ্নিত করতে হয়। বিহারীলালের কাব্যপ্রসঙ্গ যে প্রতীতি বা অতীন্দ্রিয় সংবিতের আশ্রয়ে নির্মিত, তা হ'ল প্রেম ও সৌন্দর্যবাদের ঐক্য সঞ্জাত। আবার এই প্রতীতির ক্ষেত্রে কবির ব্যক্তিত্বচিহ্নিত বৈশিষ্ট্যও আছে। এই প্রতীতির কেন্দ্রে কবিপ্রেয়সী। একে কাব্যগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে ভাব থেকে রূপে প্রত্যাবর্তন বলেই উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্রেষ্ঠ কবিকর্মের মধ্যে এই যে অখণ্ড ঐক্যসূত্র, তার উপলব্ধি সশ্রদ্ধ কাব্যানুশীলনের অপেক্ষা রাখে। আমাদের মনে হয় অতি স্বল্পসংখ্যক কবি তাঁদের কাব্যধারার মধ্যে নিজেরাই এই ঐক্য সূত্রের সন্ধান পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'অন্তর্যামী' আর 'জীবন-দেবতা' শীর্ষক কবিতা দুটি সম্পর্কে বলতে গিয়ে এই 'অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্যের' উল্লেখ করেছেন।[৩]

কবি সমলোচক এলিয়টের বক্তব্য সমধর্মী। Shakespeare এর সমগ্র সৃষ্টির মধ্যেও এই unity বা ঐক্যকে তিনি আবিষ্কার করেছেন। বলেছেন : 'The whole of Shakerpeare's work is a poem।'[৪]

বিহারীলালের কবিকৃতিও যে অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্যমণ্ডিত সে বিষয়ে ভিন্নমত পোষণের অবকাশ নেই। 'সঙ্গীত শতক' থেকে যাত্রা শুরু করে 'সাধের আসনে' যখন পরিক্রমা সাঙ্গ হয়, তখন অনুভব করি একটি গভীর অর্থবহ অখণ্ড সঙ্গীতের প্রভাব। গীতযোগ্য কবিতার চারটি অংশ 'স্থায়ী', 'অন্তরা', সঞ্চারী' ও 'আভোগ' নামে চিহ্নিত। 'আভোগ' অংশের সর্বশেষ পঙ্‌ক্তির সঙ্গে স্থায়ীর সর্বপ্রথম পঙ্‌ক্তির

অন্ত্যানুপ্রাসটিকে সঙ্গীতজ্ঞরা 'আবর্তন' বলেন। যে কোন গীতি-যোগ্য কবিতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে গীতিকবির মূল বক্তব্যটি স্থায়ী অংশের মধ্যেই নিহিত। সেই বক্তব্য সম্পর্কে কিঞ্চিত বিশদ বর্ণনা অন্তরা আর সঞ্চারী অংশে করে নিয়ে, কবি যখন আভোগ অংশে উপস্থিত হন তখন তাঁর মূল বক্তব্য যেন সম্পূর্ণতা লাভ করে। এখানে এসে গীতিকবি তাঁর বক্তব্য প্রতিপাদন করে পরিতৃপ্ত। তাই এবার একটি অন্ত্যানুপ্রাসের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে তাঁর প্রত্যাবর্তন ঘটে স্থায়ীতে।

কবি বিহারীলালের কাব্যসম্ভারকে একটি গভীর অর্থবহ অখণ্ড সঙ্গীতের আকারে গ্রহণ করা উচিত। কখনো কাহিনী বর্ণনা, কখনো শোকবিহ্বল চিত্তের অশ্রুতর্পণ, কখনো কবিমনের বিচিত্র ভাবরাজির প্রকাশ, কখনো বা নিসর্গ বর্ণনা, কিন্তু সবকিছুর অন্তরালে সৌন্দর্য, প্রেম আর কাব্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী সারদার অচঞ্চল মূর্তি।

প্রকৃতপক্ষে দেবী সারদার মধ্যেই প্রেমচেতনা, সৌন্দর্যচেতনা আর সৃষ্টিপ্রেরণা মূর্ত হয়ে উঠেছে। আবার দেবী সারদা কাব্য-প্রেরণাদাত্রীর মর্ত্যকায়া পরিক্রমা সাঙ্গ করে, কবি প্রেয়সীর মধ্যে একাত্মতা লাভ করেছেন। অন্য দিক থেকে দেখলে কবি প্রেয়সীর মধ্যেই প্রেম চেতনা, সৌন্দর্য চেতনা আর সারস্বত চেতনা সমাহিত। এ যেন তিনে এক, একে তিন। এই ভাবত্রয়ীর ত্রিবেণীসঙ্গম স্মরণ করায় ভারতীয় ঐতিহ্যেরই কথা, যার মূলে এই 'তিন', ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, সত্ত্ব-রজ-তম, সত্য-শিব-সুন্দর আবার ব্যাস-বাল্মীকি-কলিদাসও বটে। ঊর্ধ্বমুখী ত্রিশূলের মত এই তিন কিন্তু সেই এক পরম ও চরম সত্যের দিকেই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার নির্দেশ বহন করছে।

'সঙ্গীত শতকে'র সূত্রপাতেই পাই কবির ঘোষণা, মূর্তিমতী সরস্বতীর কৃপা যদি কারও ওপর বর্ষিত হয়, তার জীবন থেকে শোক তাপ দূর হয়ে যায়। ঠিক তারপরের সঙ্গীতে মৈত্রী আর প্রীতির

প্রভাবে কবি যে সুখী তার সানন্দ স্বীকৃতি পাই। কিন্তু এই মৈত্রী আর প্রীতিকে কেন্দ্র করে কবির যে আদর্শ কল্পনা বাস্তবজীবনে তার সার্থকতা সম্ভব নয়। এখানেই কবির বেদনা। এই বেদনার অপূর্ব প্রকাশ 'সাধের আসন' কাব্যের মধ্যে। এ কাব্যের শেষকথা—একমাত্র প্রেমে আর স্বজনধর্মিতায় মানুষ সান্ত্বনা পেতে পারে, অন্য কোথাও নয়। যে সুখের গান দিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল, বেদনার আগুনে তার শোধন হ'ল। যাত্রা শেষে উপলব্ধিটি ঘোষিত হ'ল—প্রেম, প্রীতি আর সারদার কৃপা ছাড়া জীবন অর্থহীন। ইতিমধ্যে 'সারদা মঙ্গলে'র পূর্ববর্তী কাব্য-গ্রন্থগুলিতে কবিস্বরূপের পূর্বদিগন্তে দেবী সরস্বতীর যে সর্বপরিচিত মূর্তি দেখা দিয়েছিল তার রূপ পরিবর্তন ঘটল। 'সারদামঙ্গল'কে 'সাক্ষাৎ আমার প্রাণ' বলে বর্ণনা করেছেন কবি। এই কবিভাবনার মধ্যমণিরূপ কাব্যে সম্পূর্ণ মৌলিক এক মূর্তিতে দেবী সারদা আবির্ভূতা হলেন। কবিস্বরূপের মধ্যগগন যেন সেই সারদার উজ্জ্বল দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তারপর অন্ত্যপর্বে 'সাধের আসন' কাব্যগ্রন্থের পটভূমিতে সারদা কবিপ্রেয়সীর মধ্যে বিলীন হয়ে গেলেন। প্রেম, সৌন্দর্য আর সারদা-চেতনার ঐক্যবদ্ধ রূপ কখনো কখনো কবির মানসপট থেকে সাময়িকভাবে অন্তর্হিত হয়েছে। বিরহ বেদনায় কবিসত্তা আর্তনাদ করে উঠেছে। আবার পরক্ষণেই অতলস্পর্শী ধ্যানমগ্নতার মধ্যে এই বিরহ মিলনের তাৎপর্যটির উপলব্ধি হয়েছে। তাৎপর্যের এই অখণ্ডতা শুধুমাত্র কবির দক্ষতা প্রতিপাদক নয়, তাঁর প্রতিভার পরিচায়কও বটে।

'সারদামঙ্গল' কাব্যে দেবী সরস্বতীর ভাব বিবর্তনের মূর্তি যেভাবে অংকিত হয়েছে সেটিও কবির দক্ষতার ও মৌলিকতার অন্যতম প্রমাণ হিসেবে গ্রহণীয়। এখানে বাল্মীকির পূর্ববর্তীকাল, বাল্মীকি ও কালিদাসের কাল—এই ত্রিকালের ত্রিবিধমূর্তি কবি অঙ্কন করেছেন। এই পরিকল্পনায় দেবী সরস্বতীর ধ্রুবত্বই ঘোষিত হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন কবিকল্পনায় তাঁর রূপবিভিন্নতা অবশ্যই আছে, কিন্তু মূলত তিনি

যে 'বাগ বৈ সরস্বতী' বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী এবং 'বাচং ধেনুমুপাসীত' ধেনুর মত বাক্যের মাধ্যমে অভীষ্ট ফলদাত্রী. সেই পৌরাণিক মূর্তিটি অক্ষুণ্ণ থেকেছে বিহারীলালের বর্ণনায়।

ব্রহ্মার মানসকন্যা রূপে সরস্বতীর উল্লেখ 'সারদামঙ্গলে'র মধ্যেও আছে। কবি বলেছেন—

ব্রহ্মার মানস-সরে
ফুটে ঢলঢল করে
নীল জলে মনোহর সুবর্ণ-নলিনী,
পাদপদ্ম রাখি তায়
হাসি হাসি ভাসি যায়
ষোড়শী রূপসী বামা পূর্ণিমা যামিনী। (১।২১)

ঋগ্বেদের নদীরূপা সরস্বতী পরে বাক্‌ঋষির সঙ্গে একাত্ম হয়ে বাক্‌ই সরস্বতীরূপে পরিণত পুরাণে। তিনি ব্রহ্মার মানসকন্যা এবং পত্নীও বটে। ব্রহ্মা তাঁর মোহিনীমূর্তিতে মুগ্ধ হন আর তাঁকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। বিহারীলালের বর্ণনার মধ্যে সরস্বতীর মোহিনী মূর্তিটিও অপূর্ব দক্ষতায় চিহ্নিত হয়েছে। এক্ষেত্রে আবার এটিও লক্ষণীয় যে সারদার সঙ্গে সূক্ষ্মভাবে চণ্ডিকা আর কালিকার মূর্তি যুক্ত হয়েছে। বিহারীলালের আরাধ্যা কান্তি-স্বরূপিণী সারদা কিন্তু তন্ত্রোক্ত মূর্তি। তিনি যে বিশ্বের অন্তর্নিহিতা আদি শক্তি-স্বরূপিণী, সে বোধও কবির অবচেতন-মানসে ছিল। 'সারদামঙ্গলে'র মধ্যে এই কান্তি-স্বরূপিণী দেবীর গেরুয়াবসনা আর ত্রিশূলধারিণী মূর্তিটি দেখা গিয়েছে। হিন্দুর প্রাচীন শক্তিসাধনার আদর্শকে কাব্যের অঙ্গীভূত করে তাকেই কাব্যের প্রেরণাকেন্দ্রে স্থাপন করা বিশিষ্ট দক্ষতার পরিচায়ক।

কবির দক্ষতা সম্পর্কে আলোচনাপ্রসঙ্গে একটি বিশেষ ধারণার উল্লেখ আবশ্যিক মনে করি। সমস্ত কাব্যগ্রন্থ পাঠ ও আলোচনার পর স্পষ্টতই মনে হয় যে বিহারীলালের মধ্যে কবি ও সাধকসত্তার অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছিল। বিশ্বরহস্য সম্পর্কে কবি বারবারই

আকুলভাবে প্রশ্ন করেছেন। প্রশ্ন করেছেন প্রেরণাদাত্রী সারদার স্বরূপ সম্পর্কেও। সাধকসত্তা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মায়ার প্রকাশ লক্ষ্য করছে, আবার কবিসত্তা অনুভব করছে বিশ্বের অন্তর্নিহিত প্রেমপ্রীতি আর ভক্তির ধারাটিকে। জ্ঞান ও অনুভূতি, অনাসক্তি ও আসক্তি, রূঢ়বাস্তব ও মোহময় কল্পনার জগৎ অপূর্ব দক্ষতায় একসূত্রে গ্রথিত হয়েছে। কোথাও কোন অসঙ্গতি নেই। অসঙ্গতি নেই বটে, কিন্তু এর প্রকাশ বিধিবদ্ধ নয়। আলো অন্ধকারের পথে এই ভাবলোকে উত্তীর্ণ হওয়ার অভিসারযাত্রায় বেরোতে হয় পাঠককে। শ্রদ্ধাশীলা পাঠিকারও প্রশ্ন ছিল, 'কাহারে ধেয়াও ?' কিন্তু কবিই জানেন না তাঁর ধ্যানলোক-সমাসীনার নির্দিষ্ট মূর্তি কোন্‌টি? দেবীর না মানবীর ? বৈরাগ্যের না আসক্তির ? কিন্তু নির্দিষ্ট পাঠকের কাছে ধরা পড়ে, এরা অভেদাত্মা। ধ্যানমগ্ন কবির অন্তরে ঐ যুগলমূর্তি কোন এক আলোকোদ্ভাসিত লগ্নে একটি বিশেষ মূর্তিতে পরিণত হয়েছে। আপাতবিরোধিতার ছায়া অপসৃত হয়েছে সম্পূর্ণ ভাবেই।

বিহারীলালের কাব্যের কোথাও কোথাও অসংলগ্নতা বা পারম্পর্যহীনতার লক্ষণ দেখা যায়। কোন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি ভিন্ন বিষয়ে চলে গিয়েছেন বারে বারেই। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে যে তিনি বিভিন্ন বিষয় পরিক্রমা করে আবার বর্ণনীয় প্রসঙ্গেই প্রত্যাবর্তন করেছেন। অধ্যাপক বিশী এই প্রসঙ্গান্তর-পরিক্রমাকে কবির অস্থিরমতিত্ব বলে চিহ্নিত করেছেন।

সাধারণভাবে কাব্য-সমালোচকরা এ বিষয়ে একমত যে মন্ময়তা-মুখ্য কাব্যে তন্ময়তামুখ্য কাহিনীর পূর্বাপর সঙ্গতি আশা করা উচিত নয়। তন্ময়তামুখ্য কাহিনীর মূল অংশটিকে বলশালী করে তোলার জন্যও শাখাকাহিনীর প্রয়োজন হয়। বিহারীলালের যোগিসত্তা যখন কাব্য কবিতার আধারে আপন উপলব্ধি বর্ণনা করেন,তখন তার কাছে ঘটনার পারম্পর্য আশা করা উচিত নয়। তাছাড়া Coleridge যাকে Co-presence of thoughts and feelings বলেন কেউ কেউ

যাকে Sublime এবং ridiculous এর সমন্বয় বলে চিহ্নিত করেছেন; কাব্যের মধ্যে এইপ্রকার মিশ্রণ শক্তিমত্তারই পরিচায়ক। প্রথমত এই বৈপরীত্য মূল বক্তব্যকে অনেক বেশী মনোহর করে তোলে, দ্বিতীয়ত বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করার পরও মূল বক্তব্যে প্রত্যাবর্তনের মধ্যে কবির পরিণত প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। T. S. Eliot এর পাঠক মাত্রেই জানেন তাঁর কবিতার মধ্যে এই blending বা সংমিশ্রণ কতখানি সৌন্দর্য বিধায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিহারীলালের আপাত পারম্পর্যহীনতা তাঁর শক্তিমত্তারই পরিচায়ক। এটিও একটি বিরাট দক্ষতা।

চর্যার যুগ থেকেই প্রকৃতি বাংলা কাব্যের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপন করেছে। কিন্তু যুগভেদে তার রূপ ও ভাবভেদ ঘটেছে যথেষ্ট পরিমাণে। চর্যাপদগুলির মধ্যে প্রকৃতিকে ধর্মতত্ত্ব প্রকাশের বাহন হয়ে থাকতে হয়েছে। সেখানে নদ নদী, পাহাড় পর্বত, চন্দ্র সূর্য সবই আছে। কিন্তু তারা দেহসাধনার ইঙ্গিতবাহী। এর ফলে প্রকৃতি তার স্বাভাবিক ধর্ম থেকে বিচ্যুত। মঙ্গলকাব্যের মধ্যেও প্রকৃতির অবস্থা প্রায় একই রকম। সেখানেও সে আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত নয়। বৈষ্ণব পদগুলির মধ্যে তবুও কিছু পরিমাণে প্রকৃতি আপন স্বাভাবিকতা বজায় রাখতে পেরেছে। সুবর্ণচম্পক, অকলংক চন্দ্র, কিরণোজ্জ্বল সূর্য, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, শীত এরা কোথাও কোথাও প্রতীকের কাজ করলেও, বহু ক্ষেত্রে এরা রাধাকৃষ্ণের অপার্থিব প্রেমলীলার পটভূমি রচনা করেছে। চর্যাপদের যুগ থেকে শুরু করে ভাবতে গেলে বলা যায় যে বৈষ্ণবসাহিত্যেই প্রকৃতি কিছু পরিমাণে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে সর্বপ্রথম। এখানে সে কিন্তু মূলত উদ্দীপন বিভাবের কাজই করেছে। শাক্তপদাবলীর মধ্যে প্রকৃতি প্রায় অনুপস্থিত।

যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিকে আবার বাংলা কাব্য-ধারায় প্রত্যাবর্তন করতে দেখা গেল। কবি ঈশ্বরগুপ্ত নিসর্গমূলক কবিতা রচনা করলেন; কিন্তু আপন রুচি অনুযায়ী সেখানে তাঁর

কৌতুকরস পরিবেশনেরই প্রাধান্য লক্ষিত হোল। শুধু তাই নয়, প্রকৃতিবর্ণনায় যে মনোভঙ্গী প্রাধান্য পেল তা নিতান্তই তন্ময়তামুখ্য। মধুসূদনের আবির্ভাব ঘটল বাংলা কাব্য ধারায়। কিন্তু তাঁর স্বল্পপরিসর সাহিত্যসাধনার ক্ষেত্রে বাঙালী পাঠকের বহু আশাই অপূর্ণ থেকে গেল। তবু এরই মধ্যে বেশ কিছু আধুনিক চিন্তার প্রকাশ দেখা গেল। প্রকৃতি মহাকাব্যের পটভূমিতে উপযুক্ত মর্যাদাও যেমনি পেল, তেমনি চতুর্দশপদীর সীমিত আঙ্গিকের মধ্যেও পেল মন্ময়তার সুনিপুণ স্পর্শ।

ঠিক এর পরেই প্রকৃতিমূলক কবিতা নিয়ে বাংলাকাব্যের আসরে এসেছেন হেমচন্দ্র ও বিহারীলাল। হেমচন্দ্রের মধ্যে প্রকৃতি-তন্ময়তা দেখা গেল, কিন্তু তার সঙ্গে কবির সমমর্মিতার সন্ধান পাওয়া গেল না। এর ফলে স্বাভাবিক ভাবেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন বিহারীলাল। বিহারীলালের দক্ষতা এ ক্ষেত্রে বিতর্কাতীত। তাঁর প্রকৃতিপ্রাণতা এবং প্রকৃতিকে আপনার অনুভূতির রূপে রসে অভিসিঞ্চিত করে গ্রহণ করার দক্ষতা, কাব্যসৃষ্টির প্রথম পর্যায় থেকেই পাঠকের শ্রদ্ধা জাগ্রত করেছে।

কাব্যরচনার কাল-ক্রমিকতায় লক্ষ্য রেখে 'বন্ধুবিয়োগ' কাব্যকে প্রথম ও 'প্রেমপ্রবাহিণী' কাব্যকে দ্বিতীয় রচনা বলে নির্দেশ করা হয়েছে। এগুলি মুখ্যত আখ্যানমূলক কাব্য বলে চিহ্নিত হলেও এদের মধ্যে প্রকৃতিতন্ময়তা দেখা গিয়েছে।

প্রকৃতির প্রাণময় সত্তাকে মানবজীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করে তোলার সানুরাগ প্রয়াস বিহারীলালের মধ্যে সহজেই চোখে পড়ে। এই প্রয়াস যে একান্তই প্রাচ্যচেতনার অনুবর্তন তাতে সন্দেহ নেই। উপনিষদে বলা হয়েছে।

যো দেবাঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥

(শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্)

অগ্নি, জল, ওষধি, বনস্পতি—সবকিছুর মধ্যে স্রষ্টার লীলানুভব ভারতীয় ধর্মচেতনার প্রধান অংশ। প্রাচীন রামায়ণ থেকে কালিদাসের কাল অতিক্রম করে প্রকৃতিপ্রেমিকতার যে ঐতিহ্য বিহারীলাল পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে এসেছে, এর মধ্যে যুগপরিবর্তনজনিত কিছু কিছু দৃষ্টিপার্থক্য ঘটলেও চিন্তাগত পার্থক্য প্রায় কিছুই নেই বলা যায়। বিহারীলালের মধ্যে এই প্রকৃতিপ্রেম আপন স্বকীয়লক্ষণের বৈশিষ্ট্যে প্রকাশিত হ'ল। বাংলা কাব্যধারায় এ ভাবনার প্রবর্তক বিহারীলাল।

পাশ্চাত্ত্য কাব্যের ধারায় প্রকৃতি এসেছে সম্পূর্ণ পৃথক ভঙ্গীতে। মানবমনের সঙ্গে তার দূরবর্তিতাটুকু অক্ষুণ্ণ রেখেই যেন প্রকৃতি কাব্যের সীমায় প্রবেশ করেছে। প্রকৃতির রহস্য সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা আছে প্রচুর, কিন্তু তার সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য কবিদের সমপ্রাণতা নেই। ওখানে নবজাগরণের কল্যাণে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সর্বাধিক মূল্য অর্জন করল, আর এরই অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ প্রকৃতি-প্রীতি মানবপ্রীতির ঊর্ধ্বে কোন দিনই উঠতে পারল না। ভাবনৈকট্য যতই হোক না কেন প্রকৃতির সঙ্গে পরিপূর্ণ একাত্মতা অর্জন পাশ্চাত্ত্য কবির পক্ষে কখনোই সম্ভব হ'ল না। এ যে হ'ল না, এর জন্য দায়ী তাঁদের সংস্কার।

ভারতীয় সংস্কার পরম পুরুষকে বিশ্বপ্রকৃতির বৈচিত্র্যের মধ্যেই দর্শন করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। সে সংস্কার গড়ে উঠেছে, 'যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্' এই উপনিষদ্-চিন্তার আশ্রয়ে। আর সেই সংস্কারের উত্তরাধিকারী বিহারীলাল বলেন—

প্রকৃতি পবিত্র প্রেমে হইয়ে মগন,
হেরিবে হৃদয়ে প্রেমময় সনাতন।
দর দর আনন্দের বহে অশ্রুধারা,
স্থির হয়ে রবে দুটী নয়নের তারা;

(প্রেম-প্রবাহিণী, ৩য় সর্গ)

প্রকৃতিপ্রেম আর মানবপ্রেম কবি বিহারীলালের জীবনে সমার্থক। কবিত্ব উন্মেষের পূর্ববর্তীকালে 'প্রথম যখন ছিল বুদ্ধি অভিভূত' তখন

প্রেম ও প্রকৃতি সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট ধারণা কবিমনে সৃজিত হয়নি। 'যবে বিকশিত হোল কিঞ্চিৎ চেতনা', তখনই অনুভব করলেন যে প্রেমময়তা আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে একটি অভিন্নতা আছে। প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যেই মানবিক প্রেমের উদ্ভব, বিকাশ এবং পরিপূর্ণতা ঘটে। প্রকৃতির ভাষা আর রূপ ঠিক যে কথাটি বলতে চাইছে 'প্রেমপ্রবাহিণী' রচনার যুগেই বিহারীলাল তার সবটুকু অভ্রান্ত ভাবেই বুঝতে পারলেন। তিনি বললেন—

যাহা বলে, তাই শুনি মনোযোগ দিয়ে,
যা দেখায়, তাই দেখি স্থির চক্ষে চেয়ে।
এঁকে দিল বিশ্বময় তোমার স্বরূপ,
আমারো চক্ষেতে তাহা ধরিল এ রূপ
যে,—কি জলে, স্থলে, শূন্যে যে দিকেতে চাই,
বিরাজিত তব ছবি দেখিবারে পাই।

(প্রেম-প্রবাহিণী, ৫ম সর্গ)

'সঙ্গীত শতকে'র যুগে এই প্রকৃতিচেতনা গভীরতর হয়ে উঠল। একেই জীবনের পরম সম্পদ মনে হ'ল কবির। তিনি বললেন—

সদা আমি আছি সুখী
ল'য়ে এ সকল ধন—
তরুণ অরুণ ছটা,
সুশীতল সমীরণ,
তারাবলি, সুধাকর,
তরঙ্গিণী, জলধর,
তরু, লতা, ধরাধর,
নির্ঝরের নিপতন। (সঙ্গীত শতক—২)

শান্ত-অশান্ত, ক্ষুদ্র-বৃহৎ, নিকটবর্তী-দূরবর্তী—প্রকৃতির সমস্ত প্রকার অবস্থার সঙ্গেই অকৃত্রিম হৃদ্যতা স্থাপিত হ'ল। কবি প্রকৃতিকে একটি রূপসী বধূর মূর্তিতে অংকন করলেন 'সঙ্গীত-শতকে'র তৃতীয়

সঙ্গীতে। একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারি, প্রকৃতিকে নানা কালে নানা মূর্তিতে দেখা শুরু করেছেন কবি। এ যেন অতি প্রিয় কোন বস্তুকে নানা দিক থেকে নানাভাবে দেখে তৃপ্তিলাভের আন্তরিক প্রচেষ্টা। এর স্বীকৃতি পাওয়া গেল কবির কথায়—

প্রণয় করেছি আমি
প্রকৃতি রমণী সনে.
যাহার লাবণ্য-ছটা
মোহিত করেছে মনে! (সঙ্গীত-শতক-৯৯)

নিসর্গসন্দর্শন, ধূমকেতু, 'কবিতা ও সঙ্গীতে'র অন্তর্ভুক্ত 'নিসর্গ-সঙ্গীতে'র কবিতাগুলি একান্তই প্রকৃতিবর্ণনামূলক। এমনকি 'সারদা-মঙ্গল' আর 'সাধের আসনে'র মধ্যেও প্রকৃতি অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে। বরং একথাই বলা সঙ্গত যে প্রকৃতিকে কবি বিহারীলালের কাব্য থেকে যদি সরিয়ে দেওয়া যায় তাহলে তাঁর মৌলিকতার অনেক খানিই নষ্ট হয়ে যায়। তাঁর বক্তব্যেরও তখন যথেষ্ট পরিমাণে অঙ্গহানি ঘটে। যে ভাবত্রয়ীর পুণ্যসঙ্গম রচিত হয়েছে কবির মানসপটে, তার মধ্যে প্রকৃতিপ্রীতির স্থান বেশ মূল্যবান। বাংলা কাব্যধারায় যে নিবিড় প্রকৃতিচেতনা পরবর্তীকালে দেখা গেল, তার উৎসসন্ধানে আসতেই হবে বিহারীলালের কাব্যসম্ভারের মধ্যে। এঁর প্রকৃতিচেতনার মধ্যে রহস্য-সন্ধানী পাশ্চাত্ত্য চিন্তার সংমিশ্রণ অবশ্যই ঘটেছে, কিন্তু তাঁর ঐ চেতনার মৌল প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপেই ভারতীয় ঐতিহ্যানুসারী।

কবির ঐতিহ্যাশ্রয়ী মনোভঙ্গীর মূল্য যে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত প্রাচ্যধারার সঙ্গে স্বীয় শ্রমার্জিত পাশ্চাত্ত্য ধারার সংমিশ্রণের মধ্যে নিহিত, এ সত্যটি বিস্মৃত হলে চলবে না। প্রেম, প্রকৃতিপ্রীতি আর অধ্যাত্মচেতনার সঙ্গে সমকালীন সমাজচেতনার মিলনে বিহারীলালের কবিমানস সংগঠিত। অন্যদিকে, নিবিড় আত্মমগ্নতার মূলেও সমকালীন তীব্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ, প্রকাশ মন্ময়তামুখ্য চিন্তার বলিষ্ঠতা। এই সব কিছুর ঐক্যবদ্ধ চিন্তা কবি বিহারীলাল সম্পর্কে আমাদের

মনের মধ্যে যে ধারণার সৃষ্টি করে, তা এই যে, তিনি বাংলা কাব্য-ধারার প্রথম শ্রেণীর কবিদের অন্যতম এবং সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর স্থান সুনির্দিষ্টভাবেই চিহ্নিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কবির দক্ষতা বিচার প্রসঙ্গে তাঁর ভাষা ও ছন্দ সম্পর্কিত প্রশ্নগুলি বিচার্য। 'প্রতিভা ছিল কিন্তু গৃহিণীপনা ছিল না।'—সঞ্জীবচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি যে বিহারীলালের পক্ষে সমভাবেই প্রযোজ্য তা আমরা পূর্বেই স্বীকার করে নিয়েছি। কবির রচনার কোন পাণ্ডু-লিপিই আজ আর অবশিষ্ট নেই। তা যদি থাকত তাহলে অবশ্যই দেখা যেত, অন্তরঙ্গে সাধনবেগের যেমনি প্রাবল্য বহিরঙ্গে প্রসাধন-ক্রিয়াং তেমনি অভাব। রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপিতে অতি পরিচিত প্রসাধনক্রিয়া এইটি স্মরণ করিয়ে দেয়, সাধন আর প্রসাধনের মধ্যে সমন্বয়সাধন শ্রেষ্ঠ কবিকর্ম। কবি বিহারীলালে তার অভাব যে ত্রুটি, একথা স্বীকার করে নিয়েও ডঃ সুকুমার সেনের বক্তব্য স্মরণ করতে হয়—'যে কবিতা জীবনের গভীর উপলব্ধির উৎস হইতে উৎসারিত তাহার ভাবে আবেগ-উচ্ছ্বাস ও ভাষার অস্ফুটতা থাকা অনপেক্ষিত নয়'।[৫]

বিহারীলালের প্রথম দিকের কাব্যগ্রন্থগুলিতে ভাষাজনিত অবহেলা আছে। ডঃ সুরেশচন্দ্র মৈত্র এ অবহেলার একটা তালিকা[৬] নির্মাণ করেছেন। সুরেশবাবুর মতে 'অলংকৃত ভাষায় দেহের সৌন্দর্য বাড়ে, মনের খবর ধরা পড়ে না।' আবার প্রমথ চৌধুরী মনে করেন, 'প্রসাদগুণ হচ্ছে ভাষার একটি বিশিষ্ট রূপ, * * অপ্রসন্ন অর্থাৎ ঘোলাটে মন থেকে প্রসন্ন ভাষা আবির্ভূত হতে পারে না সুতরাং প্রসাদগুণ হচ্ছে আসলে মনেরই গুণ, ও-বস্তু হচ্ছে মনের আলোক।'[৭] বস্তুত ভাষার প্রসাদগুণ যে মনেরই গুণ তা অস্বীকার করা সম্ভব নয়। কিন্তু অলংকরণে তার মধ্যে মানসিক প্রতিবিম্বটি অস্পষ্ট হয়ে যায় এ বক্তব্য স্বীকার্য নয়। শিল্পের ক্ষেত্রে গৃহিণীপনার প্রয়োজনীয়তা আছে বৈকি। তবে বিহারীলাল যেভাবে সাধু আর চলিতের দ্বন্দ্ব-

সহাবস্থিতি ঘটিয়েছেন তা লক্ষণীয়। এই সহাবস্থানে কিন্তু ভাষার গীতিধর্মিতা ক্ষুণ্ণ হয়নি আর তাছাড়া এর ফলে এক ধরণের অকপট সারল্য কাব্যগুলির মধ্যে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। তুলনামূলক তালিকা দিয়ে মৈত্র মহাশয় প্রমাণ করেছেন যে হেমচন্দ্র আর নবীন চন্দ্রের শব্দ নির্বাচন আর গ্রন্থনের ভেতর থেকে গীতিধর্মিতা অন্তর্হিত হয়েছে। যাই হোক তদানীন্তন বঙ্গভাষার কিছু আঞ্চলিক শব্দ যে কোথাও কোথাও শ্রুতিকটু মনে হয় তা স্বীকার করা উচিত। অনুমান করতে বাধা নেই যে ঐ সব আভ্যন্তরীণ আঞ্চলিক শব্দ তাঁর রচনার মধ্যে সাবলীল ভঙ্গীতেই এসেছে তাঁর স্বচ্ছন্দ প্রতিরূপ হিসেবে। একেও তাই দক্ষতা বলেই গ্রহণ করতে হয়।

কবির ব্যবহৃত ছন্দ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে এককালে 'বঙ্গসুন্দরী'র ছন্দ রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিদের অনুকরণীয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার ছ'মাত্রার চলন, গীতি ধর্মিতার অনুকূল। অবশ্য এ ব্যাপারে সমকালীন অন্যান্য কবিদেরও অবদান আছে। কিন্তু ছয় মাত্রার চলনটি মাত্রা-বৃত্তের অনুকূল, অক্ষরবৃত্তের নয়। বিহারীলাল ছন্দোপ্রকৃতি অক্ষরবৃত্ত রেখে তাকে ছয়মাত্রায় বন্দী করেছেন। এবং তা করতে গিয়ে যুক্ত ও যুগ্মবর্ণ নিয়ে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন। মনে হয় এই কারণেই পরবর্তীকালে তিনি ৮-৬, ৮-৭ মাত্রার কাঠামোটি গ্রহণ করলেন। শোষণশক্তির যথোপযুক্ত ব্যবহার তখন সহজতর হয়ে উঠল, আর গীতি ধর্মিতার মধ্যেও কিছু পরিমাণে ধ্যান-গাম্ভীর্য সঞ্চারিত হ'ল।

ত্রিপদীর ব্যবহারেও কবির কৃতিত্ব প্রশংসার দাবী রাখে। সারদা-মঙ্গলে তাঁর ত্রিপদীর ব্যবহার কাব্যটির ভাব ও ভাষাকে অপূর্ব সুষমামণ্ডিত করে তুলেছে। কিন্তু স্তবক নির্মাণের ক্ষেত্রে তিনি কোন বিশেষ রীতি গ্রহণ করেননি। সেখানে তিনি একান্তই আপন আবেগের বশীভূত। সে আবেগের পরিপূর্ণ প্রকাশের জন্য যেখানে যতগুলো ছত্রের প্রয়োজন বোধ করেছেন, সেখানে ততগুলি ছত্রই তিনি নির্বিচারে ব্যবহার করেছেন।

মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি সমকালীন কবিগণ যখনই স্তবক নির্মাণ করেছেন, তখনই কোন একটি রীতির অনুসরণ করেছেন। মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনাকাব্য', হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী' ও নবীনচন্দ্রের 'অবকাশ রঞ্জিনী'তে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে যে ধারণাটি বদ্ধমূল হয়, তা হ'ল এই যে, বিহারীলালের ভাবতন্ময়তা প্রকাশে নিজেকে কোন রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করেন নি। ভাষা ও ছন্দোরীতি ভাবের বাহন হয়েছে। মহাকাব্য আর আখ্যায়িকাকাব্যের গাম্ভীর্য যে কবির উষ্ণ হৃদয়ের স্পর্শে উচ্ছ্বাসের অজস্রতায় তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছিল, তার পক্ষে বন্ধন বা রীতি হ'ত বিড়ম্বনার নামান্তর মাত্র। তা যে ঘটেনি এ আমাদের সৌভাগ্য। প্রয়োজনীয় ছন্দ ব্যবহারের দক্ষতাও বিহারীলালের প্রতিভার পরিচায়ক। অতএব, এ সিদ্ধান্তে অনায়াসেই আমরা আসতে পারি যে বিহারীলালের দক্ষতা প্রথম শ্রেণীর যে কোন কবির সমান। তাঁর কাব্যে 'শক্তির ও ইচ্ছার অভাব'[৮] মোটেই ঘটেনি।

উল্লেখপঞ্জী

(১) T. S. Eliot—On Poetry & poets (what is minor poetry) 5th Impr. 1969. P—39—52.

(২) বিহারীলাল কাব্য সংগ্রহ—ক: বি: ৪র্থ সংস্করণ, পৃ: ১০৫

(৩) রবীন্দ্রনাথ—'চিত্রা' মাঘ ১৩৬৬ সংস্করণ, পৃ: ১৬৩

(৪) T.S. Eliot—Selected Prose: Edt-J. Hayward. 1963 Edn. The Unity of Shakespeare. P—98.

(৫) সুকুমার সেন—বাং সাঃ ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ৫ম সংস্করণ, পৃ: ৪৩৪

(৬) সুরেশচন্দ্র মৈত্র—বাংলা কবিতার নবজন্ম—১৮৫৮-১৮৯১-১ম সংস্করন, পৃ: ৩৯৫-৯৬

(৭) প্রমথ চৌধুরী—ভারতচন্দ্র (প্রবন্ধ সংগ্রহ), শতবার্ষিকী সংস্করণ, পৃ: ২০২-৩।

(৮) বিহারীলাল-রচনাসম্ভার—সম্পাদক প্রমথনাথ বিশী, মিত্র ও ঘোষ সং, প্রথম প্রকাশ, পৃ: ৪০

॥ ৩ ॥

সমকালীন কাব্যধারা ও কবি

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ প্রধানতঃ ব্যয়িত হয় বাংলা গদ্য চর্চায়। রামমোহন, মৃত্যুঞ্জয়, বিদ্যাসাগরের হাতে ভাষা অপরিমেয় শক্তি সঞ্চয় করল। এই সঞ্চিত শক্তির প্রকাশ কাব্যজগতে দেখা গেল এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। সমকালীন কাব্যজগতের একচ্ছত্র সম্রাট মধুসূদন সমকালীন বাঙ্গালীমানসের আধারে পাশ্চাত্ত্যচিন্তার ভাবসমন্বিত মূর্তি। অতএব সমকালীন কাব্যধারার প্রতিষ্ঠাতা যে মধুসূদন তাতে সন্দেহ নাই। যদিও এটি ঐতিহাসিক সত্য যে কাব্যধারায় প্রথম আবির্ভাব রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল ১৮৫৮ সালে 'পদ্মিনী উপাখ্যান' নিয়ে। এর উল্লেখ পূর্বেই করেছি।

১৮৫৮ থেকে কাব্য সৃষ্টির ধারা পথ অনুসরণ করে অগ্রসর হয়ে ১৮৭০ এর পূর্ব পর্যন্ত আমরা যে সব কাব্যগ্রন্থের সাক্ষাত পাই তার মধ্যে ছিল সবই, শুধু সার্থক গীতিকবিতা ছাড়া। মূলত এই দশকটি মহাকাব্য আর আখ্যায়িকা কাব্য রচনায় অতিবাহিত হয়েছে। এখানে অতীত বীরগাথার অনুসরণে যে যুগটি গড়ে উঠেছিল তার প্রাণপুরুষ মধুসূদন। সেটি বীরযুগ নামেই চিহ্নিত। উনিশ শতকের বঙ্গসমাজে যে সর্বাত্মক উদ্দীপনাব, যে বৃহৎ কর্মযজ্ঞের সূচনা ঘটেছিল, তার সমান্তরাল ক্ষেত্রে কাব্যে ঐ মনোভঙ্গীই ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক।

১৮৭০ সালটি বিশেষ ভাবে চিহ্নিত হবার যোগ্য। এর পূর্বে ১৮৬২তে বিহারীলালের 'সঙ্গীত শতক' প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু একক গীতিকারের সেই ভাবতন্ময় সঙ্গীত যুদ্ধক্ষেত্রের প্রবল উত্তেজনাকর পরিস্থিতির অন্তরালেই থেকে গিয়েছে। যথেষ্ট শ্রোতার দৃষ্টি সেদিকে তখনো আকৃষ্ট হয়নি। কিন্তু ১৮৭০-এ যখন বিহারীলালের সঙ্গে

হেমচন্দ্র, গোবিন্দচন্দ্র দাস, বলদেব পালিত, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি ঐকতানে যোগ দিলেন, পাঠক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি তখন আকৃষ্ট না হয়ে পারেনি। বস্তুত, বিহারীলালের 'বঙ্গসুন্দরী', 'নিসর্গসন্দর্শন', 'বন্ধুবিয়োগ', 'প্রেম প্রবাহিণী'র সঙ্গে হেমচন্দ্রের ১ম খণ্ড কবিতাবলী-গোবিন্দ চন্দ্রের 'প্রসুন' বলদেবের 'কাব্যমালা' ও 'ললিত কবিতাবলী' এবং রাজকৃষ্ণ-এর 'কাব্য কলাপ' বীরযুগের অবসান ও গীতিকবিতার যুগপ্রতিষ্ঠা ঘোষণা করল।

ভাবতন্ময়তা, চিত্রধর্মিতা আর তার সঙ্গে সঙ্গীতধর্মিতার সংমিশ্রণে যে গীতিকবিতা এখন বাঙ্গালী পাঠকের হৃদয় হরণ করল, তার ইতিহাস কিন্তু সুপ্রাচীন। সেই ইতিহাসের পাতায় চোখ বুলোতে গিয়ে যে সত্যটি ধরা পড়ে তা হ'ল এই যে, কোন বিশেষ যুগ পূর্বাপর সম্পর্কহীন বিচ্ছিন্ন কোন কাব্য ধারার জন্মদাতা নয়। প্রকৃতপক্ষে কাব্যের বহুবিচিত্র ধারা একত্রিত হয়ে কাব্যসৃষ্টির ঊষালগ্ন থেকেই প্রবাহিত হয়ে এসেছে। কিছু পরিমাণে সামাজিক কারণে আর বাকীটুকু সৃজনশীল প্রতিভার বৈশিষ্ট্যস্পর্শে কোন কোন ধারা কোন বিশেষ যুগে প্রাধান্য অর্জন করে। কাব্যসাহিত্যের এই সমন্বয়ধর্মী ঐতিহ্যটি শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণীয়।

কালিদাসের কাব্যে মহারাষ্ট্রীয় প্রাকৃতে রচিত গীতের সন্ধান মেলে। সংস্কৃত সাহিত্যে অন্যান্যেরা যা কিছু গীত রচনা করেছেন তা কিন্তু করেছেন শৌরসেনীতে। জৈন ধর্মমূলক 'চরিত কাব্য' গুলিতে গীতিধর্মী কবিতার অবাধ ব্যবহার আছে। 'চিত্রক' একশ্রেণীর গদ্য রচনা। কিন্তু তার মধ্যে গীতিধর্মিতার প্রমাণ আছে বলে সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ ঘোষণা করেছেন। এগুলির ভাষা ছিল অবহট্‌ঠ। প্রাচীন চর্যাপদের ধর্মাশ্রয়ী দেহসাধনামূলক রূপকাশ্রিক উপদেশের অন্তরালে গীতিকবিতার স্বভাব চকিত বিদ্যুতের মত চোখে পড়ে। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' গীতিনাট্য আর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র কবি বড়ু চণ্ডীদাস রচনা করেছেন মূলত নাটগীত।

বৈষ্ণবপদের যুগকে গীতিকাব্যের যুগ বলেও কেউ কেউ চিহ্নিত করে থাকেন। সে বিচারে শাক্তপদও সমশ্রেণীর। সমষ্টিগত ধর্মসাধনার একাগ্রতা, অবিমিশ্র গীতিকবিতার জন্ম দিতে পারে না। তবু এগুলির ভনিতা মূলক অংশকে আশ্রয় করে বৈষ্ণব ও শাক্ত কবির একান্ত ব্যক্তিগত চিন্তার স্পর্শ যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা অনস্বীকার্য। শ্রীচৈতন্যকে আশ্রয় করে যে কাব্য-সাহিত্য রচিত হ'ল, তার মধ্যেও গীতিধর্মিতার লক্ষণ ছিল।

ইতিমধ্যে প্রায় সমান্তরাল ভাবেই লোকসাহিত্যে এ শাখা বাংলা কাব্যধারাকে বহুমুখী বৈচিত্র্য দান করে চলেছে। আউল, বাউল, সাঁইদরবেশের গানগুলি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বিশেষ ভাবেই স্মরণীয় 'মৈমনসিংহ গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'। এই ধারার লোকরঞ্জন শাখা কবিগান আর তার সমগোত্রীয় সমকালীন অন্যান্য গীতিধর্মী কবিতার ধারা। এ ধারায় রামনিধিগুপ্ত, শ্রীধর কথকের কথা অবশ্য স্মরণীয়। বলা অসঙ্গত নয় যে বিহারীলালের প্রাথমিক সৃষ্টির মধ্যে এঁদের ধারানুসরণ কিয়ৎ পরিমাণে স্পষ্ট। 'বাউল বিংশতি'র অন্তর্গত গানগুলির সুরনির্দেশনায় কবি 'বাউল সুর', 'ভজনের সুর', 'নন্দবিদায় যাত্রার সুর' আর 'নিধুবাবুর সুর'ও উল্লেখ করেছেন। সঙ্গীতধারার ঐতিহ্য কী পরিমাণে তিনি আত্মস্থ করেছিলেন এই সুর গুলির উল্লেখ তারই সাক্ষ্য বহন করে।

সার্থক গীতিকবিতার আস্বাদ পেলাম ১৮৭০এ আসার পর। একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি যে মহৎকাব্যসৃষ্টির ভূমিকা রচনা করতে পারে, যুদ্ধ ও শৌর্যবীর্যের ইতিহাস ছাড়াই কবির অন্তর থেকে কাব্য রচনার বিষয়বস্তু সংগৃহীত হতে পারে বা পৌরাণিক চরিত্রের পরিবর্তে প্রেম ও প্রকৃতি কাব্যের মুখ্য চরিত্র হিসেবে উপস্থিত হতে পারে, তার উজ্জ্বল উদাহরণ এই প্রথম পাওয়া গেল। শুরু হয়ে গেল রুচি পরিবর্তনের পালা। এদিক থেকেই বিহারীলাল 'ভোরের পাখি' সম্পূর্ণ নতুন ভাষা ও সুরে নতুন কথা শোনানোর স্বোপার্জিত দায়িত্ব গ্রহণকারী কবি।

এ শক্তি বিশেষ দক্ষতা প্রতিপাদক। প্রবল স্রোতের বিপরীত মুখে উজান বেয়ে যাওয়া। পাঠকসমাজের সমকালীন রুচিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে পরিচালিত করা। মাহাকাব্যের আসরে ঢিলেঢালা ভাবের গান শোনানো আর তাই দিয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে ফেলা। এর চাইতে বড় মাপের দক্ষতা কল্পনাও করা যায় না। একে নবযুগ প্রবর্তন বলিনে, বলি দক্ষতা সহকারে নবযুগের ক্ষেত্র প্রস্তুতি। বিহারীলালের শ্রোতৃসংখ্যা আর কণ্ঠস্বরের বিস্তৃতি ছিল সীমিত। তবু 'মেঘনাদ বধ কাব্যে'র মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতৃবৃন্দ উৎকর্ণ হয়ে উঠেছিলেন সেদিন। কিছু ভাবশিষ্যও সমবেত হয়েছিলেন এই নতুন গায়কের আসরে। আর বিহারীলালের মত কবিতা লেখা নাকি কোনদিনই সম্ভব হবে না একথা বার বার শোনার পরও কবিযশঃপ্রার্থী একজন তরুণ কবি বিহারীলালের সুরটিকে আত্মস্থ করতে শুরু করেছিলেন। মধ্যমণি সেই রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যে শিষ্যসম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল, তার প্রেরণাপুরুষ যে বিহারীলালই, তাতে সন্দেহের অবকাশমাত্রও নেই। রবীন্দ্রনাথ এ ঋণ বার বার স্বীকার করেছেন।

সমকালীন কাব্যধারায় আধুনিকতা আর নবজাগরণের সমস্ত মনোলক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ধর্ম ও সমাজজীবনের বিভিন্ন কুসংস্কার ও যুক্তিহীন চিরাচরিত রীতিনীতির বিরুদ্ধে ধর্ম ও নিরপেক্ষ সাহিত্য সেদিন বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। সেই সঙ্গে ঘোষিত হয়েছে স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য ও মানবতাবাদের উদাত্ত স্বীকৃতি। মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' আর 'বীরাঙ্গনা কাব্য' নূতন যুগের অভ্যুদয় ঘোষণা করেছে। কাব্যের বহিরঙ্গে পয়ার ও লাচাড়ীর ক্লান্তিকর অনুবর্তনও নির্মমভাবে পরিত্যক্ত হয়েছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমন্বয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অভূতপূর্ব শক্তি সঞ্চয় করতে শুরু করেছে এই যুগেই। বলাবাহুল্য এ সবের কেন্দ্রে যিনি সুপ্রতিষ্ঠিত, তিনি কবি শ্রীমধুসূদন।

তবু আবার স্মরণ করতে হয় যে মধুসূদন রঙ্গলালের নির্দেশিত পথ বিহারীলালের কবিপুরুষ স্বীকার করেনি। হেম, নবীন আর

বিহারীলাল এঁরা সবাই গীতিকবিতা সৃষ্টি করেছেন, যেমন করেছেন কিছু পরিমাণে কবি শ্রীমধুসূদনও। কিন্তু বিহারীলালের গীতি কবিতা সম্পূর্ণ নতুন আস্বাদের। তার প্রমাণ পূর্ববর্তী অধ্যায়ে কাব্য-বৈচিত্র্য আলোচনাপ্রসঙ্গে আমরা পেয়েছি। কিন্তু এও আমরা স্বীকার করে নিয়েছি, এই ধারার উৎস-সন্ধানে গিয়ে আমরা বাংলা কাব্যসৃষ্টির উষালগ্নে এমনকি তারও বহু পূর্বে সংস্কৃত সাহিত্যে গিয়ে পৌঁছুতে পারি।

বিহারীলালের আত্মবিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সঙ্গে সাধর্ম্য ঘটেছে সমকালে বেশ কয়েকজন কবির। এর ফলে ঐতিহ্য ধারায় বিহারীলালের প্রভাব মিশ্রিত হয়ে গিয়ে তাঁদের কাব্যসৃষ্টির মধ্যে, কিছু পরিমাণে জ্ঞাতসারে কিছুটা অজ্ঞাতসারে উপস্থিত হয়েছে। শিল্পের জগতে ঐতিহ্যের এই অনুবর্তন শক্তি-স্বল্পতার পরিচায়ক ত নয়ই বরং তা যথেষ্ট কৌলীন্য অর্জন করেছে। উত্তরসূরিদের চিন্তা-ভাবনার মধ্যে শিল্প-ঐতিহ্যের ধারা কালপরম্পরা এমনভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে যায় যে তাঁদের কোনো শিল্পসৃষ্টিকে আক্ষরিক অর্থে মৌলিক বলা সম্ভব নয়। কিন্তু তবুও মৌলিকতা থাকে এবং থাকে বলেই প্রাচ্য প্রতীচ্যের তাবৎ সাহিত্যিক বৃহৎ ঐতিহ্যধারাকে অঙ্গীকার করেও তাঁদের স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্ঠতা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। ঐতিহ্যাশ্রয়ী হয়েও বিহারীলাল ও তাঁর প্রভাবপুষ্ট বলে চিহ্নিত উত্তরসূরিগণ তাঁদের স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। এ ঐতিহ্য জাতীয় জীবনের রসধারাকে ক্রমাগত পুষ্ট করে আর সংবেদনশীল অন্তরের মধ্যে ধরা দেয়। এঁরা সবাই তার ধারক আর বাহক।

বিহারীলালের সাধক-সত্তা তাঁর কবিসত্তাকে আচ্ছন্ন আর অস্পষ্ট করে তুলেছে, এ ধরণের অনুযোগ প্রায় সকলেই করেছেন। রোম্যান্টিক সত্তার পূর্ণবিচারে সাধক সত্তাকে তার সমধর্মী বলেই বিশ্বাস করতে হয়। ক্ল্যাসিক রোম্যান্টিক ধর্মের শতসহস্র সংজ্ঞার মধ্যে না গিয়ে এইটিকেই তাদের লক্ষণ বলে চিহ্নিত করা যায় যে,

জগৎ ও জীবনকে সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখেন ক্লাসিক-সত্তা আর তাকে রোম্যান্টিক-সত্তা দেখেন আংশিক দৃষ্টিতে। সার্বিক দৃষ্টিতে দেখার প্রচেষ্টা বহুলাংশেই বস্তুগত আর অতীত ঐতিহ্যাশ্রয়ী হয়। সেখানে নিবিড় নিশ্চিন্ত একটি আশ্রয়ে কবিসত্তা নির্বিকার ভাবে তাঁর ভাব-প্রতিমা সৃষ্টিতে নিমগ্ন হয়। অন্যপক্ষে কোন একটি বিশেষ ধারণা-সঞ্জাত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে রোম্যান্টিক কবি যখন পৃথিবীকে আর জীবনকে দেখতে যান, তখন তাঁকে এগুলির একটা বড় অংশকে নিজের অন্তরের মধ্যেই গড়ে নিতে হয়। সেই সৃজনশীলতা যেমনি ভাবগত তেমনি কবিকল্পনার আধারে সম্পূর্ণ নতুন রূপ আর রসের পরিবেশক। রোম্যান্টিকতার প্রকাশ তাই গভীর মন্ময়তায়, চিত্রধর্মিতায় আর কিয়ৎ পরিমাণে বৈপ্লবিক চিন্তায়। এঁরা উভয়েই সাধক আর স্রষ্টা; কিন্তু রোম্যান্টিকদের সাধনা অন্তরের অদৃশ্যলোকে আপনার একটি বিশেষ ভাবের আশ্রয়াধীন। এর ফলে Keats যখন সৌন্দর্যের দৃষ্টিতে বা Shelley যখন প্রেমের দৃষ্টিতে সৃষ্টির গভীর সত্যকে উপলব্ধি করেন, তার সবটুকুই হয় তাঁদের মানসপ্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার প্রধান উপাদান কল্পনা আর আবেগ। রোম্যান্টিক কবিকর্মের মধ্যে তাই কিছু পরিমাণে অসংলগ্নতা আর আবেগবাহুল্য দেখা যায়। পাঠকদের পক্ষে এঁদের ভাবানুকরণ সহজসাধ্য নয়।

বিহারীলালের বিরুদ্ধে দুরূহতা আর অস্পষ্টতার অভিযোগ আছে। এগুলি একরকম প্রসিদ্ধি লাভ করেছে বলা যায়। কাব্যের ক্ষেত্রে দুরূহতা আর অস্পষ্টতা অনুভূত হয় নানা কারণে। বিহারীলালের কাব্য প্রসঙ্গে যে কারণ দু'টিকে সম্ভাব্য মনে হয় তা হোল প্রথমত কবিতাগুলো দীর্ঘ আর উনিশ শতকের কোন দীর্ঘ কবিতাই কবিতা-পাঠের আনন্দ পাওয়ার জন্য পঠিত হয় না।[২] অপরিচয়ের অস্পষ্টতা আর অর্থ বোধের অক্ষমতা এক কথা নয়। দ্বিতীয়ত বিহারীলাল যে দুর্বোধ্য এ প্রায় লোকনিরুক্তির স্তরে পৌঁচেছে। ফলে, পাঠক বিহারীলালের কাব্য হাতে পেয়েই প্রস্তুত হন একটি দুরূহ আর অস্পষ্ট

সৃষ্টির মধ্যে প্রবেশ করতে। এর সঙ্গে রোম্যান্টিক কাব্যাস্বাদনের যে স্বাভাবিক দুরূহতা তা যুক্ত হয়েছে।

কবিতা পাঠের জন্য কবিতাপাঠ আর কবির বক্তব্য অনুভাবনার জন্য কবিতা পাঠ, এক প্রক্রিয়া নয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যথেষ্ট ধৈর্য সহকারে সমগ্র রচনার সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রায় বাধ্যতামূলক। 'প্রায়' বলার উদ্দেশ্য এই যে হয়ত কিছু অংশ বর্জন করেও কবির মনোভঙ্গী আমরা সার্থক ভাবেই অনুভব করতে পারি। উনিশ শতকের অনেক কবিতাই যদি স্কুল-কলেজের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকা-ভুক্ত না হ'ত তাহলে যে সেগুলি জাতীয় পুস্তকাগারেরই সম্পত্তি হয়ে থাকত, এ কথা অস্বীকার করার জো নেই। এ কথা Wordsworth, Shelley, Keats, Browning এবং Winburne এর বহু কবিতা সম্বন্ধেই বলা যায়। পাঠ্যতালিকায় না থাকলে 'Prelude' কেউ পুরোটা পড়ে? কবিতার দুরূহতা প্রসঙ্গে এলিয়ট এই প্রশ্নই করেছেন। যাই হ'ক বিহারীলাল পঠিত হয় না তাই অস্পষ্ট আর যদিও বা পঠিত হয় তা হয় আংশিকভাবে, তাই পাঠক কিয়ৎ পরিমাণে দুরূহতা অনুভব করেন। এইটুকু বাদ দিলে সাধারণ ভাবে দুরূহতার অভিযোগ সম্পূর্ণ প্রবাদ বাক্যের প্রভাব। রোম্যান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রাথমিক দুরূহতাটুকু ছাড়া বিহারীলালের কাব্য সম্পর্কে দুরূহতার অভিযোগ বহুল পরিমাণে কল্পিত।

তবু বিহারীলালের স্থান এবং অবদান বাংলা কাব্যধারায় সুনির্দিষ্ট। প্রকৃতপক্ষে তাঁর প্রবর্তিত রীতি এবং ভাবই ছিল সেই শতকের উপযোগী। তাই মধুসূদনের ক্লাসিক-ধর্মী ধারা হেম-নবীন প্রমুখ নিও-ক্ল্যাসিকদের পেরিয়ে এসে গীতিকবিতার রোম্যান্টিক ধারার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছে। এই বিবর্তনের ধারাটি অত্যন্ত স্বাভাবিক। সমাজ ও সংস্কৃতির দিকে লক্ষ্য করলেও এই সত্যটি ধরা পড়ে। সেখানে দেখা যায় মানবসমাজ বাহুবলের যুগ পেরিয়ে বুদ্ধিবলের দিকে ঝুঁকেছে আর তাকেই প্রকৃত শক্তিরূপে স্বীকার করে নিয়েছে।

বহির্বিশ্বের উপর নির্ভরশীল অলংকারবহুল বিপুল মহাকাব্যকে পিছনে ফেলে মানুষের সাহিত্যরুচি অন্তর্বিশ্ব থেকে আহৃত নিরাভরণ স্বল্পাক্ষর গীতিধর্মী কবিতায় তৃপ্তি পেয়েছে। প্রাকৃতিক বিবর্তন আর সামাজিক বিবর্তন এদিক থেকে সমান্তরাল, এবং সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে সাহিত্যরুচির বিবর্তনও চলেছে একসঙ্গে পা মিলিয়ে। মধুসূদন যা পেরেছিলেন তা একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল। তবুও মেঘনাদবধের মধ্যে আত্মনিষ্ঠ কবির ছায়াপাত ঘটেছে এখানে ওখানে, আর বীর-রসের সঙ্গে করুণরসের মিশ্রণ ঘটেছে অনিবার্য ভাবেই। তাছাড়া ঐ মহাকাব্য আর অঙ্গনা কাব্য দুটিকে বাদ দিলে বাকী কবিতাগুলি সবই গীতিকবিতার শ্রেণীভুক্ত। যাই হোক, মধুসূদনের আদর্শকে অনুসরণ করে হেমচন্দ্র তাঁর 'বৃত্রসংহার' এবং নবীনচন্দ্র তাঁর কাব্যত্রয়ীর পরিকল্পনা করলেও এগুলিও যে মহাকাব্য হয়নি সে আলোচনা আজ নিষ্প্রয়োজন। বাংলা সাহিত্যের সমালোচকদের মতে হেমচন্দ্র আখ্যায়িকা কবি (narrative poet)।[২] আর এঁদের সবার কবি-স্বরূপটি যে রোম্যান্টিক গীতিকবির, সে বিষয়ে সকলেই একমত। 'কবিতাবলী' এবং 'অবকাশ রঞ্জিনী' তার সাক্ষ্য।

বয়ঃসন্ধির যুগ আত্মার নির্বাধ প্রকাশে যে অন্তরায় আর সংশয় সৃষ্টি করেছিল, তার অবসান ঘটল। কবিস্বরূপ আত্মমগ্ন হয়েই জীবনমূলে পৌঁছল। স্বগতোক্তির ধারা প্রতিষ্ঠিত হ'ল। কিন্তু এর আদিপুরুষ বিহারীলাল কিছু পরিমাণে স্বতন্ত্র। আত্মমগ্নতা বহুল পরিমাণে সুসংহত কাব্যভাবনায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি ঠিক যে মুহূর্তটিতে, যখন তার আবেগ উচ্ছ্বাস দৃঢ়নিবদ্ধ হয়ে ওঠেনি, অথচ আত্মপ্রকাশে উদ্বেল আকাঙ্ক্ষা সৃজনের আনন্দে উন্মত্ত, তখনই পাওয়া গেল বিহারীলালকে। বিহারীলাল তাই কিছু পরিমাণে অসতর্ক হয়তবা কোন কোন ক্ষেত্রে অন্বয়হীন। তাঁর উত্তর-সাধকদের এক একটি কবিতা যেভাবে নিটোল মুক্তার রূপ ধারণ করেছে বিহারীলালে তা প্রাপ্তব্য নয়। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে শ্রদ্ধাশীল

অধ্যবসায়ী পাঠকের কাছে তিনি দুর্বোধ্য বা কেবল মাত্র 'দিব্যোন্মাদ' নন।)

উনিশ শতকে নবীন কাব্যধারার পথপ্রদর্শক যে বিহারীলাল তা সর্বস্বীকৃত। যে শক্তি সেদিন প্রাচীন গাথাবলী, রামায়ণ মহাভারতের মধ্যে আর কিছু পরিমাণে পাশ্চাত্য কাব্যধারার নূতন পথ সন্ধানে ব্যাপৃত ছিল, তিনি তাকে আহ্বান করে আত্মস্থ হতে শেখালেন। বহির্জগৎ থেকে অন্তর্জগতের দিকে সে শক্তিকে পরিচালিত করলেন। নূতন জগত আবিষ্কার করে সেখানে নবীন কবিসমাজের প্রতিষ্ঠা করলেন। উনিশ শতকের গীতিকবিতা রচনার ক্ষেত্রে সেদিন আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন যে বিপুল সংখ্যক নরনারী, তাঁদের পূর্বসূরি আর পথ প্রদর্শক যে এই বিহারীলাল তাতে সন্দেহ নেই।

এটি আজ ঐতিহাসিক সত্য যে ইংরেজী সাহচর্যে নয়, ইংরেজী ভাষাকে আশ্রয় করে প্রতীচ্যের ইতিহাস দর্শন আর বিজ্ঞানের যে সাহচর্য লাভ তদানীন্তন সমাজের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল, ভাববিপ্লবের কারণ নিহিত সেইখানেই। এই ভাববিপ্লবকে ত্বরান্বিত করতে যাঁরা অগ্রণী হয়েছিলেন তাঁদের একদিকে ডিরোজিও প্রমুখ 'বড় ইংরেজ', আর অন্যদিকে রামমোহন, বিদ্যাসাগর আর কেশব সেন প্রমুখ বড় বড় ভারতীয় মানবপ্রেমিক।

বিবেকানন্দ তাঁর 'বর্তমান ভারত' প্রবন্ধে বলেছেন যে ভাব সংঘর্ষ উপস্থিত হলে যে জাতি জীবন্ত তার জাতীয় জীবনে অকস্মাৎ নতুন প্রাণের সর্বাত্মক লক্ষণ পরিস্ফুট হয়। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে* য়ুরোপীয় ভাবাদর্শ যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচনা করেছিল তাকে ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ পাঁচটি বিভাগে ভাগ করেছেন। অবশ্য অধ্যাপক ঘোষ এগুলি উল্লেখ করেছেন, ডিরোজিওর বপন-করা চিন্তাবীজ হিসেবে। কিন্তু উনিশ শতকের নবজাগরণের চরিত্রটি এই ভাবরাজির সমন্বয়েই গড়ে উঠেছিল। লক্ষণগুলি স্বাধীন ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী

* বর্তমান ভারত : 'শূদ্র জাগরণ' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

স্বদেশ প্রেম ও জাতীয়তাবাদ, অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা ও দৃঢ় সত্যনিষ্ঠা, পাশ্চাত্য সাহিত্য ও জীবনাদর্শের প্রতি অনুরাগ সহ দেশীয় সংস্কৃতি, বিশেষ করে হিন্দু ধর্মের সামাজিক ত্রুটির প্রতি অবজ্ঞা। সেইসঙ্গে জ্ঞানচর্চা ও মননশীলতার প্রতি আন্তরিক অনুরাগ এসব লক্ষণই নবযুগের বাংলা সাহিত্যে প্রকট হয়ে উঠেছিল। ভারতীয় ঐতিহ্যের সন্ধানও পরে বাংলা সাহিত্যে বিশেষভাবে দেখা দেয়। বিহারীলালের মনোভূমি এভাবেই গড়ে উঠেছে।

ইংরেজী দর্শনবিজ্ঞানের প্রচার ও প্রভাব সেকালে খুবই বিস্তৃত ছিল। এর জন্য প্রশংসা অনেকখানি প্রাপ্য বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার। 'বঙ্গদর্শন' মৌলিক চিন্তাশীলতার উদ্বোধনে এবং পাশ্চাত্য দর্শন বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় স্থাপনে অনন্যমেয় সহায়তা করেছিল।

ইতিমধ্যে ইংরেজী সাহিত্যের পঠন-পাঠনের কাজ শুরু হয়েছে। এই ক্ষেত্রে এমন কিছু অধ্যাপকের পদার্পণ ঘটেছে সেদিন যাঁরা সাহিত্যবোধ সৃষ্টি করেছেন তাঁদের আপন সাহিত্যপ্রীতি ও ছাত্রপ্রীতির সমন্বয়ে। এর ফলে পাশ্চাত্য সাহিত্যের মণিমাণিক্যের দিকে তদানীন্তন বাঙ্গালী তরুণ সম্প্রদায়ের আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা যাতে অব্যাহত থাকে তার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েসন। এসবের জন্য ডিরোজিওর একক কৃতিত্ব অনেকখানি, তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ডি-এল-রিচার্ডসনের কৃতিত্ব। ইংরেজী সাহিত্যের ব্যাপক ক্ষেত্রে বাঙ্গালী তরুণেরা প্রধানত এঁদেরই সহায়তায় প্রবেশাধিকার লাভ করেছিলেন। রঙ্গলাল আর মধুসূদনের ক্ষেত্রে এসে লক্ষ্য করা গেল যে এঁরা ক্ল্যাসিক ও রোম্যান্টিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দ পদচারণা করছেন।

কতকগুলি ঘটনাকে অবলম্বন করে ইতিমধ্যে দেশীয় চেতনারও জাগরণ ঘটেছে। কিছু সামাজিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে দিয়ে তার প্রকাশও লক্ষ্য করা গেছে। এই আন্দোলনের কেন্দ্রে ছিলেন রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র ও জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর।

এই ভাবসঙ্গমে উনিশ শতকের কাব্য ধারার সৃষ্টি। এর অস্পষ্ট পূর্বাভাস ঈশ্বরগুপ্তের কবিতায়। সুস্পষ্ট প্রকাশ রঙ্গলাল থেকে বিহারীলালের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কাব্যধারায়। চর্যার যুগ থেকে যে ঐতিহ্যকে আশ্রয় করে বাঙ্গালীর সাহিত্যসাধনার ধারা মধ্যযুগ অতিক্রম করে উনিশ শতকে এসে পৌছল অনিবার্য ভাবেই তার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে গেল সংস্কারহীন রোম্যান্টিক এবং ইতিহাসাশ্রয়ী ক্ল্যাসিক দৃষ্টিভঙ্গী। তারপর মধুসূদন বিহারীলাল দু'টি পৃথক ধারায় সংযোজন করলেন অনেকখানি প্রাণশক্তি। কিন্তু সামাজিক ভাব-বিবর্তনের অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি লক্ষ্য করা গেল বিহারীলালের প্রবর্তিত ধারার অনুবর্তনে—যে ধারার বিশ্ববন্দিত শিল্পী রবীন্দ্রনাথ; ক্ল্যাসিকভঙ্গী পথ ছেড়ে দিল বিশুদ্ধ রোম্যান্টিক চেতনাকে। এই বিশুদ্ধ রোম্যান্টিক চেতনার আদি কবি বিহারীলাল।

বিহারীলালের কাব্যজগতের নাতিবিস্তৃত পরিসরেই তাঁর রোম্যান্টিক দৃষ্টিভঙ্গী বিভিন্ন চিন্তাকে আশ্রয় করে প্রকাশিত হয়েছে। এক কথায় বলা যায়, পরবর্তী বাংলা গীতিকবিতাকে যতগুলো বিভাগে ভাগ করা যাক না কেন এই কবির কিছু না কিছু অবদান সেগুলির প্রত্যেকটিতে অবশ্যই পাওয়া যাবে। বৈচিত্র্য প্রসঙ্গে আলোচনার সূত্রপাত করে আমরা বলেছি যে গীতিকবিতার বর্গীকরণ সহজ নয় বিশেষ করে বিহারীলালের কবিতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে দীর্ঘ হওয়ার দরুণ এই দুরূহতা বৃদ্ধি পেয়েছে। একে কাব্য-ভাবনা লৌকিক শৃংখলা স্বীকার করে না, তার উপর যদি সে ভাবনা কবির যোগমগ্ন হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়, সেখানে ভাবগত শৃঙ্খলাও থাকা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতার মধ্যেও এই ভাববৈচিত্র্য দেখা যায়।

যাই হোক, শরতের লঘুপক্ষ মেঘের মত ইতস্তত সঞ্চরমান ভাবরাজির বর্গীকরণ দুরূহ এটাই আমাদের বক্তব্য। তাছাড়া মানব প্রেমের সঙ্গে প্রকৃতিপ্রেম, অধ্যাত্মচেতনার সঙ্গে মিলন-বিরহ জনিত আনন্দ-বিষাদ বিহারীলালের কবিতার মধ্যে সমকালীন সমাজচেতনার

পটভূমিতে এমনভাবে মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে যে সেগুলিকে বিশেষ বিশেষ শ্রেণীতে বিভক্ত করে দেখানো সম্ভবও নয়।

তারপর আসে তত্ত্বের কথা। ভাবনির্ভর গীতিকবিতা মাত্রেই তত্ত্বের আধার। মানবপ্রেম, প্রকৃতিপ্রেম, এমন কি স্বদেশপ্রেমও রোম্যান্টিক আদর্শের স্তরে উন্নীত হয়, গার্হস্থ্য জীবনকে কেন্দ্র করে কবিতাও শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর দুঃখ শোকের, হর্ষ উল্লাসের তত্ত্বাধার হয়ে ওঠে। রোমান্টিক কবির স্বপ্নাভিসারী মন বস্তু-লগ্ন হয়ে দীর্ঘ সময় কখনোই থাকতে পারে না। একেও সীমা অসীম থেকে উত্তীর্ণ হওয়া, রূপ থেকে ভাবে বা বিশেষ থেকে নির্বিশেষে উত্তীর্ণ হওয়া বলা যায়। গীতি-কবিতার প্রাণই তত্ত্ব। সেখানে চিত্র-কল্প আছে, বর্ণনা আছে এমন কি আখ্যান বা কাহিনীরও সন্ধান মেলে। কিন্তু সবকিছুরই লক্ষ্য এক অনির্দেশ্য ভাবজগতের দিকে, একটি জীবনসত্যের দিকে। সে জীবনসত্য আর তত্ত্ব এক কথা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর গীতিকাব্য বিশ্লেষণে বিহারীলালের নাম গার্হস্থ্য আর দেশপ্রেমমূলক কবিতার মধ্যে উল্লেখ করা হয়নি। এ যে হয়নি তার কারণ খুবই স্পষ্ট। গীতিকবিতাকে এভাবে বিশেষ শ্রেণীতে গ্রহণ করার মত শীর্ষক বা নাম বিহারীলাল ব্যবহার করেননি। প্রাথমিক বাধা সৃজিত হয়েছে সেখানে; পরবর্তী বাধা কবিতাগুলির দৈর্ঘ্যে, আর পরিবর্তনশীল ভাবরাজির সমবায়ে গঠিত কাব্য দেহে। যাই হোক বহুবর্ণে রঞ্জিত কবিতার বর্ণাঢ্যতাই বর্ণ বিশ্লেষণ আর বর্ণ পৃথকীকরণের ক্ষেত্রে বাধা। এ খুব স্বাভাবিক।

বর্ণাঢ্যতাই বর্ণ বিশ্লেষণ আর বর্ণ পৃথকীকরণের ক্ষেত্রে বাধা। এ খুব স্বাভাবিক।

বন্ধুবিয়োগ কাব্যের অন্তর্গত 'সরলা' নামক তৃতীয় সর্গটি প্রথমা পত্নী অভয়া দেবীর উদ্দেশ্যে স্মৃতি-তর্পণ। আনুমানিক ১৮৫৮ সালে এই মহিলার মৃত্যু হয়। ১৮৬৭ থেকে ৬৯ সালের মধ্যে বন্ধুবিয়োগ কাব্য 'অবোধবন্ধু' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে কবি দ্বিতীয়-

বার বিবাহ করেছেন এবং দ্বিতীয়া পত্নী কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে বিবাহিত জীবন খুবই আনন্দের হয়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে প্রথমা পত্নীর উদ্দেশ্যে অকৃত্রিম স্নেহপ্রেমসিক্ত অশ্রুতর্পণ নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য। এছাড়া 'নিসর্গ সন্দর্শন' কাব্যগ্রন্থের পঞ্চম ও ষষ্ঠ সর্গ, 'ঝটিকার রজনী' ও 'ঝটিকার সম্ভোগ' রচিত হয়েছে সম্পূর্ণ গার্হস্থ্য পরিবেশে। পত্নী আর জ্যেষ্ঠ পুত্র অবিনাশের নামোল্লেখে এর গার্হস্থ্যাশ্রয়ী ভাবটি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এগুলিকে গার্হস্থ্য জীবনালেখ্য-মূলক গীতি-কবিতা হিসেবে গ্রহণ করা উচিত।

প্রকৃতপক্ষে রঙ্গলাল প্রবর্তিত দেশাত্মবোধের ধারায় যে বিহারীলালের আত্মপ্রকাশ ঘটে, সে কথা 'স্বপ্নদর্শন শীর্ষক' রূপকাশ্রয়ী গদ্য রচনার আলোচনায় আমরা বলেছি। 'স্বপ্নদর্শন' কবির দেশ-প্রীতির অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন। কাব্য কবিতায় স্বদেশচিন্তা এসেছে ভিন্ন প্রসঙ্গে। এই ভাবের প্রাসঙ্গিক প্রকাশ বহু স্থলেই পাওয়া যায়।

'নিসর্গ সন্দর্শন' কাব্য গ্রন্থের 'সমুদ্র দর্শন' অংশে দেশচিন্তা কবির মনে উদিত হয়েছে। কবি বলেছেন—

এ দেশেতে রঘুবীর বেঁচে নাই আর,
তাঁর তেজোলক্ষ্মী তাঁর সঙ্গে তিরোহিতা!
কপটে অনা'সে এসে রাক্ষস দুর্ব্বার,
হরিয়াছে আমাদের স্বাধীনতা-সীতা। (২৫)
হা হা মাত, আমরা অসার কুসন্তান,
কোন প্রাণে ভুলে আছি তোমার যন্ত্রণা।
শত্রুগণ ঘেরে সদা করে অপমান,
বিষাদে মলিনমুখী সজল-নয়না! (২৬)

শেষ পর্যন্ত কবি দেশের পরাধীনতা জনিত শোক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে ভুলতে চেয়েছেন, বলেছেন—

গড়াও, গড়াও, তুমি আপনার মনে।
কাজ নাই শুনে এই গীতি খেদময়,

তোমার উদার রূপ হেরিয়ে নয়নে,

জুড়াক্ এ অভাগার তাপিত হৃদয়। (২৯)

'প্রেম প্রবাহিণী' কাব্যের পঞ্চম সর্গে কবির চিন্তা অতীতাশ্রয়ী হয়েছে। কবি দেশের অতীত ঐতিহ্য স্মরণ করেছেন অত্যন্ত খেদের সঙ্গে। তারপর এক সময়ে মনে হয়েছে আজ যা বর্তমান, আগামী-কাল তার পরিচয় অতীতের গর্ভে তলিয়ে যায়। এই জাগতিক রীতির অতীত মানবজীবনও নয়। কবিকেও এই পৃথিবী ত্যাগ করতে হবে। যাঁরা কবিকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তাঁরা 'দুদিন হৃদ্ধ স্মারক-স্বরূপ' কবির কথা ভাববেন, এইখানে এসে কবির যে আত্মচিত্রণ ঘটেছে তার মধ্যে আছে--

জন্মভূমি-প্রতি ছিল আন্তরিক প্রীতি,

সগৌরবে ঘৃণা ছিল ম্লেচ্ছদের প্রতি।

'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যের চতুর্থ সর্গ থেকে একটি স্তবক পরিত্যক্ত হয়েছে সে কথা এই কাব্য সম্পর্কে আলোচনায় বলা হয়েছে। সেই পরিত্যক্ত স্তবকটির মধ্যেও দেশপ্রেমের প্রকাশ ছিল বরং কিছু উগ্র পরিমাণেই। অনুমান করা যায় যে শুধু ঐ কারণেই স্তবকটি পরিত্যক্ত হয়েছিল।

যাই হোক, একথা বোধ হয় এখন স্বীকার করতে বাধা নেই যে কবি দেশপ্রেমমূলক কবিতা রচনা না করলেও তাঁর কাব্যে প্রাসঙ্গিক ভাবে তা বহু ক্ষেত্রেই এসেছে তাঁর স্বীকৃতিতেও প্রমাণ আছে।

তত্ত্বাশ্রয়ী কবিতাশাখায় বিহারীলালের উল্লেখ নেই বটে, কিন্তু রোমান্টিক চিন্তাধারাটি তত্ত্বাশ্রয়ী নয় কি? জড়বাদ বর্জন করে ভাববাদে প্রেম, সৌন্দর্য প্রভৃতি কোন একটি ভাবকে অবলম্বন করে তারই আলোকে জগৎ ও জীবনের মূল্যায়নে তত্ত্বাশ্রয়ী চিন্তা ছাড়া আর কিইবা আছে? রোমান্টিক কবিরা একটি বস্তু, ঘটনা বা ব্যক্তিকে আশ্রয় করে বর্ণনা শুরু করলে একটু পরেই দেখা যায় বহির্বিশ্বের সেই উপাদান কবির মনোবিশ্বে বিমূর্তভাবে পরিণত হয়েছে।

বিহারীলাল থেকেই উদাহরণ সংগ্রহ করি। 'নিসর্গসন্দর্শনে'র প্রথম সর্গে আছে—

সেই তো মানুষ সব কাতারে কাতার
চলেছে স্রোতের মত মোর চারি ভিতে,
কিন্তু সে সরল ভাব নাহি দেখি আর,
গরল গরজে যেন ইহাদের চিতে। (৩)

এরপরেই—

প্রথম যৌবন কাল বসন্ত উদয়,
কেমন প্রফুল্ল রয় হৃদয় তখন।
বোধ হয় মধুর সরল সমুদয়,
হায়, সে সুখের কাল রহে অল্প ক্ষণ। (৪)

ঐ সর্গেই মাতৃভূমির পরাধীনতাজনিত দুঃখবোধ প্রকাশ করেছেন—

হায়, জননীর হেন বিষণ্ণ দশায়,
কভু কি প্রফুল্ল রয় সন্তানের মন?
যেমন বিদ্যুৎ খেলে মেঘের মালায়,
বিমর্ষ মেজাজে বুদ্ধি খেলে কি তেমন? (১৬)

ঠিক তারই পরে—

অধীনতা-পিঞ্জরেতে পোরা যেই লোক,
এক রত্তি জায়গায় সদা বাঁধা থাকে,
প্রতিভা কি তার মনে প্রকাশে আলোক?
পাশ না ফিরিতে চারিদিকে খোঁচা ঠ্যাকে। (১৭)

যদি বলি, বয়স আর অভিজ্ঞতাবুদ্ধির সঙ্গে সমান ভাবে তাল মিলিয়ে এই তত্ত্বাশ্রয়িতা বৃদ্ধি পেয়েছে—অতিরঞ্জিত হয় না। বরং সেইটিই হয় নিছক সত্যভাষণ। 'সারদামঙ্গল' আর 'সাধের আসন' মূলত তত্ত্বাশ্রয়ী কবিতা।

সমকালীন কাব্যরীতির অতিপ্রত্যক্ষ প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে বিহারীলাল-প্রবর্তিত গীতিকবিতা শাখায়। আর সে প্রতিবাদের

ভাষাও সমকালীন কাব্যে ব্যবহৃত ভাষার বিরুদ্ধে পরোক্ষ কিন্তু বলিষ্ঠ প্রতিবাদ।

মধুসূদনের বা হেম-নবীনের মহাকাব্য, আখ্যানকাব্য বিহারীলাল নিঃসন্দেহে পাঠ করেছিলেন। তিনি নিজে সংস্কৃতসাহিত্যে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন, তবু তৎসম, তদ্ভব শব্দ ব্যবহারের প্রবৃত্তি বা প্রয়োজনবোধ তাঁর হয়নি। অন্তরে ভাবোদয় যে ভাষায় হয়েছে, বাইরে ভাব প্রকাশ ঘটেছে সেই ভাষায়। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় আচার্য কৃষ্ণকমলের উক্তি, 'ভাববাচক কোন শব্দই প্রয়োগ করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না।'৫ সংস্কৃতজ্ঞ বাঙ্গলা কবির [illegible] খাঁটি বাংলা [illegible] কাছে তাঁর অন্তরের প্রসাদগুণেই।

ভাবের এ সাবলীলতা [illegible] বিপরীতার্থক [illegible] শব্দ, এমন কি অবাচ্য [illegible] ক্রমে [illegible] রচনা করে গিয়েছেন [illegible] কোন [illegible] হয় নি। [illegible] আকাশ যে এত চিত্রণ-প্রচেষ্টা [illegible] যদিও [illegible] দিকে বক্তব্য অনেক বেশী প্রাণবন্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ আর রবীন্দ্রোত্তর কবিদের কবিতার [illegible] এ কথা [illegible] অনেককাল [illegible] আমাদের ভাষা প্রীতিকে এমন এক স্তরে [illegible] করেছে সেখান থেকে বিহারীলালের ভাষাকে মূল্য দেওয়া আমাদের পক্ষে দুরূহ, যেমন দুরূহ বিপরীত কোটির মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষাকে। তবে স্থির ভাবে চিন্তা করলে এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে মুখ আর বুকের ভাষা শুধু নিখাদ বাংলা বলেই বিহারীলাল এত সহজ-বোধ্য। কোন বক্তব্য ভাষার অরণ্যে হারিয়ে যায় নি। অস্বীকার করব না, কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের রুচিবোধকে তাঁর প্রসাধনহীন আটপৌরে ভাষা আঘাত করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভাবগ্রহণে কোন অসুবিধের সৃষ্টি হয় না। গীতিকবিতা কবির ব্যক্তিত্বপ্রকাশক যত বেশী হয় ততই তার মূল্য। এই একান্ত ব্যষ্টিধর্মী কাব্যশাখায় বিহারীলাল-ব্যবহৃত তদানীন্তন মধ্যবিত্ত সমাজের কথ্যভাষা কতখানি অর্থবহ

হয়েছে তা স্থিরভাবে বিচার করার কাল উপস্থিত। বহুক্ষেত্রে বিশিষ্ট কথ্য শব্দের বানান-রীতিটিও ধ্বনিধর্মী রেখেছেন—'মুহু', 'মাজে', 'চোক', 'ধাঁদা'-এগুলির বানান উচ্চারণরীতিকে অঙ্গীকার করেছে। এর ফলে চলিত ভাষা তার অযোগ্যতার অপবাদ কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে একটা খুব বড় সহায়তা পেল। জাতিচ্যুত চলিত ভাষা এই প্রথম উচ্চতম শ্রেণীতে উন্নত হ'ল, অথচ এই [illegible] বিদগ্ধ সমাজে উত্তপ্ত আলোচনা প্রমথ চৌধুরীর নেতৃত্বে শুরু হয়েছিল বিহারীলালের প্রথম কাব্যপ্রকাশের প্রায় অর্ধশতক পরে।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যের কথা। এ কাব্যটি প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ সালে। ১৮৭১ সালে দ্বিজেন্দ্রনাথকে লেখা বিহারীলালের একটি চিঠি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] ভূমিকায় প্রকাশ করেছেন।[৬] তাতে দেখা যায় [illegible] দ্বিজেন্দ্রনাথের [illegible] 'খাতা' পাঠ করে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। সে খাতার ভাষা আর স্বপ্নপ্রয়াণের ভাষা এক, সে অনুমানে বাধা নেই। স্বপ্নপ্রয়াণের ভাষা প্রখ্যাত সমালোচকদের প্রশংসা লাভ করেছে।[৭] অথচ বিহারীলালের কাব্য-পাঠক মাত্রেই জানেন যে তাঁর ভাষা ও দ্বিজেন্দ্রনাথের ভাষা অন্ত্যজ কথ্য ভাষা। বাস্তবিক পক্ষে এই ভাষাই এঁদের কাব্যদেহের অস্থি-পঞ্জর নির্মাণ করেছে। সমকালীন কাব্যধারায় নতুন ভাষারীতির ভগীরথ বিহারীলাল। সমগ্র বাংলা ভাষারাজ্যে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করে মুক্ত বিশশতকের দ্বিতীয়ার্ধে আমরা যে আত্ম-প্রসাদ উপভোগ করছি, এর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল বিহারীলালের দ্বারাই।

বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ বিশ্লেষণপ্রসঙ্গে সেই সেই কাব্যে ব্যবহৃত ভাষারও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। সেগুলির পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। শুধু এইটুকুই বলা এখানে যথেষ্ট মনে করি যে 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যের ছন্দোরীতি প্রশংসিত হওয়া সত্ত্বেও কবি পরবর্তী কাব্যগ্রন্থে তার অনুবর্তন করেননি।

কবির যে স্বল্পসংখ্যক পত্র 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে তা থেকে অনুমিত হয় যে প্রায় প্রতিটি কাব্যের উপক্রমণিকাংশ আগে কবিকণ্ঠে সংগীতের রূপ নিয়েই আবির্ভূত হয়েছে। তারপর এগুলির রূপ লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই দ্বিতীয় পর্যায়ে কাব্যধারা যখন ঝরনার মত উপল-খণ্ড-সমাকীর্ণ বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, তখন সে আপনার পথ আপনিই সৃষ্টি করেছে, কারও অনুরোধ বা আদেশের অপেক্ষা রাখেনি। তার সেই স্বরচিত পথে উপল-সংঘর্ষে রচিত রাগিণীসহযোগে যাত্রাই ঝরনা-ধারার প্রকৃত সৌন্দর্য। সে এক প্রকারের অবিন্যস্ত আর অসংহত সৌন্দর্য। বিহারীলালের বিভিন্ন কবিতা সেই শ্রেণীর সৌন্দর্যব্যঞ্জক। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভাববাহক বক্তব্য নিজের প্রয়োজন-মত পর্ব সংস্থান আর ছন্দোরীতি সৃজন করেছে। পূর্বাপর সম্পর্কের বিচার সে ক্ষেত্রে নিতান্তই অবান্তর। স্তবকরচনার দিকে দৃষ্টি দিলে এই স্বতোৎসারিতার প্রমাণ চোখে পড়ে। সে ক্ষেত্রেও এই প্রয়োজন-ধর্মিতা কাজ করে গিয়েছে। একটা বক্তব্য ধরে দেবার জন্য যে ক'টি পঙ্‌ক্তি প্রয়োজন, রচিত হয়েছে সেই ক'টি পংক্তি নিয়ে একটি স্তবক। এখানে কোন বিশেষ রীতি অনুবর্তনের প্রশ্ন কবির মনেই উদিত হয়নি। খাঁটি গীতিকবিতার ধর্মই এই। বিহারীলাল খাঁটি গীতিকবিতা-ধারার প্রবর্তক।

গীতিকবিতা সম্পর্কে সে যুগের ধারণাটি বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় সুপরিস্ফুট, বিভিন্ন শ্রেণীর গীতিকবির কথা বলার পর বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সমকালীন কবিদের প্রসঙ্গে বলেছেন যে তাঁরা 'মানব হৃদয়ের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া বাহ্য প্রকৃতিকে দীপ করিয়া তদালোকে অন্বেষ্য বস্তুকে দীপ্ত ও প্রস্ফুট করেন। আর একদল আপনাদিগের প্রতিভাতেই সকল উজ্জ্বল করেন অথবা মনুষ্য চরিত্র-খনিতে যে রত্ন মিলে তাহার দীপ্তির জন্য অন্য দীপের আবশ্যক নাই বিবেচনা করেন।'[৭] এঁদের অর্থাৎ এই দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিদের সঙ্গে 'বাহ্য প্রকৃতির সম্বন্ধ নাই

এমন নহে, বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে মানবহৃদয়ের নিত্য সম্বন্ধ, সুতরাং কাব্যেরও নিত্য সম্বন্ধ। কিন্তু তাঁহাদিগের কাব্যে বাহ্য প্রকৃতির অপেক্ষাকৃত অস্পষ্টতা লক্ষিত হয়, তৎপরিবর্তে মনুষ্যহৃদয়ের গূঢ়তলচারী ভাবসকল প্রধান স্থান গ্রহণ করে।'[১০] বলা বাহুল্য বিহারীলাল দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত।

সাহিত্য ও সমাজ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সাহিত্যেরও ভূগোল আর ইতিহাস আছে, আর এক্ষেত্রেও তাদের সম্পর্ক পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যে যে নবীন ভূখণ্ড জেগে উঠেছিল তার প্রকৃতি আর ইতিহাস আমরা আলোচনা করে দেখেছি যে বিশ শতকের বাংলা কাব্যধারার ভিত্তি সেখানেই রচিত হয়েছে। গীতিকবিতা তার শৈশব অতিক্রম করে প্রদীপ্ত যৌবনের দিকে পা বাড়িয়েছে। সেই শৈশবসীমায় যৌবনের বলিষ্ঠতা আর পূর্ণতা খুঁজতে গেলে আমরাই ব্যর্থ হবো। শৈশবের সৌন্দর্য তার নির্মীয়মাণ দেহসৌষ্ঠবে, তার অকারণ চাপল্যে আর স্খলিত পদক্ষেপে।

সাহিত্যধারায়ও জীবনের মত আদি মধ্য অন্ত্যযুক্ত একটি পূর্ণবৃত্ত রচিত হয়। এর আদিপর্বে যে অসংলগ্নতা আর অসঙ্গতি থাকে, মধ্যপর্ব পেরিয়ে অন্তে এসে দেখি তারই সংযত সংহত রূপ। আদি পর্বে মধ্য বা অন্ত পর্বের সৃজননৈপুণ্য কামনা করলে, কালাতিক্রমণ-দোষ ঘটতে বাধ্য। শুধু সাহিত্যধারায় কেন, কোন একটি কবির রচনা অবলম্বন করেও এই সত্যটি সহজে অনুভব করা যায়। এই চিন্তায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম যুগের বহু কবিতাকে নির্মমভাবে সংকলন-গ্রন্থ থেকে দূরে রাখতে চেয়েছিলেন।

কবি বিহারীলাল আধুনিক রোম্যান্টিক গীতিকবিতা ধারার আদিকবি। যে গীতিকবিতা অস্ফুট আর অর্ধস্ফুট ছিল, বিহারীলালের উদাত্ত কণ্ঠে তার সহজ সরল স্ফূর্তি নিঃসন্দেহে স্মরণীয় ঘটনা। গায়ক হিসাবে তাঁর কণ্ঠে মাধুর্য ছিল না, কিন্তু ছিল 'প্রেমের দরাজ জান' আর ছিল 'আকাশে ঢালিয়া প্রাণ' গান গাইবার শক্তি। চেতন

অচেতন মানব প্রকৃতি, সব কিছুর জন্য তাঁর অকৃত্রিম প্রেমের পরিমাণ সত্যিই 'দুর্বহ' ছিল। তাই কবির উপদেশ—অবশ্য নিজেরই উদ্দেশ্যে—

দুর্ব্বহ প্রেমের ভার
যদি না বহিতে পার,
ঢেলে দাও আকাশে বাতাসে ধরাতলে! (নিশীথ সঙ্গীত-৫২)

এ কবিতায় প্রযুক্তিগত সৌষ্ঠব না ধরা পড়লেও, অকৃত্রিম হৃদয়বত্তার স্পর্শ সহজলভ্য। গীতিকবিতার ক্ষেত্রে এই প্রগাঢ় উপলব্ধিটিই মুখ্য। বিহারীলালের কবিতা উপলব্ধির অন্তর্গূঢ় আলোকে ধ্রুবতারার মত উজ্জ্বল, বাংলা গীতিকবিতা ধারার দিগ্‌দর্শন।

॥ চার ॥

প্রভাব প্রসঙ্গ—

যে কোন শক্তিমান কবি সাধারণতঃ তাঁর স্বদেশীয় কাব্যধারাকে স্বীয় অবদানে সমৃদ্ধ করে তোলেন। আমরা পূর্বের অধ্যায়ে আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি যে, কাব্যধারার মধ্যে বিভিন্ন প্রকৃতির মৌলিক উপাদান নিহিত থাকে। ভিন্ন ভিন্ন কালে কবিরা তাঁদের মনোধর্ম আর সমকালীন যুগধর্মের প্রভাবচালিত হয়ে কোন একটি প্রকৃতিকে আশ্রয় করে তাঁদের সৃজনধর্মিতা প্রকাশ করেন। কবিদের অবদানে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সমৃদ্ধ না হয়ে উঠলে, কাব্যধারা অচিরেই মরুপথে হারিয়ে যায়। আবার প্রতিভাবান কবির আবির্ভাব যদি কালপরম্পরায় ঘটতে থাকে, তাহলে কাব্যপ্রবাহে অচিন্তনীয় শক্তির সঞ্চার ঘটে। বৈষ্ণব আর মঙ্গল কাব্যের ধারা একাধিক শতাব্দীকে অবলম্বন করে চলে। কেবল কাব্যরসপিপাসুদের তৃষ্ণা মিটিয়েছে, আবার অসামান্য কবি প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে সুপুষ্ট করে তুলেছে। পরবর্তী শাক্ত পদ ধারা এখানে প্রভাব বিস্তার করতে না পারলেও, এ প্রভাব বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত। উনিশ শতকে গীতিকবিতা ঐ ঐতিহ্যের অনুবর্তন করে আর প্রতিভাবান কবির সহায়তা পেয়ে ভবিষ্যতের দিকে প্রবাহিত হয়ে চলল। কিন্তু সমকালীন মহাকাব্যের ধারা হল অল্পায়ু। এ সব খুবই স্বাভাবিক।

কোন কবি যখন কোন বিশেষ ধারার সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করেন, আপন সৃষ্টিকে এ ধারার অঙ্গীভূত করে তোলেন, তখন বুঝতে পারি ঐ ধারার ঐতিহ্যটি তাঁর রুচি আর প্রবণতার অনুকূল হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নাকি মহাকাব্য রচনা করতে চেয়েছিলেন ; কিন্তু তাঁর প্রতিভা শত সহস্র উজ্জ্বল গীতিকবিতাকে আশ্রয় করে প্রকাশিত

হ'ল। অসংকোচে বলা যায়, দেশী বিদেশী মহাকাব্যের ঐতিহ্যটিকে তাঁর গীতিধর্মী প্রতিভা স্বীকার করে নেয়নি। এ নিতান্তই রুচি আর প্রবণতা নির্ভর।

এই রুচি আর প্রবণতা ভাবীকালের কবিকে বাল্য বা কৈশোর থেকেই ঐগুলির অনুকূল কাব্যধারার প্রতি আকৃষ্ট করে। বিশেষ কাব্য ধারার অনন্যমন রসাস্বাদনে তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি সজাগ হয়, বুদ্ধি আর অনুভূতি তীক্ষ্ণতর হতে থাকে। যদি এর সঙ্গে পরিবেশ আনুকূল্য সংযুক্ত হয়, তাহলে ঘটে রাজযোটক মিল। বাল্য আর কৈশোরের অনুকরণাত্মক মনোবৃত্তি-সহায়তায় প্রিয় কবিদের কাব্য থেকে প্রসঙ্গ ও প্রযুক্তিগত উপাদান সংগৃহীত হতে থাকে। নিভৃতে লোকচক্ষুর অন্তরালে কবিসত্তা বিকাশের সাধনায় মগ্ন থাকে। সে সাধনা কিশলয়ের পর্ণে পরিণত হবার সাধনা, কিন্তু তার পিছনে বৃক্ষ থেকে রসের সরবরাহটিকে রাখতে হয় অব্যাহত। কাব্যধারার ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগ আর সমকালীন কাব্য পাঠ ও আলোচনা, এই রসের যোগান দিতে থাকে। ইতিমধ্যে কল্পনাশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি আর অনুভূতি বৃদ্ধি পায়, প্রায় অলক্ষ্যেই। তারপর কোন এক শুভলগ্নে বিদ্যুৎ স্ফুরণের চকিত অবসরে কবিসত্তার জাগরণ ঘটে। তখনই কবির প্রত্যয়নিষ্ঠ বলিষ্ঠভাষণ শোনা যায়—

আমি ঢালিব করুণা ধারা
আমি ভাঙিব পাষাণ কারা,
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা।

প্রতিভা আর প্রেরণার সমন্বয় ঘটে। আত্মপ্রত্যয়ী কবির যাত্রা শুরু হয়। সৃষ্টির বৈচিত্র্যে আর অজস্রতায় কাব্যধারা পরিপুষ্ট হতে থাকে। তার প্রবাহে অভাবিত গতি সঞ্চারিত হয়।

আবার উত্তরসাধকের প্রতিভার উপরও নির্ভর করে পূর্বসূরীর প্রভাব স্বীকরণের প্রশ্নটি। তবে আদর্শ পরিবেশটাই যদি আমরা

চিন্তা করি তাহলে অনুমান করব, শক্তিমান পূর্বসূরীর প্রভাব ও কাব্যধারার ঐতিহ্যপুষ্ট শক্তিমান উত্তরসূরীর সৃষ্টির মধ্যেই তার 'অপূর্ব-বস্তু-নির্মাণক্ষম প্রজ্ঞা'র পরিচয় বহন করে চলেছে। কালানুক্রমে একজন বয়োজ্যেষ্ঠ অন্যজন বয়োকনিষ্ঠ, কিন্তু কর্তব্যপালনের ক্ষেত্রে এঁরা প্রত্যেকেই একই কালে গ্রহীতা আর দাতা, শিষ্য আর গুরু। এই গ্রহণে বা শিষ্যত্ব স্বীকারে যেমন অমর্যাদাকর কিছু নেই, সৃজনে বা গুরুর পদে বৃত হওয়ার মধ্যেও অস্বাভাবিক গুরুত্ব নেই। প্রভাব-প্রসঙ্গ বিচার করার সময় এই কথাগুলি আমরা বিস্মৃত হ'ব না।

ঐতিহ্যধারার অনুসরণেই শিল্পীসত্তা তার আত্মপ্রকাশের প্রথম পর্ব থেকে আপন পথের সন্ধান করে। ধীরে ধীরে এই ঐতিহ্যধারা তাঁর মজ্জাগত হয়, আর সেই সঙ্গে তার মৌলিক ভাবনা পরিপুষ্টি লাভ করে। এ বিচারে শিল্পীসত্তা একই কালে যৌগিক ও মৌলিক। Cosmic এবং Social consciousness বা আন্তিজাগতিক ও সামাজিক চেতনা যেমন প্রতিটি চিন্তাশীল ব্যক্তির আশ্রয় এবং এই আশ্রয়ে তাঁদের সমস্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, শিল্পীর মনোজগতেও তেমনি দূরাগত ঐতিহ্যধারা ও সমকালীন সমাজপ্রভাবিত আপন চিন্তা ধারার ঐক্যভূমিতে সৃজিত হয় তাঁর প্রতিভাগত বৈশিষ্ট্য। ভাবলে বিস্মিত হতে হয় যে উভয়বিধ ধারার আত্মীকরণ সত্ত্বেও শিল্পীমনের মৌলিক ভাবনাটুকু অক্ষুণ্ণ থাকে। শিল্প-সমালোচকের কাজ, এই ঐতিহ্য ধারা এবং মৌলিক ভাবনার প্রকাশ কতখানি সার্থকতার সঙ্গে ঘটেছে তারই বিচার করা। আর এই ঐতিহ্য বলতে বোঝায় 'The best that is known and thought in the world'.[১] বলাবাহুল্য বাংলা কাব্যধারায় এই ঐতিহ্য বাহ্যত একাধিক ধারাকে আশ্রয় করে প্রবাহিত হয়ে এসেছে।

ইংরেজী সাহিত্যেও দুটো ঐতিহ্যধারা প্রবহমাণ। একটি, যেটিকে কোন কোন সমালোচক 'The tradition' বলে উল্লেখ করেছেন, John Donne থেকে Pope, Wordsworth, Hopkins হয়ে

Eliotএ এসে পৌঁচেছে। দ্বিতীয়টি Edmund Spencer থেকে Shelley, Keats, Byron হয়ে Tennyson—Browning-এ পূর্ণতা পেয়েছে। এঁদের কাব্য বিশ্লেষণ করলে যেমন প্রসঙ্গ আর প্রযুক্তিগত পার্থক্য ধরা পড়বে, তেমনি কাব্যপাঠকের কাছেও এ দুটো ধারার প্রভাব দ্বিবিধ।

বাংলাকাব্যের ঐতিহ্যধারা সম্পর্কে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ঊনবিংশ শতকে পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটল। শুরু হ'ল গ্রহণ বর্জনের পালা। রঙ্গলাল যখন তাঁর 'পদ্মিনী উপাখ্যান' বাঙালী পাঠকদের উপহার দিলেন, দেখা গেল পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব স্বীকরণের পালা শুরু হয়ে গেছে। অবশ্য শুধু সাহিত্যই নয়, তার সঙ্গে সমান্তরাল ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য দর্শন বিজ্ঞান আর ইতিহাসের প্রভাবটিও ছিল অতিপ্রত্যক্ষ। বাংলা কাব্যঐতিহ্যের ধারা পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছিল এর ফলে। বাল্মীকি কালিদাস হয়ে চর্যার ভিতর দিয়ে যে একান্ত প্রাচ্যধর্মী ধারাটি বয়ে এসেছিল, তার দেহে লীন হয়ে গেল পাশ্চাত্য ধারাটিও। এই সমন্বয়ের ফলে উনিশ শতক থেকে বাংলা-কাব্যের ঐতিহ্যধারাটি অপূর্ব শক্তি আর সুষমায় মণ্ডিত হয়ে উঠল। অতিসাম্প্রতিক কালে আমরা তার সোনালী ফসল ভোগ করছি।

উনিশ শতকের এই সমন্বয়ধর্মী ঐতিহ্যধারায় বিহারীলালের অবদানও মিশ্রিত হোল। এখন দেখার কথা, এই অবদান একক ভাবে তাঁর সমকালীন ও পরবর্তী কবিদের ওপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই প্রভাবপ্রসঙ্গটিকে উদার দৃষ্টিতে দেখা দরকার। উদীয়মান কবি উদিতকবির কাব্যপাঠ ও কাব্যালোচনা করেই যাত্রা শুরু করেন। একেই অনুকরণাত্মক অধ্যায় বলেছি। প্রকাশধর্মী অধ্যায়ের পূর্বে এর ভূমিকাটি গুরুত্বপূর্ণ। শুধু তাই নয়, পরিণত বয়সের রচনার মধ্যেও পূর্বসূরীদের প্রভাব যে কখনো কখনো বিশিষ্ট শব্দে, চিত্রকল্পে এমনকি ভাবকল্পনায় ধরা পড়ে একথাও স্বীকৃত হয়েছে। একে ঐতিহ্যের অনুবর্তন বলতে হয়।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৪০-১৯২৬) 'স্বপ্নপ্রয়াণ' শীর্ষক রূপক কাব্যটি প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ সালে। এর আগেই অবশ্য এটি অংশত প্রকাশিত হয় ১৮৭০ সালে বঙ্গদর্শন পত্রিকায়। এর বহুপূর্বে, অর্থাৎ ১৮৫৮ সালে বিহারীলালের রূপকাশ্রয়ী গদ্যরচনা 'স্বপ্নদর্শন' প্রকাশিত হয়। এই গদ্যরচনা সম্পর্কে আলোচনাকালে উল্লিখিত হয়েছে যে কবি তাঁর কিছু কবিতা আর গদ্যরচনাটি দ্বিজেন্দ্রনাথকে প্রেরণ করেন। যে চিঠির সঙ্গে এই রচনাগুলি প্রেরিত হয় সেটি লিখিত হয়েছিল ১৮৬৪ সালে।

'স্বপ্নপ্রয়াণ' পাঠ করতে গিয়ে প্রথমেই 'স্বপ্নদর্শনে'র সঙ্গে এর নামগত ঐক্যটি চোখে পড়ে। দুটিই রূপকাশ্রয়ী। এ ছাড়া দুটি রচনার মধ্যে আর কোন প্রকার সাদৃশ্য সহজলভ্য নয়। 'স্বপ্নদর্শনের' মৌলপ্রেরণা স্বদেশপ্রেম, স্বপ্নপ্রয়াণের ক্ষেত্রে তা নয়।

সারদামঙ্গল কাব্য ১৮৭০ থেকেই রচিত হতে থাকে কিন্তু প্রকাশিত হয় ১৮৭৯ সালে, স্বপ্নপ্রয়াণ প্রকাশিত হবার চার বছর পরে। এই পর্বে বিহারীলালের উপর বরং দ্বিজেন্দ্রনাথের কিছু প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

প্রথম প্রভাব সর্গবিভক্তিতে। কাহিনী কাব্যের সর্গবিভক্তি তত্ত্বাশ্রয়ী কাব্যে প্রয়োগ করেছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ, যদিও তাঁর তত্ত্ব পরিবেশিত হয়েছে একটি আখ্যানের আধারে। বিহারীলালও তাঁর সারদা-চেতনাকে 'সারদামঙ্গল' কাব্যের আধারে প্রকাশ করেছেন, আর মিলন-বিরহ-সঞ্জাত ভাববৈলক্ষণ্যকে সর্গবিভক্তির মধ্যে উপস্থিত করেছেন। স্বপ্নপ্রয়াণের নায়ক কবি স্বয়ং; 'সারদামঙ্গলে'র আদর্শনায়ক পরিকল্পনায় শুধু নয়, সমগ্র কাব্যচেতনা বিহারীলালএর আত্মমগ্নতায় বিধৃত। উভয়কবির কাব্যে কবিস্বরূপ আর ব্যক্তিস্বরূপ ঐক্যবদ্ধ, যদিও দ্বিজেন্দ্রনাথের কবিসত্তাই প্রবল, বিহারীলালের ক্ষেত্রে কবিসত্তার পরিণতি ঘটেছে সাধকসত্তায়।

'সারদামঙ্গল' কাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে ঐ কাব্যের প্রথম সর্গের

দশম স্তবকের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের' শান্তি প্রয়াণ নামক সর্গের ১৫৫তম স্তবকের ভাষা ও ভাবগত সাধর্ম্যের কথা আগেই উল্লেখ করেছি।

এই বন্ধুদ্বয়ের কাব্যদেহ যে ভাষায় রচিত তার মৌলিকতা সম্পর্কে বিহারীলালের ভাষা-দক্ষতা প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে। যে ভাষায় কাব্যরচিত হচ্ছে তার উপযোগিতা সম্পর্কে বিহারীলাল সবসময় সচেতন ছিলেন না একথা স্বীকৃত হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ কিন্তু এবিষয়ে যে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন তার প্রমাণ তাঁর কাব্যগ্রন্থের প্রারম্ভে 'বানান বিষয়ক গোটা দুই মন্তব্য'। বিহারীলালের শব্দযোজনা এবং কিছু শব্দের বানান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। শুধু এইটুকু উল্লেখ করাই এখানে যথেষ্ট যে প্রাত্যহিক জীবনের কথ্য ভাষাকে কাব্যে ব্যবহার করার কৃতিত্ব উভয়েরই এবং এর জন্য দ্বিজেন্দ্রনাথ যথেষ্ট পরিমাণে প্রশংসিত। এই প্রসঙ্গে বোধহয় বলা সঙ্গত যে দুই বন্ধুর উপর প্রভাবের স্বরূপটি ছিল পারস্পরিক।

বিহারীলালের সার্থক উত্তরাধিকার আর উত্তমাধিকার পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'গুণগ্রাহী রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে প্রমথনাথ চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের বিহারীলাল শীর্ষক প্রবন্ধের উল্লেখ করে বলেছেন যে ঐ প্রবন্ধে তিনি গুরুঋণ পরিশোধ করেছেন। যাই হোক একথা সবাই এবং রবীন্দ্রনাথ স্বয়ংও স্বীকার করেছেন যে তাঁর উপর বিহারীলালের প্রভাব ছিল খুব বেশী পরিমাণেই। এই অনপনেয় প্রভাব তীব্রতর হয়ে উঠেছিল বৌঠান কাদম্বরীদেবীর সকৌতুক মন্তব্যে, এ তথ্য সবার জানা আছে। প্রাক্-মানসী পর্বে এ প্রভাব প্রত্যক্ষ। প্রাক্-মানসী পর্বে কবির ভাষায়, 'কাব্যে ভূসংস্থানে ডাঙ্গা জেগে ওঠেনি বলেই বিহারীলালের এ প্রভাব অস্বীকার করার যোগ্য নয়।'[২] প্রতিভার সার্বিক বিকাশেরও প্রস্তুতি পর্ব থাকে, আর তার মূল্যও যথেষ্ট, এ কথা আমরা আগেই বলেছি। রবীন্দ্রনাথের সামনে একদিকে ছিল ঘটনাপ্রধান বহির্মুখী কাব্যধারার ঐতিহ্য আর অন্যদিকে ছিল

ঘটনা-বিরল অন্তর্মুখী কাব্যধারার ঐতিহ্য। বলাবাহুল্য, এই অন্তর্মুখী ধারার ধারক ছিলেন বিহারীলাল। রবীন্দ্রনাথ কাহিনী-প্রধান ধারায় আপন শক্তির পরিচয় দেবার চেষ্টা করলেও নানাদিক থেকে সেখানে বিহারীলালের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট।[৩] 'মানসী' পর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কালানুক্রমিক রচনা তালিকাটি এইরকম।

১৮৭৮	কবি কাহিনী	আখ্যান কাব্য
১৮৮০	বনফুল	আখ্যান কাব্য
১৮৮১	বাল্মীকি প্রতিভা	গীতিনাট্য
১৮৮১-৮২	ভগ্নহৃদয়	নাট্যকাব্য
	য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র	ভ্রমণ
	সন্ধ্যা সঙ্গীত	কাব্য
১৮৮২	কালমৃগয়া	গীতিনাট্য
১৮৮৩-৮৪	বউঠাকুরাণীর হাট	উপন্যাস
	প্রভাত সংগীত	কাব্য
	বিবিধ প্রসঙ্গ	প্রবন্ধ
	ছবি ও গান	কাব্য
১৮৮৪-৮৫	প্রকৃতির প্রতিশোধ	নাট্যকাব্য
	নলিনী	গদ্যনাট্য
	শৈশব সংগীত	কবিতা
	ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী	কবিতা
	রামমোহন রায়	প্রবন্ধ
১৮৮৫	আলোচনা	প্রবন্ধ
	রবিচ্ছায়া	সংগীত
১৮৮৬-৮৭	কড়ি ও কোমল	কবিতা
	রাজর্ষি	উপন্যাস।
	চিঠিপত্র	পত্রাকারে প্রবন্ধ
১৮৮৮	সমালোচনা	প্রবন্ধ
	মায়ার খেলা	গীতিনাট্য

১৮৮৯	রাজা ও রানী	নাট্যকাব্য
১৮৯০	বিসর্জন	নাট্যকাব্য
	মন্ত্রি অভিষেক	প্রবন্ধ
	মানসী	কবিতা।

এই তালিকার মধ্যে 'শৈশব সংগীত' পর্যন্ত কবির উপর প্রভাব প্রসঙ্গ নিয়ে অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনের আলোচনা অত্যন্ত উপাদেয়।[৪] ইনি রবীন্দ্রনাথের উপর মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও বিহারীলালের প্রভাব-প্রসঙ্গ উদ্ধৃতি-সহ অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে আলোচনা করেছেন। সে আলোচনা ভাব ছন্দ প্রভৃতিকে আশ্রয় করেই করা হয়েছে। তাঁর মতে 'প্রকৃতির খেদ' (১ম ও ২য় পাঠ, ১৮৭৫) কবিতাটি 'সারদামঙ্গলে'র ভাব পরিবেশ ও রচনাদর্শে গঠিত অর্থাৎ অনুকরণ-দোষে দুষ্ট। তথাপি স্বীকার করতে হবে কাব্যোৎকর্ষের বিচারেও এটি 'শৈশবসংগীত' বা 'বনফুল'-এর অনেক রচনার চেয়ে অপকৃষ্ট নয় এবং শৈশবসংগীত বা বনফুলে অনুকরণচিহ্নেরও অভাব নেই।[৫]

প্রবোধচন্দ্র সেন একথাও স্বীকার করেছেন যে, যে সকল কবিতাকে রবীন্দ্রনাথ নির্মমভাবে বর্জন করতে চেয়েছেন তার অনেক গুলিই কাব্য-রসোত্তীর্ণ। যাই হোক, প্রাক্-মানসী পর্যায়ে বিহারীলালের প্রভাব সর্বস্বীকৃত। তার সঙ্গে এটিও স্বীকার্য যে এই দীর্ঘকালের মধ্যে রবীন্দ্রপ্রতিভা পথের সন্ধান পেয়েছে। 'কবি-কাহিনী' আর 'বনফুলে'র অধ্যায় থেকে তাঁর প্রত্যাবর্তন সম্পূর্ণ হয়েছে।

কিন্তু প্রভাব যখন কবির পরিণত লেখনীর মুখ দিয়ে ইঙ্গিতে প্রকাশিত হয় তখন তার সৌন্দর্য খুবই তৃপ্তিদায়ক। মানসীর উত্তর-পর্বে সেই ইঙ্গিত বহুক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। বিহারীলালের 'সারদা'-পরিকল্পনা কবির জীবনদেবতা-বোধকে উদ্দীপ্ত করেছে, সেই বোধ মানসী আর লীলাসঙ্গিনীতে পরিণতি লাভ করেছে, একথা 'সারদামঙ্গল' আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করেছি। এই কবি-

'মানসী'র মধ্যে সারদার মতই প্রেমপ্রীতি ও ভক্তি উন্মেষক সারস্বত চেতনা একীকৃত হয়েছে।

উনিশ শতকের নবজাগরণের অন্যতম লক্ষণ নারীকে আপন ভাগ্য জয় করে নেবার অধিকার দান। এই যুগে নারী স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিতা হলেন। কবিরা নারী-প্রশস্তি রচনা করলেন। সে নারী কখনো শৌর্য বীর্যের প্রতীক, কখনো প্রেমের, কখনো সৌন্দর্যের আবার কখনো একাধারে জননী, গৃহিণী, ভগিনী ও দুহিতা। আবার নারীকে কেন্দ্র করে Chivalry বা বীরধর্মের প্রকাশও লক্ষ্য করা গেল এই শতকের কাব্যধারায়। ভাবতে বাধা নেই, এর মধ্যে পূর্বালোচিত কোঁতের ধ্রুব দর্শনের প্রভাবটই প্রত্যক্ষ। 'বঙ্গসুন্দরী' এর যে পথরচনা করল, তারই ধারায় রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা'কে দেখছি আমরা ১৮৯২ সালে। এই চিন্তার স্পর্শ অনুভব করতে গিয়ে আমরা পৌঁছতে পারি 'কাহিনী' (১৯০০) কাব্যের 'পতিতা,' 'ক্ষণিকা' (১৯০০) কাব্যের 'কল্যাণী', 'বলাকা' (১৯১৬) কাব্যের 'দুইনারী', 'পলাতকা' (১৯১৭) কাব্যের 'মুক্তি' আর 'মহুয়া' (১৯২৯) কাব্যের 'সবলা' কবিতাগুলির পর পর ধারায়। একে বলা যাবে নারীকাব্যধারার ঐতিহ্য সৃষ্টি।

'বাল্মীকি প্রতিভা'র মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে বিহারীলালের অনুকৃতিটি প্রত্যক্ষ করে তুলেছেন তার স্বীকৃতি আছে। তিনি বলেছেন, 'সেই নাটকের মূল ভাবটি, এমনকি স্থানে স্থানে তাহার ভাষা পর্যন্ত বিহারীলালের সারদামঙ্গলের আরম্ভ ভাগ হইতে গৃহীত।'[১] প্রকৃত পক্ষে সারদামঙ্গলের ১ম ও ৩য় সর্গ থেকে বহু অংশ 'বাল্মীকি প্রতিভা'র ৩য় ও ৬ষ্ঠ দৃশ্যের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট। যেমন—

'কমলা ঠমকে হাসি ছড়ান রতনরাশি' ('সারদামঙ্গল' ১।১৮)

তুঃ 'কমলা দিতেছি আসি, রতন রাশি রাশি'

('বাল্মীকি প্রতিভা' : ৬ষ্ঠ দৃশ্য)

'যাও লক্ষ্মী অলকায়, যাও লক্ষ্মী অমরায়,
এস না এ যোগি-জন-তপোবনে আর'

('সারদামঙ্গল' ১।২০)

তুঃ যাও লক্ষ্মী অলকায়, যাও লক্ষ্মী অমরায়, এ বনে এসো না

এসো না এ দীনজন কুটিরে। ('বাল্মীকি প্রতিভা' : ৬ষ্ঠ দৃশ্য)

বিহারীলালের 'বাউল বিংশতি'র মধ্যে দ্বিতীয় সঙ্গীতটির শেষাংশ—

বিশ্বশাস্ত্র-পাঠকের প্রাণ অনন্ত উদার

স্নেহ-প্রেম-পারাবার,

মিট্‌মিটে গ্রন্থকীটে মহিমা বোঝে না তার।

তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের 'পূর্ণিমা' কবিতার শেষ অংশ,

উদ্‌ভ্রান্ত এ ভকতেরে

এতক্ষণ ঘুরাইলে ছলনার ফেরে।

কী জানি কেমন করে লুকায়ে দাঁড়ালে

একটি ক্ষণিক ক্ষুদ্র দীপের আড়ালে

হে বিশ্বব্যাপিণী লক্ষ্মী। মুগ্ধ কর্ণপুটে

গ্রন্থ হতে গুটিকত বৃথা বাক্য উঠে

আচ্ছন্ন করিয়াছিল, কেমনে না জানি,

লোকলোকান্তরপূর্ণ তব মৌনবাণী। (চিত্রা)

ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে সম্পর্করহিত শুদ্ধ সৌন্দর্যবাদের প্রচারক বিহারীলাল আর তার প্রতিষ্ঠাতা রবীন্দ্রনাথ। এ সৌন্দর্যবাদ ও প্রেমচেতনা বিহারীলালের ক্ষেত্রে যে প্লেটোনিক নয় সে কথা আগেই বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে এ কথাও বলা হয়েছে যে বিহারীলালের জীবনে মর্ত্যমানবীকে কেন্দ্র করেই এর আদর্শায়ন ঘটেছে। আর এই জন্যেই বিহারীলালের অন্তরে সৌন্দর্য, প্রেম ও সারস্বত প্রেরণা নিগূঢ় ঐক্যের বন্ধনে বন্দী হয়ে থেকেছে। 'সারদামঙ্গলে'র উপসংহারে কবির অকপট ঘোষণা—

তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী,

আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি,

হোক্‌গে এ বসুমতী যার খুসী তার!

ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্বর্গ ফললাভ ঘটেছে এই প্রেমাত্মক

সৌন্দর্যলোকের মধ্যে। পৃথিবীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি আকর্ষণ যে নেই কবির, সে কথা 'সঙ্গীত শতকে'র সূত্রপাত থেকে শুনেছি আমরা। শুনেছি কবির সুখ প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগে; পিতামাতার স্নেহ ভালোবাসায় আর 'অনুরাগী প্রমদার অমায়িক ব্যবহারে।' এর সঙ্গে 'সারদা মঙ্গলে'র পর্বে যুক্ত হয়েছে স্বাতন্ত্র্য প্রেরণার নির্যাস। প্রেমের আর সৌন্দর্য-তন্ময়তার এই নতুন রীতি আত্মস্থ করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

কবিগুরু তাঁর সমগ্র সাধনাকে অসীমের সঙ্গে সীমার মিলন-প্রয়াস বলে চিহ্নিত করেছেন। এই মিলনপ্রয়াসের যে প্রস্তুতিপর্ব, সেখানে বিহারীলালের প্রভাব বৃহৎ স্থান অধিকার করে আছে। দৃশ্যমান জগতে সৌন্দর্যসত্তার পটভূমিতে ভাগবত উপলব্ধি ও মানব-প্রেমই রবীন্দ্রচেতনার স্বরূপ। এই কবি-স্বরূপ যেদিন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের ঐতিহ্যধারা অঙ্গীকার করে নিয়ে সমকালীন যুগধর্মের আধারে স্বীয় প্রতিভার প্রকাশ ঘটাল সেদিন দেখা গেল মহত্তম আর সুন্দরতম ধ্যানধারণার দুর্লভ সমাবেশ ঘটেছে রবীন্দ্রনাথে।

পাশ্চাত্যবাসী প্রকৃতির সঙ্গে তাদের জীবনকে ঐক্যসূত্রে বন্দী করতে পারেনি বলে প্রকৃতি সম্পর্কে তাদের অনুসন্ধিৎসা আছে। প্রকৃতির কোলে তাদের আনন্দ হয়ে ওঠে উচ্ছ্বসিত। এদিকে প্রাচ্যের মানুষ যেন জন্মসূত্রেই প্রকৃতির সঙ্গে আত্মিক সম্পর্কে আবদ্ধ। এর ফলে প্রকৃতি সম্পর্কে তার অহেতুক কৌতূহল নেই, প্রকৃতিকে নিয়ে অকারণ উচ্ছ্বাস নেই তার। প্রকৃতি তার দৈনন্দিন জীবনেরই অন্যতম অঙ্গ। তবু উনিশশতকের কাব্য সাহিত্যে প্রকৃতি সম্পর্কে কৌতূহলের প্রকাশ আছে, প্রকৃতির বৈচিত্র্যকে নিত্য নূতন অর্থে গ্রহণ করার প্রয়াস আছে। এ হয়ত পাশ্চাত্য ঐতিহ্যের প্রভাব, কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে অন্তরঙ্গতার উদাহরণ আমাদের পূর্বতন সাহিত্যের ধারায় অজস্র।

বিহারীলালের প্রকৃতি-প্রীতির মধ্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ধারার

সামঞ্জস্য ঘটেছে। এ কথা স্বীকৃতও হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও সেই ধারা অব্যাহত ভাবে প্রবাহিত হয়ে এসেছে। রবীন্দ্রনাথও যতদিন দেখলেন প্রকৃতিকে তারই সঙ্গে একাত্ম হয়ে, ততদিন তার বাণী অকথিত রয়ে গেল, তার সৌন্দর্য দৃষ্টিগ্রাহ্য স্তর পেরিয়ে অনুভূতিলোকে গিয়ে পৌঁছুলো না—'ফুলের মতন ছিল সে মৌন মনের আড়ালে ঢাকা।' প্রকৃতির আবেদন বহিরিন্দ্রিয়ের কাছেই সীমাবদ্ধ সেদিন।

জীবনের সাধনার পথে অগ্রসর হলেন কবি। অন্যান্য নানা ক্ষেত্রের মত প্রকৃতিও একদিন তার সুরভিময় শতদলটিকে আপন সত্যস্বরূপে কবির অনুভূতিলোকে প্রস্ফুটিত করে তুলল। প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর কবিসত্তার—

কী যে হল কানাকানি
দিল সে তোমার গলে আপন গলার মালাখানি।
মুগ্ধচক্ষে হেসে
তোমারে সে
গোপনে দিয়েছে কিছু যা তোমার গোপন হৃদয়ে
তারার মালার মাঝে চিরদিন রবে গাঁথা হয়ে।

('বলাকা', ১৭)

এই উপলব্ধির ক্ষেত্রে কবি যখন উপনীত হয়েছেন তখন কিন্তু 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য', 'গীতালি'র যুগ পেরিয়ে আমরা 'বলাকা'র যুগে উপনীত হয়েছি। একদিন কবিকণ্ঠে যে প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছিল—

যেন আমার গানের শেষে
থামতে পারি সমে এসে,
ছয়টি ঋতুর ফুলে ফলে
ভরতে পারি ডালা— ('গীতিমাল্য', ৪০)

এতদিনে সে প্রার্থনা নিশ্চয় মঞ্জুর হয়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে ভাবসম্মেলন সম্পূর্ণ হয়েছে। 'বলাকা'র যুগে এই ভাবসম্মেলনের মধ্যে অধ্যাত্মচেতনার সুর লেগেছে, তাই প্রকৃতিও প্রায় ক্ষেত্রে তত্ত্বে

পরিণত হয়েছে। নারীর ক্ষেত্রে যেমনি দু'টি রূপের সন্ধান পেয়েছেন কবি—

একজনা উর্বশী, সুন্দরী,
বিশ্বের কামনা-রাজ্যে রাণী,
স্বর্গের অপ্সরী।
অন্যজনা লক্ষ্মী সে কল্যাণী,
বিশ্বের জননী তাঁরে জানি,
স্বর্গের ঈশ্বরী। (বলাকা-২৩)

একজন the beautiful আর অন্যজনা the good। তেমনি প্রকৃতিকেও দেখেছেন দু'টি রূপে, একটি—

* * বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপে,
রাগরক্ত কিংশুকে গোলাপে,
নিদ্রাহীন যৌবনের গানে। (ঐ)

আর অন্যটি—

অশ্রুর শিশির-স্নানে
স্নিগ্ধ বাসনায়;
হেমন্তের হেমকান্ত সফল শান্তির পূর্ণতায়; (ঐ)

প্রকৃতি-বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথের এই রোম্যান্টিক দৃষ্টি বিহারীলালের কাছে তাঁর ঋণের পরিচয় দেয়। এ বিষয়ে জনৈক সমালোচকের বক্তব্য 'প্রাচীন কালের সৃষ্টিতে রোম্যান্টিক আনন্দ খুঁজে পাওয়ার কথা ছেড়ে দিলেও প্রকৃতির প্রতি বিহারীলালের দৃষ্টি সাধারণভাবে রোম্যান্টিক ভঙ্গীর পরিচয় দেয়। সমাধানহীন রহস্যের মধ্যে জানা-অজানার মিশ্রণে যে আনন্দের উৎপত্তি রোম্যান্টিক কবির প্রধান উপজীব্য, বিহারীলালের কাব্যে তার অভাব নেই। রোম্যান্টিক বিষাদের সুরটিও তাঁর রচনাকে গভীরতা দান করেছে। প্রকৃতির প্রতি এই নূতন দৃষ্টির পরিচয়ে বিহারীলালের নিকট রবীন্দ্রনাথের ঋণ প্রচুর।'[১]

বাল্যে হিমালয় দর্শনে যাত্রা করেন কবি, সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর রচনা করেন বনফুল কাব্য। এর মধ্যে হিমালয় বর্ণনার যে অংশ আছে তার মধ্যে বিহারীলালের প্রভাব প্রায় অনুকরণাত্মক। বনফুল প্রকাশিত হয় ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে। ইতিমধ্যে বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল। নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত প্রভৃতি প্রকৃতির বর্ণনা সমকালীন কাব্যধারার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এই প্রকৃতিবর্ণনায় ও অনুভবের ধারায় অভিস্রাত। 'বনফুলে'র মধ্যে 'বঙ্গসুন্দরী'র ছন্দ, 'সারদামঙ্গলে'র বর্ণনা প্রভৃতির প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট।

প্রকৃতিকে প্রাণবন্ত কল্পনা করে তারই পটভূমিতে আপন সুখ দুঃখকে এক করে দেখবার রোম্যাণ্টিক ভঙ্গীর ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের উপর বিহারীলালের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিহারীলালের এ প্রভাব রবীন্দ্রনাথ স্বেচ্ছায় স্বীকার করে নিয়েছিলেন। বিহারীলালের 'শরৎকাল' কাব্যগ্রন্থের 'সন্ধ্যা সঙ্গীতে' আছে—

চাহিতে আকাশ-পানে
কি যেন বাজিছে প্রাণে,
কাঁদিয়া উঠিছে যেন তারা সমুদয়। (১১)

রবীন্দ্রনাথের 'শৈশব সংগীতে'র 'অতীত ও ভবিষ্যৎ' কবিতায় শুনি—

কি যেন হারানো ধন কোথাও না পাই খুঁজে,
কি কথা গিয়াছি যেন ভুলে,
বিস্মৃতি, স্বপনবেশে পরাণের কাছে এসে
আধস্মৃতি জাগাইয়া তুলে।

প্রকৃতিপ্রাণতায় উভয়েই এক। আবার অতৃপ্তিজনিত বিষাদের বর্ণনায়ও উভয়কবি একই পথের পথিক। রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও বিহারীলালেরই মত এই বিষাদমিশ্রিত চিন্তা একটি বিশেষ অংশ হিসেবে চিহ্নিত। বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন প্রকার চিন্তার মধ্যে একধরণের শূন্যতা এই কবিযুগলকে অসীমাভিসারী করে তুলেছে। একে প্রেম-

গভীরতার একটি দিক বলেই ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছি। বলেছি, এই প্রেম এত গভীর যে মিলনের নিগূঢ় মুহূর্তেও তা বিরহের বেদনায় অভিসিঞ্চিত। নরনারীর প্রেম বা প্রকৃতিপ্রেমের ক্ষেত্রে এই বিষয়ে কোন পার্থক্য নেই।

একটি কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতিচিত্রণের বেলায় রবীন্দ্রনাথের উপর বিহারীলালের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে থাকলেও একাধিক স্থানে রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য অনায়াসেই চোখে পড়ে। বিহারীলাল বিশ্বপ্রকৃতিকে প্রাণবন্ত করে দেখেছেন, তাকে একান্ত-ভাবে আপন মানসিকতারই সঙ্গী হিসেবেই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু প্রথম থেকেই প্রকৃতির বহিরঙ্গ সৌন্দর্যের রূপটিই তাঁর কাছে বড় হয়ে থেকেছে। প্রকৃতিকে রমণী কল্পনা করে তার সঙ্গে আপনার প্রণয়ের সম্পর্কের কথা বিহারীলাল বলেছেন, কিন্তু প্রকৃতির ধ্বনিময় দিকটি বা সঙ্গীতসৌন্দর্যের দিকটি প্রায় অবহেলিতই থেকে গিয়েছে তাঁর কাব্যে। রবীন্দ্রনাথে এই দিকটিও যোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। কবিজীবনের সূত্রপাত থেকেই তিনি 'ভোরের আকাশে' 'বিভাস-রাগিণী'র তান শুনেছেন, পরিণত বয়সে নদীর গতিবেগের মধ্যে শুনেছেন সুরের ঝংকার। চলমান জগতের গতিবেগ রবিকবি অনুভব করেছেন বলাকার পক্ষধ্বনিরই মধ্যে। প্রকৃতিকে রবীন্দ্রনাথ শুধু চিত্ররূপেই দেখেননি, দেখেছেন ধ্বনিরূপের মধ্যেও, এইখানেই শিষ্য গুরুকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন অনেকখানি। বলাবাহুল্য প্রাচ্যচিন্তার পটভূমিতে গ্রহণ করলে, শিষ্যের এই অগ্রগমন গুরুর গৌরবই বৃদ্ধি করে। কিন্তু এই প্রকৃতিচিন্তার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের গুরু যে বিহারীলালই, সে বিষয়ে সমালোচক মাত্রেই একমত।

রবীন্দ্রনাথের প্রেমকল্পনার ধারায়ও বিহারীলালের প্রভাব অতি প্রত্যক্ষ। এই কবিদ্বয় কাব্যরচনার প্রথম যুগ থেকেই প্রেমচেতনা আর সৌন্দর্যচেতনাকে সজাগ রেখেছেন, কিন্তু এই দুটি চেতনার সঙ্গে

দৈহিক ভোগবাসনাকে এক হতে দেননি কোনক্রমেই। প্রেম ও সৌন্দর্য উপভোগের এই আদর্শায়িত রূপের কথা বিহারীলালের কাব্য আলোচনার সময় উল্লিখিত হয়েছে। এই চেতনা কবি-প্রেয়সীর মর্তকায়ার বন্ধনে পরিণতি লাভ করেছে বলে বিহারীলালের প্রেমকে প্লেটোনিক আখ্যা দেওয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু সেই আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথে এই প্রেম নির্বিশেষ স্তরে উন্নীত হয়েছে।

সৌন্দর্যচেতনা আর প্রেমচেতনা পরস্পরের পরিপূরক হয়েই দেখা দিয়েছে বিহারীলালের জীবনে। প্রেমচেতনা যখন দ্বিধাগ্রস্ত, বহির্বিশ্বের কোন সৌন্দর্যই তখন কবির কাছে নয়ন-লোভন নয়। কবির জীবনে প্রেমময়তা যে মুহূর্তগুলিকে মধুময় করে রাখে সে মুহূর্তগুলিতে সমগ্র বিশ্বই সৌন্দর্যের আকর হয়ে দাঁড়ায়। কবি বলেন—

এই যে সমুখে প্রেম
মানসমোহন!
আভাময় প্রভাজালে
আলো ত্রিভুবন। (সঙ্গীত-শতক ৫)

আবার প্রেমের অভাব হলে বলেন—

হায়, সুখময় ফুলবন
হয়েছে দাহন।
নীরব এখন—
কোকিলের কুহুরব,
অলির গুঞ্জন। (ঐ, ৯)

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই দুই চেতনা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে দেখা দিয়েছে। তিনি বলেন—

আমার নয়নে তব অঞ্জনে
ফুটেছে বিশ্বচিত্র,
তোমার মন্ত্রে এ বীণাতন্ত্রে
উদগাথা সুপবিত্র।

অতল তোমার চিত্তগহন,
মোর দিনগুলি সফেন নাচন,
তুমি সনাতনী আমিই নূতন,
অনিত্য আমি নিত্য। (পরিশেষ, তুমি)

এই দুই চেতনার একত্রিত রূপ বহুভাবে বহুবারই ব্যক্ত হয়েছে দুই কবির কাব্যে। বলা যায় এ ক্ষেত্রেও অগ্রজের প্রভাব ছিল অনুজের উপর।

বিহারীলালের প্রেমচেতনা দেবী সারদাকে আশ্রয় করে কিভাবে চরম পূর্ণতা লাভ করেছে আবার তারও পরে বিশেষের আধার সন্ধান করে অবলীলাক্রমে কবিপ্রেয়সীর মধ্যে প্রত্যাবর্তন করেছে, তা আমরা দেখেছি। প্রেমচেতনার আদর্শ স্তর যে অধ্যাত্মচেতনা, দেহগত তৃপ্তির বহু ঊর্ধ্বে স্থাপিত প্রেম যে আরাধনারই নামান্তর, এই তত্ত্ব বিহারীলালেই প্রথম পাওয়া যায়। আর এর সার্থক উত্তরাধিকারী রবীন্দ্রনাথ। বিহারীলালের জীবনে এ প্রেম—

প্রেমের সাগরে ফুলতরণী,
চির বিকশিত নলিনী।
সৌরভেতে স্বর্গ হাসে, আকাশে থেমে দাঁড়ায়—
দেখ্‌তে তোমায়, থেমে দাঁড়ায় দামিনী। (বাউল বিংশতি-১২)

আর এই স্বর্গীয় শাশ্বত প্রেমের পূর্ণতা-সন্ধানী কবি বলেছেন—

প্রেয়সীর ঢল ঢল বিকশিত আননে,
দেখি গে যোগেন্দ্রবালা যোগভোলা নয়নে।
প্রেমের প্রসন্ন মুখ, সারদার স্তোত্র গান,
এ জগতে এই দুই আছে জুড়াবার স্থান।
(সাধের আসন : শোক-সংগীত)

রবীন্দ্রনাথ 'কড়ি ও কোমল' ও 'চিত্রাঙ্গদা'র যুগ পেরিয়ে এই তত্ত্বটি অধিগত করেছিলেন। যাকে অল্পবুদ্ধি সাধুলোক 'সংসারের পাঁক' বলেন, তাতে ডুবে থেকেও পুণ্য অর্জিত হয়, এই দুর্লভ সত্যোপলব্ধি

রবীন্দ্রনাথের হয়েছিল 'চৈতালী'র যুগে। তাই তাঁর কাছে তখনই শুনেছি 'যারে বলে ভালোবাসা, তারে বলে পূজা'। আর রবীন্দ্রনাথ যে প্রেমকে ভালোবাসার গভীরতম স্তর হিসেবেই স্বীকার করেন, সে কথা প্রসঙ্গান্তরে ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি।

এই প্রেমচেতনাকে পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নত করার পরও কিন্তু বারে বারে দেহভাবনা-চিহ্নিত ছত্রের সন্ধান মেলে কবির বিভিন্ন কাব্যে। শুধু তাই নয়, প্রেম ও সৌন্দর্যচেতনাকে নির্বিশেষের আধারে চিন্তা করার পর, একধরণের বেদনাবোধ বারে বারেই কবির কণ্ঠরোধ করেছে। গভীর অতৃপ্তিবোধে কবির দু'টি চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে। প্রেমচিন্তায় এই বিরহানুভূতি ও বেদনাবোধ বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথ উভয় কবির ক্ষেত্রেই সমান।

সঙ্গীতপ্রিয়তা ও সঙ্গীতরচনার বেলায়ও রবীন্দ্রজীবনে বিহারী-লালের অবদান আছে। বিহারীলাল সুগায়ক ছিলেন না কিন্তু তাঁর সঙ্গীতপ্রীতি ছিল অপরিসীম। সঙ্গীতশাস্ত্রে যে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন এ তথ্য অনুমানের অপেক্ষা রাখে না। তাঁর রচিত প্রতিটি সঙ্গীতের সঙ্গে যথাযথ তালমানের উল্লেখ আছে। অতি সাম্প্রতিক কালে জনৈক প্রবন্ধলেখক ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী সম্পর্কে বলতে গিয়ে যে তথ্যের উল্লেখ করেছেন সেটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'বিহারীলাল চক্রবর্তীর লেখা কয়েকটি গান রবীন্দ্রনাথের মুখে শুনে সেগুলিও ইন্দিরাদেবী শিখে নিয়েছিলেন।'[৮]

গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের যে কবি-স্বরূপের প্রকাশ দেখা যায় তার সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলীর রচয়িতাদের ভাবসাযুজ্য নেই। বরং সে কবিস্বরূপ বিহারীলালের কবিস্বরূপের নিকটবর্তী। বিহারীলালের 'সঙ্গীত-শতক' প্রকাশিত হয় ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে। এই কাব্যগ্রন্থই ঠাকুরবাড়ীর সঙ্গে বিহারীলালের সম্পর্ক স্থাপন করে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কবির প্রতি আকৃষ্ট হন এবং উভয়ের মধ্যে পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর

সাহিত্যসাধক চরিতমালায় বিহারীলাল সম্পর্কিত অধ্যায়ে দ্বিজেন্দ্রনাথের যে পত্রগুলি উদ্ধৃত করেছেন সেগুলি ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত।[৯] রবীন্দ্রনাথ তখন নিতান্তই শিশু। অতএব অনুমানে বাধা নেই যে এই শৈশব থেকেই বিহারীলাল সম্পর্কে এক ধরনের সসম্ভ্রম আকর্ষণ-বোধ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন 'কি বৈষ্ণব পদকর্তাদের রচনায়, কি সমসাময়িক ইংরেজী কাব্যে, কি বিহারীলালের কাব্যে একক মনের যে অনুভূতি, ব্যক্তিগত প্রাণের যে স্পন্দন সঙ্গীতের সুরে ছন্দের ধ্বনিতে ধরা যায়, বাংলা সাহিত্যের কাব্য ঐতিহ্যের অন্যত্র কোথাও তাহা ছিল না। কিশোর রবীন্দ্রনাথের একক স্বতন্ত্র ব্যক্তিচিত্তে যে কাব্য-ঐতিহ্য, কাব্য-প্রকৃতি নূতন এক উন্মাদনার সঞ্চার করিয়াছিল তাহা গীতি কাব্যের এই একক মনের অনুভূতি, ব্যক্তিগত প্রাণের স্পন্দন। এই গীতিকাব্যিক উন্মাদনা লালিত ও বর্ধিত হইবার সুযোগ পাইল বিহারীলালের নৈকট্যে, 'বঙ্গসুন্দরী' ও 'সারদামঙ্গলে'র কাব্যছায়ায়। বিহারীলালকে যে রবীন্দ্রনাথ একাধিক বার গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন তাহা অনেকটা বিনয়নম্র স্বীকৃতি হইলেও একেবারে অসার্থক নয়।'[১০] রবীন্দ্রনাথরচিত গানগুলির মধ্যে যেগুলি প্রকৃতি ও প্রেমমূলক সেগুলির ভাববস্তুর সঙ্গে বিহারীলালের প্রেম ও প্রকৃতিমূলক কবিতা ও সঙ্গীতের যে ঐক্য আছে তা আলোচনার অপেক্ষা রাখে না।

বিহারীলাল যাকে 'মৈত্রী, প্রীতি আর সরস্বতী' অনুভূতি বলে বর্ণনা করেছেন তা যে মূলত প্রেম সৌন্দর্য ও অধ্যাত্ম চেতনা সে কথা একাধিকবার আলোচিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে চিন্তা করতে গেলে এই তিনটি দিকই অনুভূত হয়। এই তিনের সমন্বয়েই এই জগৎ এবং এই তিনটি ভাবের সার্থক উপলব্ধির উপরই চিন্তাশীল মানুষের স্বীয় জীবনদর্শন নির্ভরশীল। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যসাধনা এই তিনটি চেতনাকেই আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। বিহারীলালের অধ্যাত্ম অনুভূতি সারদামূর্তিতে ধরা দিয়েছিল। তিনি

নিখিল বিশ্বের কান্তি, প্রেম ও জ্ঞানস্বরূপিণী, আবার কবির কাব্যজীবনের নিয়ন্ত্রণকর্ত্রীও বটে। যিনি সমগ্র বিশ্বের মধ্যে পরিব্যাপ্ত, যিনি 'ত্রিদিব সুষমা,' তিনি আবার কবির 'হৃদয় রাণী' ও বটে। এই প্রসঙ্গেই আলোচিত হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা-কল্পনা বিহারীলালের সারদাচেতনার প্রভাবসঞ্জাত। এই জীবনদেবর্তা এবং বিশ্বধ্যেয় ঈশ্বর এক নন, কিন্তু কবির সৃজনধর্মী জীবন বা কবি সত্তা এঁরই ইঙ্গিতে নিয়ন্ত্রিত।

প্রাক্-সারদামঙ্গল যুগে বিহারীলালের কবিসত্তা যে সরস্বতীকে দর্শন করেছিল তার সঙ্গে পরবর্তী যুগের সারদার সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষীণ। ধীরে ধীরে বীণাবাদিনী বাগেদবী কবিকল্পনায় প্রেম ও সৌন্দর্যের সারভূতা দেবী সারদায় রূপান্তরিত হয়ে গেলেন, তাঁর সঙ্গে মিলন বিরহের হাসি কান্নায় 'সারদামঙ্গল' এবং 'সাধের আসন' সম্পূর্ণ নতুন কাব্যমূল্যে প্রতিষ্ঠিত হোল। একটি পরিণত কবিসত্তা সারদাচেতনায় মগ্নচৈতন্য হয়ে গিয়ে নিজের 'জীবন সাধনধন' তাঁর পায়েই সমর্পণ করে দিল। রবীন্দ্রনাথও ঠিক এই ভাবে জীবন দেবতা চেতনাকে অনুভব করে বলেছেন—

বলিতেছিলাম বসি এক ধারে
আপনার কথা আপন জনারে,
শুনাতেছিলাম ঘরের দুয়ারে
ঘরের কাহিনী যত—
তুমি সে ভাষারে দহিয়া অনলে
ডুবায়ে ভাসায়ে নয়নের জলে
নবীন প্রতীমা নব কৌশলে
গড়িলে মনের মতো। (অন্তর্যামী)

এ অভিজ্ঞতা কবি বিহারীলালেরও একই স্তরের। 'বন্ধুবিয়োগ' আর 'প্রেম প্রবাহিণী'র মধ্যে শুরু হয়েছিল অতি পরিচিত আপনজনদের কাহিনী বলা। সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা নিয়ে নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে পূর্বসূরী

কবিগোষ্ঠীর রীতি অনুবর্তনের ইচ্ছা নিয়েই হয়ত যাত্রারম্ভ হয়েছিল। কিন্তু সে কবিরও নবীন চেতনা নবীন প্রতিমা গঠনের শক্তি দিয়েছে পরবর্তী কালে। আর এই নবীন চেতনা সারদাচেতনারই নামান্তর।

রবীন্দ্রনাথ যখন 'সোনার তরী' লিখছেন তখনই এই নবীন চেতনা 'মানস সুন্দরী' হয়ে দেখা দিতে শুরু করেছে। সেখানে লক্ষ্য 'কবিতা কল্পনালতা।' কিন্তু তিনিই হয়ে উঠেছেন 'জীবনের প্রথম প্রেয়সী' এবং তাঁকেই 'পরশ বন্ধনে' লাভ করবার কামনাও হয়েছে তীব্র। একে প্রেম চেতনার বিচিত্র প্রকাশ বলেই গ্রহণ করতে হয়। এ কথাও কিন্তু স্মরণীয় যে এর মধ্যে সৌন্দর্যচেতনা অনুস্যূত হয়ে আছে। এখান থেকেই এই ঐক্যবদ্ধ চেতনা লীলাসঙ্গিনী রূপ পরিগ্রহ করেছে। 'চিত্রা'য় এসে রূপটি আর চেতনাটি স্পষ্টতর হয়ে প্রেম আর সৌন্দর্য চেতনার সঙ্গে অধ্যাত্মচেতনার সংমিশ্রণ ঘটল। এখানে এসে কবির এই ত্রিমুখী চেতনাটি জীবনদেবতার আধারে জীবন্ত হয়ে উঠল, এবং তার সঙ্গে মিলন-বিরহের লীলায় কবিসত্তা মগ্ন হয়ে গেল।

কবির জীবনদেবতাচেতনা যে বিহারীলালের সারদাচেতনার প্রভাবসঞ্জাত সে কথা বহুবার উল্লিখিত হয়েছে। যে তিনটি ধারার সমন্বয়ে সারদাচেতনার উদ্ভব, রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও সমান্তরাল সে তিনটি ধারা দেখা গেল। বিহারীলাল এই চেতনাকে কবিপ্রেয়সীর মধ্যে প্রমূর্ত দেখেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাকে কবিসত্তার প্রেরণা-রূপিণী মূর্তিতে দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ যে আরও অগ্রসর হয়ে এই প্রেরণাদাত্রী জীবন-সঙ্গিনীকে জন্মজন্মান্তরে প্রবহমাণ জীবনধারার সঙ্গে নিবিড় বন্ধনসূত্রে বন্দী দেখেছেন, এখানে তাঁর কৃতিত্ব অবিসংবাদিত। 'সিন্ধুপারে' গিয়েও কবি প্রশ্ন করেন, 'এখানেও তুমি জীবন দেবতা?' এর অর্থ এই যে কবিজীবনের সঙ্গে জীবনদেবতার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

দীর্ঘকাল পরে 'পূরবী'র যুগে গিয়েও কবি এই চেতনার প্রভাব অনুভব করেছেন। সেখানে গিয়ে এই লীলাসঙ্গিনী'কে প্রশ্ন করেছেন—

এবার কি তবে শেষ খেলা হবে
নিশীথ অন্ধকারে।
মনে মনে বুঝি হবে খোঁজাখুঁজি
অমাবস্যার পারে ?

এ যে জন্মজন্মান্তরের সম্পর্ক, প্রেরণারূপিণী এই সত্তার অধিষ্ঠান ছাড়া কবিজীবনই ব্যর্থ। এ বোধ কবির জীবনে অত্যন্ত স্পষ্ট। বিহারীলালের কাছে কিন্তু সারদাচেতনার ব্যাপ্তি এতখানি নেই। সেখানে তাঁর চেতনা প্রেয়সীর মর্ত্যকায়ায় লীন হয়ে গিয়ে অভিষ্ট ভাবের যেন মূর্ত বিগ্রহকে পেয়েছে। প্রাপ্তির আনন্দে সেখানে বিহারীলাল উচ্ছ্বসিত।

রবীন্দ্রকাব্যের প্রযুক্তিগতক্ষেত্রে বিহারীলালের প্রভাব প্রসঙ্গে বলতে হয় যে বঙ্গসুন্দরীর ছন্দ মাত্র প্রথম জীবনে স্বেচ্ছায় অনুকরণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। পরবর্তীকালে আপন বক্তব্যকে তুলে ধরার জন্য প্রয়োজনীয় ছন্দের কাঠামো কবি নিজেই নির্মাণ করে নিয়েছেন। ভাষার ক্ষেত্রে আক্ষরিক সামঞ্জস্য মোটেই বিচার্য নয়। ভাষার প্রসাদ ও মাধুর্যগুণ উভয় কবিরই আয়ত্তাধীন ছিল, আর তা যে ছিল তার কারণ এই যে, চিন্তার ক্ষেত্রে এদের কারও কোন প্রকার অসঙ্গতি বা আবিলতা দেখা যায়নি। সব মিলিয়ে একথা তবু অবশ্যই বলতে হয় যে কবি রবীন্দ্রনাথের উপর কবি বিহারীলালের প্রভাব ছিল সর্বাত্মক। এই প্রভাব সত্ত্বেও কিন্তু বিহারীলালের ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। বিহারীলাল সম্পর্কে তাঁর প্রবন্ধটিই এর প্রমাণ। যাই হোক এই সচেতনতা শিষ্যকে গুরুর ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে মুক্ত থাকতে প্রেরণা যুগিয়েছে। এখানেও গুরুর চাইতে শিষ্যের প্রতিভা যে অনেক উচ্চ শ্রেণীর তার প্রমাণ পাওয়া গেল।

বিহারীলালের প্রভাব দ্বিতীয় যে কবির কাব্যে দর্শনীয় তিনি হলেন সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৩৮-৭৮)। জীবিতাবস্থায় 'ষড়্ঋতু

বর্ণন,' 'সবিতা সুদর্শন' ও 'বর্ষবর্তন' এই তিনখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কিন্তু যে 'মহিলা' কাব্যে কবির যথোচিত স্ফুরণ ঘটে, সেটি প্রকাশিত হয় কবির মৃত্যুর পরে।

'মহিলা' কাব্য পরিকল্পনায় বিহারীলালের প্রভাব সমস্ত সমালোচক স্বীকার করেছেন।'[৮] 'অবতরণিকা' অংশে কবি প্রথমেই দেবী সারদার বন্দনা করেছেন। তারপরই ঘোষণা—

বর্ণিতে না চাই হ্রদ, নদ, সরোবর,
সিন্ধু শৈল, বন, উপবন,
নির্মল নির্ঝর, মরু-বালুর সাগর,
শীত গ্রীষ্ম বসন্ত বর্ষা।

কারণ তাঁর বাসনা—

গাবো গীত খুলি হৃদি দ্বার
মহীয়সী মহিমা মোহিনী মহিলার।

তাঁর মনের বাসনা স্পষ্টতর করে বললেন —

স্মরি চির উপকার
দিব গীত উপহার
শুধিবারে ধার মমতার,
মায়া কায়া মাতা, ভগ্নী, নন্দিনী, জায়ার।

এ পরিকল্পনার প্রেরণা উৎস যে কোঁতের ধ্রুব দর্শন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই। 'সমুদয় নারীজাতি নায়িকা আমার'-এই মনোভাবটি বিহারীলালের 'বঙ্গসুন্দরী'র পরিচয়সঞ্জাত। কিন্তু নারীর রূপচিন্তা কবির বর্ণনার বিষয় বলে যখন ঘোষিত হয় তখন কোঁতের প্রভাবটিই স্পষ্ট হয়। আমরা প্রসঙ্গান্তরে উল্লেখ করেছি যে কোঁৎ নারীর জননী, গৃহিণী, ভগিনী আর দুহিতা এই চারটি রূপ চিন্তা করেছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন যে আমাদের জীবনের উপর এঁদের প্রভাব অতুলনীয়। যাইহোক, কবি কিন্তু মাতা ও জায়া ছাড়া বাকী

অংশ রচনা করে যাবার সুযোগ পাননি। 'ভগ্নী' অংশটির মাত্র চারিটি স্তবক তিনি রচনা করতে পেরেছিলেন।

তদানীন্তন সমাজে নারীজাতির যথেষ্ট মর্যাদার অভাব বিহারীলাল আর সুরেন্দ্রনাথ উভয়কেই পীড়িত করেছে। নারী-শিক্ষার অভাব সম্বন্ধে উভয়েই সরব, সমাজে নারীর অবরোধপ্রথার বিরুদ্ধে উভয়ই সোচ্চার। বিহারীলাল বলেন—

অনা'সে দুরাত্মা পুত্র গৃহে স্থান পায়,
পাপস্পর্শ মাত্রে কিন্তু কন্যা ভেসে যায়।

(বন্ধুবিয়োগ, ১ম সর্গ)

সুরেন্দ্রনাথ বলেন—

সতীত্ব শুধু কি হয় ধর্ম রমণীর?
সতীত্ব ধর্ম নয় পুরুষ জাতির?
উভয়ে সমান পুণ্য পাপ ব্যভিচার।
পুরুষেরা অকাতরে
কেন ব্যভিচারে তরে?
কেন ধৃত দোষ শুধু হয় ললনার?
নাহি বুঝি সংসারের কেমন ব্যাভার। (জায়া: ২৩৯)

বিহারীলালের ভাবশিষ্যগণের মধ্যে প্রায় প্রত্যেক কবিই যে বিশেষ দিকটির উল্লেখের দাবী রাখেন তা হ'ল অতিপিনদ্ধ কাব্য-প্রকাশ। বিহারীলালের যোগমগ্ন কবিসত্তা কাব্যের প্রযুক্তি সম্পর্কে কোন সময়ই সচেতন হতে পারেনি। তাঁর ভাবাবেগ প্রাকৃতিক ঝরনাধারার মতই আপনার ভাববিভোরতার স্বাচ্ছন্দ্যে প্রকাশিত। কাব্যভাবনার এই বিস্রস্ততা কিন্তু তাঁর ভাবশিষ্যগণের মধ্যে মোটেই দেখা যায় না। তাঁরা কাব্যদেহ সম্পর্কে কম বেশী সচেতন।

প্রেমচেতনা যে হৃদয়ের ঔদার্য ও সৌন্দর্যচেতনার উদ্বোধক বিহারীলালের এই চিন্তাধারা সুরেন্দ্রনাথের মধ্যেও দেখা যায়। ইনিও বলেন—

প্রেমিক হও হে তুমি,
প্রেমময় হবে ভূমি,
নবীন তৃতীয় নেত্র ফুটিবে তোমার,
হেরিয়ে পৃথিবী পরি-পুরীর প্রকার। (মহিলা : ২৫৭)
এই রবি শশী তারা, এই স্থল জল,
এই তৃণ তরুলতা, এই ফুল ফল,
এই জীবজন্তু, হবে আত্মীয় তোমার,
নয়ন ফিরাবে যথা
নব নব শোভা তথা
প্রতিক্ষণে নয়নে হেরিবে অনিবার
অকারণে নয়নে ঝরিবে অশ্রুধারা। (ঐ, ২৩৮)

কবিপ্রেয়সীর মধ্যেই কবি বিহারীলাল প্রেমের পূর্ণতা সন্ধান করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথও সেই পথের পথিক। তিনিও বলেন—

আত্মার স্বাধীন গতি প্রেম নাম তার
সে প্রেম ধরায় মাত্র প্রেয়সী তোমার। (ঐ, ২৬৩)

মর্ত্য-প্রীতি, মানবিক গুণাবলীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ প্রভৃতি আধুনিক যাবতীয় লক্ষণ সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবেই প্রকাশিত হয়েছিল। নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা ও সমকালীন সমাজ সম্পর্কে সচেতনতার কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। বিহারীলালের প্রায় সমকালীন এই কবি যথেষ্ট শক্তিমান ছিলেন এবং তাঁর কবিকর্মের মূল্যও কিছু কম ছিল না। তবু কেন জানিনা তিনি যথেষ্ট মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হননি। অবশ্য নিজের রচনা প্রকাশ ও প্রচারের ব্যাপারে তাঁর একধরনের আলস্য ও অনিচ্ছা ছিল।

উনিশ শতকের অন্তর্মুখী ভাবসাধনার যে সাধন-চক্র, তার 'প্রবর্তক বিহারীলাল এবং সিদ্ধ সাধক রবীন্দ্রনাথ। আর যে দুইজন রবীন্দ্রনাথের সমকালবর্তী ও সতীর্থ তাহাদের একজন দেবেন্দ্রনাথ এবং অপরজন কবি অক্ষয়কুমার বড়াল।'[১১] দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৫-

১৯২০) সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করতে গিয়ে মোহিতলাল একথা বলেছেন। তাঁর মতে 'তাঁহার প্রতিভা আত্মমুগ্ধ, তিনি আপন হৃদয়ের স্বতঃ উৎসারিত ভাবনির্ঝরিণীর মধ্যে আপনাকে মুক্তি দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, আপনার অন্তরে যে স্পর্শমণি পাইয়াছেন তাহার স্পর্শে জগৎ ও জীবনকে সোনার সোনা করিতে চাহিয়াছেন; তিনি পঞ্চেন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়া অনাবিল প্রীতির মন্ত্রে সৌন্দর্যলক্ষ্মীর আরাধনা করিয়াছেন, কোন প্রকার চিন্তা বা বিচারকে তিনি সেই পূজাগৃহে পদক্ষেপ করিতে দেন নাই। বিহারীলালের ধ্যান ছিল। দেবেন্দ্রনাথের কেবল আরতি।'[১১] বিহারীলালের যে ভাববিভোরতা একই কালে তাঁর সামর্থ্য আর অসামর্থ্যের পরিচয় দেয়, দেবেন্দ্রনাথে সেই দোষগুণ যথেষ্ট পরিমাণেই বর্তমান।

দেবেন্দ্রনাথের কাব্যেও নারীর প্রাধান্য। এঁর 'পারিজাতগুচ্ছ', 'গোলাপগুচ্ছ', 'অশোকগুচ্ছ' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে নারীপ্রেম যে বিশেষ রূপ ধারণ করেছে, সেটি যে বিহারীলালের প্রভাবসঞ্জাত, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। কবির দাম্পত্যপ্রেমটিই তাঁর নারীচেতনার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত। উভয়েরই দাম্পত্যজীবন ছিল সুখের, তাই এ প্রেমচেতনার তৃপ্তি আর আনন্দের ভাবগুলিই প্রবল। দাম্পত্য প্রেমের আধারে এ চেতনার বিকাশ ও পূর্ণতা। মোহিতলাল তাই দেবেন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর কবিতাগুলিকে প্রেমকবিতা বলে চিহ্নিত করেন নি। আমরাও বিহারীলালের ক্ষেত্রে এ ধরনের কবিতাকে গার্হস্থ্য প্রেমমূলক কবিতা বলে চিহ্নিত করেছি।

'প্রথম চুম্বন' কবিতার একটি স্তবক—

কে আনিল আলোরাশি হৃদয় আঁধারে,
অধরের ফাঁক দিয়া
জ্যোৎস্না পড়ে উছলিয়া
দম্পতির শয্যার আগারে।

বিহারীলালের 'নিশীথ সঙ্গীত' কবিতায়—

ঘুমায় আমার প্রিয়া ছাদের উপরে,
জ্যো'স্নার আলোক আসি ফুটেছে অধরে। (শরৎকাল)

গার্হস্থ প্রেমমূলক হলেও এ প্রেম যে গৃহের পরিচিত গণ্ডির মধ্যেই সম্পূর্ণ নয়, এর আদর্শায়িত রূপ যে হৃদয়কে সমগ্র বিশ্বসৌন্দর্যের ধ্যানে আর প্রেমে কবিকে মগ্ন করেছে, এ কথা বিহারীলাল প্রসঙ্গে বলেছি। দেবেন্দ্রনাথ সম্পর্কেও সেই এক কথা। এঁদের বেলায় প্রেম, সৌন্দর্য আর ভক্তির ত্রিধারা মিশ্রিত হয়েই ধরা দিয়েছে আর সেই মিলন মোহানায় এদের কাব্য আপন বৈশিষ্ট্যে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। বাস্তবের সঙ্গে নূতন ভাবসূত্র নির্মাণের পথিকৃত বিহারীলাল তাঁর সিদ্ধির সন্ধান আপনার অন্তরের মধ্যে। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর 'অপূর্ব বীরাঙ্গনা' আর 'অপূর্ব ব্রজাঙ্গনা' কাব্যদ্বয়ে শ্রীমধুসূদনের আদর্শ অনুসরণ করে তাঁকেই 'গুরু নমস্কার' জানিয়ে শেষ পর্যন্ত কিন্তু ভাব-শিষ্য হয়েছেন বিহারীলালের। সে শিষ্যত্ব কোন কোন সময় আঙ্গিক শিথিলতার ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়। তিনি নিজেকে 'মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্রের স্কুলের কবি',[১২] বলে চিহ্নিত করলেও এঁর স্কুলটি বিহারীলালের। আবার রবীন্দ্রনাথ বয়োকনিষ্ঠ হলেও এঁর উপর তাঁরও কিছু প্রভাব অবশ্যই ছিল। ইনি কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তের সঙ্গে কথোপকথনের সময় বলেছিলেন 'আমার কিন্তু সময় সময় রবীন্দ্রীয় ছন্দে কবিতা লিখিতে ইচ্ছা করে।'[১৩] যাই হোক বিহারীলালের রোম্যান্টিক কবি কল্পনা, তাঁরই প্রেম ও সৌন্দর্যের আদর্শ, দেবেন্দ্রনাথের কবিকৃতির মধ্যে সুপরিস্ফুট। আপন মানসিকতার বিশ্লেষণে কবি বলেন—

আমি শুধু (কবি আমি) অবাক হইয়া
হয়ে মাতোয়ারা, সেফালি সৌরভে; পিয়ে
সুধাংশুর সুধা, শারদী নিশীথে হর্ষে
বসি চুপে, সেফালির সৌরভ মণ্ডলে
চিন্তি যবে-এ জগতে সৌরভ ও প্রীতি

রমণী কণ্ঠের গীতি, চন্দ্রের জ্যোৎস্না।
সবি এক ; মরি মরি একই মৃণালে
শত শতদলে গাঁথা। (কদম্ব সুন্দরী)

রূপসাগরে অরূপের সন্ধানে রত এই কবির পুষ্পপ্রীতি তাঁর কাব্যের একটি বৃহৎ অংশ অধিকার করে আছে। এটি তাঁর সৌন্দর্যপ্রিয়তারই লক্ষণ।

নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা সমকালীন সব কবিই জানিয়েছেন। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের কাব্যালোচনা প্রসঙ্গে এই প্রবণতাকে কোঁতের প্রভাব বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এটি নিঃসন্দেহে নব জাগরণের অন্যতম লক্ষণ। সুরেন্দ্রনাথের মত দেবেন্দ্রনাথও সেই পথের পথিক। দেবেন্দ্রনাথ প্রেয়সীকে বলেছেন মূর্তিমতী 'গীতিকাব্য'। এই নামের একটি কবিতায় তিনি বলেছেন—

প্রিয়ারে আনিনু যবে বিবাহ করিয়া,
যুগ্ম সুভ্রূ (হরগৌরী !) খন্‌জন্ নয়ন
নিরখি, পরখি সবে ভানু বিগন্‌জন
রূপরাশি, বাখানিল নিখুঁত বলিয়া।
আমি হেরি-বালিকার সরল হৃদ
সর্বাংসহা মৌনধরা সম সহিষ্ণুতা
করুণাময়ীর প্রাণ দ্রব হয়ে রয়
পর দুঃখে ; নারী রূপা এ কোন্ দেবতা ?

আবার নারীমঙ্গল কবিতায় বলেছেন—

জানি আমি নারী, তুমি কবি বিধাতার
শ্রেষ্ঠ কাব্য ; সুকোমল কাণ্ড পদাবলী,
ছন্দোবন্ধে অনুপ্রাসে মরি কি ঝংকার !
শ্যামের মুরলী সম শব্দের কাকলী !
তাই সখি, বঙ্গকবি 'চিত্রা'র উদ্যানে
বলিয়া ('অকূল শান্তি বিপুল বিরতি,

নাহি কাল দেশে।' চাহি তব মুখ পানে,
অনিমেষ করে সখি তোমারি আরতি!
'অন্তর মাঝারে তার একা একাকিনী'
তুমি জ্যোৎস্না-চারিধারে আঁধার যামিনী!

দেবেন্দ্রনাথের কাব্য প্রযুক্তিতে মধুসূদনের প্রভাব সুস্পষ্ট। বিচ্ছিন্ন বাক্যাংশের কাব্যমধ্যে ব্যবহার, এই পরিচয়টিকে প্রকট করে। তবে একথা ঠিক যে তাঁর কাব্যভাবনায় কবি বিহারীলালের প্রভাব আছে যেমন আছে রবীন্দ্রনাথেরও প্রভাব।

দেবেন্দ্রনাথ সেনও সারস্বত সাধনায় মগ্ন থেকে জীবনে প্রকৃত আনন্দের স্বাদ লাভ করতে চান। "আবাহন" শীর্ষক কবিতায় তিনি বলেছেন—

আশৈশব, বীণাপানি, তব আরাধনা
করিয়াছি সুখে, দুঃখে, সম্পদে বিপদে।
কত যে তুফান, ঝড় দারুণ ঝন্‌ঝনা
বহিয়াছে মোর সাথে। পদ কোকনদে
তবুও একান্তভক্তি, জ্ঞানদে, শুভদে,
অচলা রহিল মোর।

এই ছত্রগুলি পড়বার সময় বিহারীলালের সেই কয়েকটি ছত্র স্মৃতি পথে উদিত হয় যেখানে কবি বলেছেন—

অয়ি সরস্বতি দেবী! ছেলেবেলা থেকে
তব অনুরক্ত ভক্ত আমি চিরকাল;
ভুলিব না কমলার কামরূপ দেখে;
ভুগিতে প্রস্তুত আছি যেমন কপাল।

বিহারীলালের কাব্যে ঊষাবর্ণনার অংশগুলি নিঃসন্দেহে মনোহর। সারদামঙ্গলের সূত্রপাত ঊষা বর্ণনায়। এছাড়া বঙ্গসুন্দরী, সাধের আসন প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থেও ঊষা বর্ণনা আছে। পরবর্তীকালে প্রায় প্রতিটি কবির কাব্যে ঊষার বর্ণনামূলক কবিতা পাওয়া যায়।

দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'শেফালী গুচ্ছ' কাব্য গ্রন্থে 'ঊষা' শীর্ষক একটি কবিতা আছে। কবি বলেছেন—

শিশির মুকুতাহার কণ্ঠে দোলে। সৌরভ নিশ্বাসি
ঘন ঘন, একি হাসি! ভালো টিপ, অরুণ-ছকুলা,
ঘুরাইছ লীলাপদ্ম! দিগঙ্গনা, আনন্দ-আকুলা,
অয়ি উষে! হেরে তব লাবণ্যের রাশি!

অক্ষয় বড়ালের 'ঊষা' শীর্ষক কবিতাটি 'ভুল' কাব্য গ্রন্থের অন্তর্গত। সেখানে কবি বলেছেন—

নয়নেতে মোহ আঁকা,
অধরেতে হাসি মাখা,
ঘুমভাঙ্গা ঊষা রাণী আসে পায় পায়।
সুনীল মেঘের কোলে
কিরীট কিরণ দোলে
সোনার আঁচল লোটে সুমেরু মাথায়।

কবি গিরীন্দ্র মোহিনী দাসীর (১৮৫৮-১৯২৪) 'কবিতাহার' নামক কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা ঊষা বর্ণনা সেখানে কবির উক্তি—

আহা, কি সুন্দর! ঊষা শশিমুখি,
লইয়া বালাই মরিয়া যাই।
চরাচর বিশ্ব করিবারে সুখী,
বুঝিগো তোমার জনম নাই।

কবিতাটি ৪৩ স্তবকের একটি দীর্ঘ কবিতা। এখানে নানা ভাবে প্রকৃতির এই বিশেষ রূপটির বর্ণনা করেছেন কবি।

কবি রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'কবিতামালা' নামক কাব্যগ্রন্থের 'ঊষা' শীর্ষক সুন্দর কবিতা পাওয়া যায়। কবি সেখানে বলেছেন—

অদিতি নন্দিনী ঊষা বিনোদিনী
প্রফুল্ল বদনা মধুর-ভাষিনী

আলোক বসনা কুসুম মালিনী
এস তুমি, দেবী, অবনীতলে।
হাসিতে হাসিতে নয়ন ভঙ্গীতে
আনন্দের ধারা ঢালিতে ঢালিতে,
স্বর্গীয় সৌরভ শ্রী অঙ্গ হইতে
বর্ষিতে বর্ষিতে করুণা বলে :
যথা স্বয়ংবরে নবীনা যুবতী
রূপের আভায় পূরিয়া জগতী
চলে সভাতলে মৃদু মন্দগতি
নানা অলংকার পরিয়া অঙ্গে।
কিম্বা রে যেমতি পতির মিলনে
যায় রূপবতী সহাস্যবদনে
সাজাইয়া দেহ বিবিধ ভূষণে,
ভাসিতে ভাসিতে সুখতরঙ্গে।

প্রসঙ্গত চিত্তরঞ্জন দাশ প্রণীত 'মালঞ্চ' কাব্যে উষা শীর্ষক কবিতাটিও স্মরণীয়।

মানকুমারী বসু (১৮৬৩-১৯৪৩) রচিত কবিতা সংগ্রহ 'কনকাঞ্জলি'র মধ্যে 'প্রভাতী' শীর্ষক কবিতাটির উষাবর্ণনা লক্ষণীয়—

সোনার সুমেরু শিরে
দুয়ার খুলিয়া যায়,
জাগিয়া বালিকা উষা
পরিছে রতন ভূষা,
পড়িছে কনক ছটা
আঁধার জগত গায়।
প্রকৃতির ঘুম ভাঙা
নয়ন অলস রাঙা

মল্লিকা ফুলের মত
হাসিটি ভাসিছে তায়।
অবনী তৃষিত প্রাণে
চাহিছে আকাশ পানে
এখনো আসেনি যেন
সে যারে দেখিতে চায়।
বিদায় মাগিয়া রাকা
(চাঁদনী-শিশির-মাখা)
শিথিল আঁচল টেনে
ধীরে ধীরে সরে যায়।
বিহগ বিহগী তারা
দিতেছে মধুর সাড়া
কে যেন ভাঙিছে ঘুম
ডাকিছে 'আকাশে আয়।'

সরোজ বাসিনী গুপ্তার (১৮৭৫-১৯২৬) 'প্রীতি পুষ্পাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে। সেই কাব্যগ্রন্থের 'প্রভাত' শীর্ষক কবিতার ঊষা বর্ণনাংশে কবি বলেছেন—

হাসিতেছে ঊষারাণী
মরি কি মধুর রে ;
শ্রবণে ঢালিছে সুধা
বিহগের স্বর রে।
কাননে ফুটিছে ফুল
ছুটে পরিমল রে,
সরোবরে স্ফুটন্মুখী
নলিনীর দল রে।
রক্তিম বরণে ওই
তরুণ তপন রে

উঠিতেছে ধীরে ধীরে
উজলি ভুবন রে।

বিভিন্ন কবির উষা সম্পর্কিত কবিতা চয়ন করে যে বক্তব্যটি উপস্থিত করতে চাওয়া হচ্ছে তা হলো এই যে, বিহারীলাল 'সারদামঙ্গল' কাব্যে উষার বর্ণনা করে প্রকৃতিমূলক কবিতার একটি বিশেষ শাখার উদ্বোধন করেছেন। নারীবন্দনামূলক কবিতার উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। এই আলোচনায় কবিতার বিষয়বস্তু নির্বাচনে বিহারীলালের প্রভাবটুকু ধরা পড়বে। তাঁর কবিস্বরূপ জগৎ ও জীবনের মধ্যে যে সত্যকে উপলব্ধি করেছিল, রবীন্দ্রনাথ ও সমকালীন কবিগণের কাব্যধারায় তার প্রভাবও আমরা উল্লেখ করেছি। প্রেম সৌন্দর্য ও অধ্যাত্মচেতনার সমন্বয়েই যে আমাদেব জীবনের সার্থকতা সেকথা বিহারীলালের পর অনেক কবির কাছে শোনা গেল। বিষয়বস্তু প্রসঙ্গেও বিহারীলালের অনুবর্তন এই সব কবির ক্ষেত্রে দর্শনীয়। এই মাত্র 'উষা' সম্পর্কে আলোচনায় সেই কথাই বলতে চেয়েছি আমরা।

বিহারীলালের হিমালয় এবং সমুদ্রবর্ণনাও একটি সুস্থ সুন্দর ঐতিহ্য সৃজন করেছে। কবিস্বরূপের বিচারে বিহারীলাল ও গোবিন্দচন্দ্র দাস সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের। তবুও গোবিন্দচন্দ্রের 'সাগরের উক্তি' কবিতাটির মধ্যে বিহারীলালের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট।

গোবিন্দ চন্দ্র দাস বলেন—

যদি কেহ সেঁচে জল,
দেখিতে এ বক্ষস্থল
দেখিতে সে কি যে কাণ্ড-কি যে ভয়ংকর—
হৃদয়ে লুকান মোর,
কি যে সে বিপ্লব ঘোর,
প্রলয়ের ধ্বংস মূর্তি গ্রাসে চরাচর। (সাগরের উক্তি)

বিহারীলাল বলেছিলেন—

আজি যদি আসি সেই মুনি মহাবল
সহসা সকল জল শোষেণ চুম্বুকে ;
কি এক অসীম তর গভীর অতল,
আচম্বিতে দেখা দেয় আমার সম্মুখে। (সমুদ্র দর্শন ৪২)

গোবিন্দচন্দ্র বলেন—

এখনো চাহিলে আহা শশধর পানে
হৃদয় উছলে উঠে,
বিশাল তরঙ্গ ছুটে
কি যেন ভাবের উৎস খুলি যায় প্রাণে। (সাগরের উক্তি-৬)

বিহারীলাল বলেছিলেন—

যখন পূর্ণিমা আসি হাসি হাসি মুখে,
উথল হৃদয় পরে দেয় আলিঙ্গন,
তখন তোমার আর সীমা নাই সুখে
আহ্লাদে নাচিতে থাক খেলার মতন। (সমুদ্র দর্শন ১১)

এ ছাড়া গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর 'সিন্ধু গাথা' কাব্যের অন্তর্গত 'জলধি' কবিতা এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বিখ্যাত 'সাগর সঙ্গীত' শীর্ষক দীর্ঘ কবিতা প্রভৃতিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

বিহারীলালের অন্যতম ভাবশিষ্য অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০-১৯১৯)। ইনি তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'কনকাঞ্জলি' উৎসর্গ করেছেন পরলোকগত কাব্যগুরু বিহারীলালের উদ্দেশ্যে। 'উৎসর্গ' শীর্ষক একটি দীর্ঘ কবিতায় এই গুরুকৃত্য সম্পাদিত হয়েছে পরমশ্রদ্ধার সঙ্গেই।

অক্ষয়কুমারের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রদীপ' প্রকাশিত হয় ১৮৮৩ সালে। এই গ্রন্থের 'রজনীর মৃত্যু' কবিতাটি কবির প্রথম রচনা। প্রায় দু'বছর আগে 'বঙ্গদর্শনে 'প্রকাশিত হয়। 'প্রদীপ কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির মধ্যে প্রকৃতিপ্রাণতা, প্রেমচেতনা, নারীসৌন্দর্যের আধারে 'বিধাতার আশীর্বাদ' প্রত্যক্ষ করা প্রভৃতি সমস্ত প্রকার

চিন্তাই বিহারীলালের প্রবর্তিত ধারার অনুসারী। এঁর মধ্যেও সেই সৌন্দর্যপিপাসা, আর জীবন জিজ্ঞাসা; সেই সীমিত পরিবেশ থেকে প্রেমময় অন্তর নিয়ে বিশ্ববোধে উত্তরণ; সেই ভারতীয় ঐতিহ্য-ধারায় ভাবসম্মেলন। কিন্তু বিহারীলালের প্রবল আত্মমগ্নতা অক্ষয় কুমারের মধ্যে অনেক পরিমাণে আত্মসচেতনতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর ফলে আঙ্গিকে সচেতনতাও এসেছে অঙ্গাঙ্গীভাবে।

কবির শ্রেষ্ঠ কাব্য 'এষা'। এর মধ্যে টেনিসনের In Memoriam কিছু কিছু ছায়াপাত ঘটিয়েছে, কিন্তু দুটি কাব্যের আস্বাদ ভিন্ন। আমরা এই বিষাদকাব্যকে 'বন্ধুবিয়োগে'র সমগোত্রীয় মনে করি। কিন্তু শিষ্যের কাব্যে যে করুণরস অনেক বেশী নিবিড়তা লাভ করেছে, একথা অবশ্য স্বীকার্য। এই শ্রেষ্ঠত্ব যে অন্তর্নিহিত কারণে অর্জিত হয়েছিল তার প্রকাশ মোহিতলালের ভাষায় অত্যন্ত নিপুণ ভাবে ঘটেছে। তিনি বলেছেন, 'যাহাকে তিনি ভাবের নক্ষত্রলোক ভিন্ন আর কোথাও চিনিয়া লইতে পারেন নাই, * * * * যাহাকে সাধারণ মর্ত্যসঙ্গিনী রূপে না দেখিয়া ভাবকল্পনার জ্যোতির্মণ্ডল মধ্যবর্তিনী রূপে দেখিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাকেই তিনি সামান্য মানবীর মধ্যে স্নেহ মমতাময়ী গৃহধর্মচারিণী পত্নীরূপে চিনিতে পারিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে সর্ব অভিমান ত্যাগ করিয়া যে সুরে এই অতুলনীয় শোকগাথা রচনা করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার জীবনে তথা কাব্যে সিদ্ধিলাভ ঘটিয়াছে।'[১৪] এষার চিত্রগুলি অত্যন্ত বাস্তব, যেমন বাস্তব বন্ধুবিয়োগের চিত্রগুলি। এগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে এই অতিপরিচিত বাস্তব চিত্রগুলি মর্মান্তিক বেদনায় মণ্ডিত হয়ে অপূর্ব কাব্যশ্রী লাভ করেছে। ব্যক্তিজীবনের শোকাবেগকে কাব্যের বিষয় করেছেন বিহারীলাল, করেছেন তাঁর পরবর্তীকালে বহুকবি। এটি একটি বিশেষ ধারা হিসেবেই পরিচিত হয়ে উঠেছে, যাকে ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য গ্রন্থে 'বিচ্ছেদ মূলক বিষাদ কবিতা' বলে চিহ্নিত করেছেন।

মোহিতলাল মজুমদার অক্ষয়কুমারের কাব্যে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে 'বিহারীলালের সারদার একটি দিক—বিশ্বের অন্তঃপুরে তাহার সেই রহস্যময়ী মূর্তি শেলীর কাব্যরসে অভিষিক্ত হইয়া বড়াল কবির অবাস্তব রসপিপাসার ইন্ধন যোগাইয়াছে।'[১৫] আসলে প্রভাব সম্পর্কিত আলোচনায় আমাদের বক্তব্য এইটিই। আমাদের অনুসন্ধিৎসা বিহারীলালের ভাব, ভাষা, ছন্দ বা বাক্ প্রতিমার অনুকরণকে কেন্দ্র করে নয়। আমরা দেখেছি, বিহারীলাল আত্মমগ্ন কাব্যধারার ভগীরথ। কিন্তু তাঁর স্রোতোধারায় বেগসঞ্চার করেছেন সমকালীনযুগে আরো কোন কোন কবি। প্রতিভা অন্যের নির্দেশিত পথে অগ্রসর হয় না। তার প্রাগ্রসরতার শক্তি আসে আপনার অপূর্ব-বস্তু-নির্মাণপ্রতিভা থেকেই। সুরেন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয় কুমার এঁরা সবাই কমবেশী প্রতিভাবান। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে অনুকরণাত্মক প্রক্রিয়াটি লক্ষ করা গিয়েছে তার কারণ তাঁর বয়োধর্মের মধ্যেই নিহিত। সপ্তদশ বর্ষীয় 'কবিকাহিনী' রচয়িতার অনুকরণপ্রিয়তা, দ্বিচত্বারিংশ বর্ষীয় 'মহিলা' কাব্য রচয়িতা এমনকি চতুর্বিংশতি বর্ষীয় 'প্রদীপ' কাব্য রচয়িতার কাছে প্রত্যাশিত নয়। তাছাড়া 'কবিকাহিনী'র ভাবী কবি বিহারীলালের অনুকরণে কবিতা রচনা করতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, এ সত্যটি বিস্মৃত হবার নয়।

আমাদের প্রভাববিচার তাই মূলত ভাব-প্রভাব বিচারের মধ্যেই সীমিত। বিহারীলাল সম্পূর্ণরূপে আত্মমগ্ন কিন্তু সে আত্মমগ্নতা আত্মপরতা বা egocentricism নয়। পরিদৃশ্যমান জগৎ সম্পর্কে কবি শুধু সচেতনই নন, এই জগতই তাঁর কল্পনালক্ষ্মীর সহায়তায় অন্তর্জগতে নানা রঙে রসে কাব্যদেহ ধারণ করেছে। মন্ময়তার আধিক্যে স্বপ্নাচ্ছন্ন কবির চিন্তা প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে যে দ্রুততার সঙ্গে যাত্রা করেছে, তার সঙ্গে গতিসামঞ্জস্য বজায় রাখা সাধারণ পাঠকের পক্ষে সম্ভব নয়। বিহারীলালের দুরূহতা এইখানে। তাঁর ভাবশিষ্যদের ক্ষেত্রে এই

স্বপ্নাচ্ছন্নতা বর্জিত। এঁদের পদচারণা সংযত আর পাঠকের পক্ষে এঁদের অনুসরণও তাই অনায়াসসাধ্য। বিহারীলালে 'গৃহিণীপনা' ছিলনা, সেইজন্যই সচেতন ভাবশিষ্যদের 'গৃহিণীপনা' দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমরা এটিও প্রভাব বলে স্বীকার করেছি। বলেছি প্রভাব শুধু স্বীকরণে কেন, ত্রুটি সংশোধনেও লক্ষণীয়। পূর্বসূরীর অকৃতার্থতা উত্তরসূরীর উপর যে প্রভাব বিস্তার করে তার ফলশ্রুতি সেই অকৃতার্থতার কারণগুলিকে সযত্নে পরিহারের মধ্যে। অথচ পূর্বসূরীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং ঐতিহ্যধারায় তাঁর অবদানের সঙ্গে উত্তরসূরীর যাত্রাপথ সমান্তরাল রেখায় রচিত হয়। জন্মসূত্রে প্রাপ্ত ঐতিহ্যধারার সঙ্গে অর্জিত সম্পদ এবং আপন প্রতিভার সার্থক সমাবেশের মধ্যেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রভাব প্রসঙ্গে এই রীতিটিই বিবেচ্য।

কবি বিহারীলালের ক্ষেত্রে প্রেম ও সৌন্দর্য চেতনার ঐক্যবদ্ধ রূপ দেখা গিয়েছে। রোম্যাণ্টিক কবিস্বরূপের এই বিশেষ ক্ষেত্রে বিহারীলাল ও অক্ষয়কুমার সতীর্থ। বিহারীলালের মতই অক্ষয় কুমার বলেন—

একবার নারী, তব প্রেম মুখ হেরি,
আরবার প্রকৃতির শ্যামমুখ হেরি ;
মনে হয়, দুই জনে দুখানি মেঘের মত
রহিয়াছে জগতেরে ঘেরি'। ('প্রদীপ' : কবিত্ব)
রমণী রে, সৌন্দর্যে তোমার
সকল সৌন্দর্য আছে বাঁধা।
বিধাতার দৃষ্টি যথা জড়িত প্রকৃতিসনে,
দেবপ্রাণ বেদ গানে সাধা। (ঐ, নারীবন্দনা)

বিহারীলালের কাছে বারবার শোনা গিয়েছিল যে 'অনুরাগী প্রমদার' প্রেমসিঞ্চনে সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতিই শুধু যে মধুময় তা নয়—

হেরিলে তব বদন,
যেন পাই ত্রিভুবন,

অন্তরে উথলে ওঠে

আনন্দ অপার। (সঙ্গীত শতক-৬)

অক্ষয়কুমার বললেন—

এসলো রূপসী প্রেয়সী আমার।

সে সুখবসন্ত আসিছে আবার।

গাছে গাছে দেখ ফুটিতেছে ফুল,

এস ফুল মাঝে সৌরভে আকুল!

ফুলে ফুলে দেখ চুমিতেছে অলি,

এস প্রেম-মধু, হৃদয়ে উছলি। ('প্রদীপ' : বসন্তপ্রভাতে)

প্রেমময়তার মূল্যেই জীবনের মূল্য। অকৃপণ প্রেমের অজস্রতায় সমগ্র বিশ্ব পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক, এ ছিল বিহারীলালের কামনা। তিনি বলেছেন—

সূর্য বল, চন্দ্র বল, বল তারাগণ,

এরা নয় জগতের দীপ্তির কারণ;

প্রেমের প্রভায় বিশ্ব প্রকাশিত রয়;

তাইত প্রেমের প্রেমে মজেছে হৃদয়।

(প্রেম প্রবাহিণী : ২য় সর্গ)

পৃথিবীতে প্রেমেরই প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক। অক্ষয়কুমারও বলেন—

কাব্য নয়, চিত্র নয়, প্রতিমূর্তি নয়,

ধরণী চাহিছে শুধু হৃদয় হৃদয়।

নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধায় উভয়েই পরিপূর্ণ। এই শ্রদ্ধাবোধ নবজাগরণের অন্যতম লক্ষণ বলে উল্লিখিত হয়েছে। সেই সঙ্গে মানবতাবাদের প্রশ্নটিও বিচার্য। এই মানবতাবাদ নিছক পাশ্চাত্য প্রভাবসঞ্জাত নয় সে কথাও আলোচিত হয়েছে। নর ও নারী জাতির প্রতি এই শ্রদ্ধাবোধের তলদেশে প্রাচ্যঐতিহ্য সম্ভূত অধ্যাত্মচেতনার ফল্গু ধারা প্রবাহিত। নরনারীর সর্বপ্রকার শক্তি প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের আশিসপুষ্ট, এই চেতনাটি লক্ষণীয়। প্রকৃতপক্ষে বিহারীলাল থেকে

উত্তরকালীন সমস্ত কবির মধ্যে মানবতাবাদের স্বরূপটি এই। অক্ষয় কুমারের 'মানববন্দনা', কবিতাটি তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা।

'এষা' সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পূর্বেই উপস্থাপিত হয়েছে। 'এষা' শোকগাথা এবং কবির শেষ সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। প্রসঙ্গক্রমে বিহারীলালের 'বন্ধুবিয়োগ' কাব্যের নাম উল্লিখিত হয়েছে। যে শোক গাথামূলক রচনার পথিকৃৎ বিহারীলাল, সেই ধারা রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত নানা পুরুষ ও মহিলা কবিকে আশ্রয় করে প্রবহমান। কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন, গোবিন্দচন্দ্র দাস, মানকুমারী বসু, গিরিন্দ্র মোহিনী দাসী, সরোজবাসিনী গুপ্তা প্রভৃতির শোকগাথামূলক প্রচুর কবিতা আছে। অক্ষয়কুমারের 'শঙ্খ' কাব্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত পিতৃহীন, মাতৃহীন, বাল্যবিধবা প্রভৃতি কবিতাও এই শ্রেণীর।

নিষ্কাম প্রেম অমর। মৃত্যু জীবনের সঙ্গে একই সূত্রে গ্রথিত। কিন্তু উপলব্ধির এই স্তরে উন্নীত হতে হলে জীবনে ব্যথা বেদনার অনেক পরিচ্ছেদ উত্তীর্ণ হয়ে আসতে হয়। 'এষা' কাব্য মৃত্যু, অশৌচ শোক ও সান্ত্বনা এই চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত। কবি অক্ষয়কুমার ধীরে ধীরে মৃত্যুর বহিরঙ্গ ছলনার নির্মমতাকে জয় করে স্বোপলব্ধ সান্ত্বনার স্তরে উপনীত হয়েছেন, প্রেমের অবিনশ্বরতায় বিশ্বাসী হয়ে উঠে ঘোষণা করেছেন—

ক্ষম এ ক্রন্দনগীতি—শোক অবসাদ
সে ছিল তোমারি ছায়া-
তোমারি প্রেমের মায়া।
তার স্মৃতি আনে আজ তোমারি আস্বাদ!
এখনো সে যুক্তকরে
মাগিছে আমার তরে;
তোমার করুণা স্নেহ শুভ আশীর্বাদ।

কিন্তু অক্ষয়কুমারের প্রশ্ন ছিল—

গৃহ চূড়ে নর যথা সোপান বাহিয়া
উঠে ধীরে ধীরে—
এ জগতের নিরন্তর বহি' শোক দুখস্তর
উঠে কি মানব আত্মা তোমার মন্দিরে ?

এ প্রশ্নের উত্তর এসেছে অন্তর্লোক থেকেই। কবি স্বীকার করেছেন—

ভাঙ্গিতে গড়নি প্রেম, ওহে প্রেমময় !
মরণে নহি.ত ভিন্ন,
প্রেমসূত্র নহে ছিন্ন—
স্বর্গে মর্ত্যে বেঁধে দেছ সম্বন্ধ অক্ষয়।

অক্ষয়কুমারের মধ্যে রোম্যান্টিক ব্যাকুলতা আছে, আবার আত্মোপলব্ধির সুস্থ সুন্দর সান্ত্বনার জগতও আছে। এ জগৎ রঙ্গলাল, মধুসূদন বা হেম-নবীনের জগৎ নয়, এ নিতান্তই বিহারীলালের। আবার বিশ্ববিধানের মূল রহস্য অনুসন্ধানের জন্য বিহারীলাল যেমন করে বলেছিলেন—

বিচিত্র এ মত্তদশা ভাবভরে যোগে বসা
হৃদয়ে উদার জ্যোতি কি বিচিত্র জ্বলে।

অক্ষয়কুমারও তেমনি করেই বলেন—

কার্য হতে দূরে কারণের কোন পুরে,
বিরাজিত হে যোগীন্দ্র যোগে আপনার ? ('প্রদীপ' : কোথাতুমি)

'ভুল' ও 'কনকাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থগুলিতেও বিহারীলালের প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। কিন্তু এ তথ্যটি স্মরণীয় যে রবীন্দ্রনাথের মত বিরাট প্রতিভার অধিকারী না হলেও, অক্ষয়কুমারের কাব্য বৈশিষ্ট্যচিহ্নিত। এঁরা উভয়েই যদিও বিহারীলালকে প্রত্যক্ষ গুরু বলে স্বীকার করেছেন, গুরুর ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে কিন্তু এঁরা সচেতন ছিলেন। সীমিত পরিসরের মধ্যে হলেও অক্ষয়কুমারের ক্ষেত্রে বিহারীলালের চিন্তাধারার নিটোল রূপ দেখা গেল। সেই স্বপ্নবিলাস, সেই

আধ্যাত্মিকতা, সেই রোম্যান্টিক বিষাদ, এমনকি প্রেম ও সৌন্দর্য চেতনার সেই আদর্শায়িত রূপ সবই বড়াল কবির মধ্যে পাওয়া গেল, পাওয়া গেল না ক্ষেত্রবিশেষে ভাবোচ্ছ্বাসের প্রাবল্যজনিত আঙ্গিক শৈথিল্য।

অক্ষয়কুমারের নারীচেতনা যে বিহারীলালের প্রভাবসঞ্জাত একথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। এই নারী রূপ ও গুণের সমস্ত প্রকার শ্রেষ্ঠ উপাদানের সমন্বয়ে সৃজিত হলেও মূলত তিনি মানবী, কবিপ্রেয়সী। নারীতে দেবীমাহাত্ম্য আরোপিত হয়েছে, কিন্তু কবি তাঁর মতবৈশিষ্ট্য বিস্মৃত হননি।

তিনি বলেছেন—

নহে কল্পনার লীলা স্বরগ নরক;
বাস্তব জগৎ এই, মর্মান্তিক ব্যথা।
নহে ছন্দ, ভাববন্ধ, বাক্য রসাত্মক;
মানবীর তরে কাঁদি যাচিনা দেবতা।

('এষা' : নিবেদন)

বিহারীলাল নারীপ্রেমের কাছে নিঃসর্তে আত্ম সমর্পন করেছেন। কিন্তু সে প্রেমকামনা দেহবাসনার বহু উর্দ্ধে থেকেছে। বড়াল কবির মধ্যে নারীপ্রেমের এই কামগন্ধহীন দিকটাই প্রকাশিত হয়েছে। লক্ষণীয় যে, গোবিন্দচন্দ্র দাসের ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমচিন্তা বা দেবেন্দ্রনাথ সেনের তীব্র রূপজ মোহ বড়ালকবির উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। বড়ালকবির উপর রবীন্দ্রনাথেরও এমন কিছু প্রভাব আছে যা অনায়াসে চোখে পড়ে, কিন্তু 'কড়ি ও কোমল' প্রকাশিত হবার পরও বড়ালকবির প্রেমচিন্তায় দেহকামনার স্পর্শ এসে পড়েনি। এটি বিস্ময়কর। বিহারীলালের ধ্যানধারণার প্রতি অক্ষয়কুমার কতখানি আকৃষ্ট ছিলেন এতে তারই প্রমাণ মেলে। 'প্রদীপ' কাব্য-গ্রন্থের অন্তর্গত 'নারী বন্দনা' শীর্ষক কবিতাটি কবির নারীচিন্তার স্বরূপটিকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করেছে। তিনি বলেছেন—

রমণী রে, সৌন্দর্য্যে তোমার
সকল সৌন্দর্য্য আছে বাঁধা।
বিধাতার দৃষ্টি যথা জড়িত প্রকৃতিসনে
দেবপ্রাণ বেদগানে সাধা।

*　　　*　　　*

তোমারি ও লাবণ্য ধারায়
কালের মঙ্গল পরকাশ।
অসম্পূর্ণ এ সংসারে তুমি পূর্ণতার দীপ্তি
সান্ধ্য-মেঘে স্বর্গের আভাস।

*　　　*　　　*

বিধাতার মহাকাব্য তুমি
সসীমে অসীমে সম্মিলনী।
ঘরে ঘরে কোটি যোগী, কোটি কবি সিদ্ধকাম,
তোমা মাঝে পেয়ে প্রতিধ্বনি!

এই নারীই বিহারীলালের জীবনে 'যোগীর ধ্যানের ধন' হয়ে দেখা দিয়েছিল। অক্ষয়কুমার যখন বলেন 'ঘরে ঘরে কোটি যোগী, কোটি কবি সিদ্ধ কাম, তোমা মাঝে পেয়ে প্রতিধ্বনি' তখন তাঁর চিন্তায় যে বিহারীলালের প্রভাব নেই একথা বলা দুরূহ।

প্রকৃতিপ্রিয়তা অক্ষয়কুমারের বেলায় বিহারীলালেরই সমান্তরাল ক্ষেত্রে দেখা যায়। বিহারীলাল প্রকৃতির শান্তস্নিগ্ধ রূপটুকুই দেখেন নি, তার উন্মত্ত ভীষণ রূপটিকেও প্রকৃত রসিকের মতই উপভোগ করেছেন। 'নিসর্গ সন্দর্শন' কাব্যে পঞ্চম ও ষষ্ঠ সর্গ 'ঝটিকার রজনী' ও 'ঝটিকা সম্ভোগ' কবিতা দুটি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অক্ষয়কুমারের প্রকৃতি রসিকতা বহু কবিতাকে আশ্রয় করে প্রকাশিত। এঁর ক্ষেত্রেও প্রকৃতির সামগ্রিক রূপের প্রতি আকর্ষণ দেখা গেল। 'এষা' কাব্য গ্রন্থের 'শোক' পরিচ্ছেদে বিহারীলালের অনুকরণে ঝড়ের ও পরদিনের

প্রশান্ত প্রভাতের বর্ণনা আছে। আবার এই কাব্যগ্রন্থের 'সান্ত্বনা' অংশে অক্ষয়কুমার বলেছেন—

নীলবাসে দেহ ঢাকা
মেঘে ঢাকা শশীরাকা,
ঝলকে ঝলকে কিবা আভা উছলায়!
সবৃন্ত মন্দার দুটি
বাম করে আছে ফুটি'
সোনার আঁচল লুটি' পড়ে রাঙ্গাপায়।

বিহারীলাল 'সারদামঙ্গলে'র পঞ্চম সর্গে বলেছিলেন—

কায়াহীন মহাছায়া
বিশ্ববিমোহিনী মায়া
মেঘে শশী ঢাকা রাকা রজনীরূপিণী,
অসীম কাননতল
ব্যেপে আছে অবিরল;
উপরে উজলে ভানু, ভূতলে যামিনী।

শুধু ভাবে আর ভাষায় নয়, ছন্দরীতির প্রবর্তনায়ও বিহারীলালের প্রভাব প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে এখানে।

বিহারীলালের এই ভাবশিষ্য গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে বেশ কিছু সঙ্গীত রচনা করেছেন। সঙ্গীতগুলির সঙ্গে সুরতালের উল্লেখও এখানে দেখা গেল। বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' কাব্যের সূত্রপাত একটি 'উপহার' শীর্ষক কবিতায়। 'এষা'য় অক্ষয়কুমারও এই আঙ্গিকের অনুকরণ করেছেন।

আমরা একাধিকবার উল্লেখ করেছি যে বড়াল কবির কাব্যে উচ্ছ্বাসপ্রবণতা সংযমের গণ্ডীতে আবদ্ধ আর আঙ্গিক পরিমার্জিত। গীতিকবিতার ঋজু এবং ঘনীভূত অবয়ব, যা গুরুর মধ্যে পরিপূর্ণভাবে দৃষ্টিগোচর হয়নি, তাঁর শিষ্যদের মধ্যে তা যথেষ্ট পরিমাণে দেখা গেল। গীতিকবিতা সম্পর্কে বড়াল কবির ধারণাটি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবেই

প্রকাশিত হয়েছে 'প্রদীপ' কাব্যগ্রন্থের ঐ নামেরই একটি কবিতায়। সেখানে তিনি বলেছেন যেভাবে—

ক্ষুদ্র বনফুল বাসে
সারাটা বসন্ত ভাসে

অথবা

ক্ষুদ্র বৃষ্টিকণা বলে
সপ্ত পারাবার চলে
* * * * * *
ক্ষুদ্র মণিকণিকায়
খনির মহিমা ভায়

ঠিক তেমনি করে গীতিকবিতা 'বঙ্কুরা মেদিনীর' বুকে 'নিটোল শিশির কণা'র রূপ নিয়েই প্রকাশিত। বড়ালকবির এই বক্তব্য তাঁর কবিতাগুলির মধ্যে পরম সার্থকতায় উদাহৃত।

যাকে এলিয়ট বলেছেন extinction of personality এ হ'ল তাই। কবি যখন তাঁর প্রতিভার পরশপাথর ছুঁইয়ে কাব্য রচনা করে চলেছেন তখন কিন্তু তাঁর ব্যক্তিসত্তার প্রকাশ নেই সেই সৃষ্টির মধ্যে। একটা মাধ্যম তাঁর অবলম্বন হয় ঠিকই, কিন্তু সে মাধ্যম যে তাঁর ব্যক্তিত্ব নয়, এ অনস্বীকার্য। এই অনুভূতিটি 'চিত্রা' পর্বে রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছেন। কবি বলেছেন, প্রথম বয়সের ব্যক্তিত্বচিহ্নিত কাব্যধারা নিয়ে কবি যখন ব্যস্ত তখনই তাঁর পরিবর্তন ঘটল—

বলিতেছিলাম বসি একধারে
আপনার কথা আপনজনারে
শুনাতেছিলাম ঘরের দুয়ারে
ঘরের কাহিনী যত,
তুমি সে ভাষারে দহিয়া অনলে
ডুবায়ে ভাসায়ে নয়নের জলে

নবীন প্রতিমা নবকৌশলে
গড়িলে মনের মত।

প্রথম পর্যায়ের ব্যক্তিমন বিশ্বমানবমনে পরিণত হ'ল, রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিসত্তা কবিসত্তায় উত্তীর্ণ হ'ল। রসোত্তীর্ণ কাব্যধারার উৎসমুখ নির্ধারিত হ'ল এরপর। একেই সীমার অসীমাভিসারও বলা যায়। বিশেষের মধ্যে নির্বিশেষের ব্যঞ্জনা। Extinction of Personality একেই বলে।

সাহিত্যের ধারাটিকে আমরা ঐতিহ্য বলে চিহ্নিত করেছি। আমরা বলতে চেয়েছি, প্রতিযুগে কিছু কবি এই ধারায় আপন প্রতিভার অবদান যুক্ত করেন। এর ফলে ঐতিহ্যের ধারা শুধু স্ফীতকায় হয় না, বৈচিত্র্যে মনোহর হয়ে ওঠে। বিভিন্ন কবির অবদানকে 'প্রভাব' বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছি আর বলেছি এই প্রভাব উভয়ত। প্রত্যেকেই কালপরম্পরাগত ঐতিহ্যধারার দ্বারা প্রভাবিত হন আবার প্রভাবিত করেনও। এও বলেছি, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই প্রভাবটি আত্মীকরণের ক্ষেত্রে সজ্ঞান অনুসরণ বা অনুকরণ পরিলক্ষিত হয় কবিসত্তার উষালগ্নে। তারপর ঐতিহ্যধারাটি অঙ্গীভূত হয়ে যায়, তখন কাব্যসৃষ্টির মধ্যে তার চকিত বিকাশ সচেতন পাঠকের চোখে অনায়াসে ধরা পড়ে। এই লক্ষণের বিচারে তাকে তখন একটি বিশেষ কাব্যধারার সঙ্গে এক করে নিই আমরা।

প্রভাবপ্রসঙ্গে আমাদের আরও একটি বিচার্য বিষয় আছে, সৃষ্টি প্রভাব-নিরপেক্ষ কিনা। কোন শক্তিমান কবি বা সাহিত্যিকের আত্মপ্রকাশের জন্য পূর্ব-ভূমিকার প্রয়োজন নেই, এ অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। বলা হয়েছে, মধুসূদনের পূর্বভূমিকা ছিল না, রবীন্দ্রনাথেরও না থাকলে ক্ষতি ছিল না। প্রকৃতপক্ষে মধুসূদনের উপর প্রভাব-প্রসঙ্গ ব্যাপকতর আলোচনার অপেক্ষা রাখে। যেমন অপেক্ষা রাখে রবীন্দ্রপ্রতিভার উপর প্রভাবপ্রসঙ্গের বিচারটিও। মধুসূদন প্রভাবিত হয়েছিলেন প্রধানত পাশ্চাত্য সাহিত্যেরই দ্বারা। যেমন রবীন্দ্রনাথের

সৃজনী চিন্তার উপর প্রভাব ছিল উপনিষদ আর সংস্কৃত কাব্যধারার এবং পাশ্চাত্য সাহিত্য-দর্শনের। 'বীজের মধ্যে বৃক্ষত্ব যে আকারেই সুপ্ত থাক না কেন, তার নিদ্রাভঙ্গ আর শাখাপ্রশাখায় পূর্ণতাপ্রাপ্তির জন্য মাটির আশ্রয় আর রসের জোগান চাই। তারপরেও প্রয়োজন থাকে পরিবেশ-আনুকূল্যের। বৃক্ষের সবুজ পত্রসম্ভার আর ফুলদলের আয়োজন আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে ; কিন্তু তার রসগ্রাহী মূলের বিচিত্র সঞ্চয়ের ইতিহাস লোকচক্ষুর অন্তরালেই থাকে, যেমন অন্তরালে থাকে তার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি-উৎসটি। আমরা যদি অনুসন্ধানী হই, তাহলে মহীরুহের বহির্বিশ্বে বিপুলায়তন প্রকাশের অন্তরালে ভূমিগর্ভে নিহিত তার মৌল প্রেরণার প্রমাণ অবশ্যই পাবো।

কোন মহৎ সৃষ্টি 'আপনাতে আপনি বিকশি' সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। মহৎ সৃষ্টি হয়ে ওঠার জন্যেই তার পক্ষে প্রয়োজন অতীত ও বর্তমান সম্পর্কে সচেতনতা। কবিগুরু বাল্মীকির ক্ষেত্রে তপস্যালব্ধ শক্তি আর নিষাদের নিষ্ঠুরতাকে ভূমিকা হিসেবে গ্রহণ করতে হয়।

বিহারীলালের প্রভাব উনবিংশ তথা পরবর্তী বাংলা কাব্যধারায় কতখানি তার বিচারের জন্য বিস্তৃততর আলোচনার প্রয়োজন। বিহারীলালের কাব্যবোধে ক্ষেত্রবিশেষে দুরূহতা আর পরবর্তী বাংলা কাব্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে অজস্রতাই এর প্রধান কারণ। স্বাভাবিক ভাবেই উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর ভাব ও কর্মের জগৎ প্রসারতা আর গভীরতা দুটিই পেয়েছিল—তাও শুধু সাহিত্যে নয়, জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তার অজস্র দান সেদিন সারা ভারতবর্ষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। যাই হোক, এই বিশেষ কবির প্রভাব ও মূল্য বিচারের ক্ষেত্রে অধ্যাপক বিশির ধারণার পরিবর্তনটি লক্ষণীয়। একদিন দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন 'অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রভ জ্যোতিষ্ক বিহারীলাল প্রতিভার সাধর্ম্যহেতু রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রকাব্যের সুবাদে

বিহারীলাল স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন'।[১৮] প্রায় ছ'বছর পরে অধ্যাপক বিশি বললেন, 'তিনি নব্য রোম্যাণ্টিক কবিগণের অগ্রণী আর বাঙালী minor কবিগণের শ্রেষ্ঠ।'

আজ এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণের কোন অবকাশ নেই যে উনিশ শতকের ছ'য়ের দশক থেকে যাঁরা বাংলা ভাষায় কাব্যরচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাঁরা কমবেশী বিহারীলালের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, আর সে প্রভাব স্বগত ভাষণকে কাব্যের স্তরে উন্নীত করার মধ্যে নিহিত। আমাদের কাব্যের দূরাগত ঐতিহ্য-ধারার মধ্যে ছিল প্রায় সবকিছুই। কিন্তু যে বিশেষ ধারাটিকে আমরা 'গীতিকবিতা' বলে চিহ্নিত করেছি তার পথনির্মাতা মূলত বিহারীলাল, যদিও সে পথের সর্বজনশ্রদ্ধেয় সাধক তাঁরই ভাবশিষ্য রবীন্দ্রনাথ। বিহারীলালের এই প্রাপ্য গৌরব থেকে বাংলা সমালোচনাসাহিত্য তাঁকে বঞ্চিত করতে পারে না।

উল্লেখপঞ্জী

১। বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৫০,

২। তারাপদ মুখোপাধ্যায়: আধুনিক বাংলা কাব্য, ১ম পর্ব ২য় সংস্করণ পৃঃ ১৩৪

৩। প্রমথ নাথ বিশি: রবীন্দ্রকাব্য নির্ঝর, ১ম সংস্করণ পৃঃ ৪৪

৪। প্রবোধচন্দ্র সেন: ভোরের পাখি, প্রথম পর্যায়, শতবার্ষিক জয়ন্তী উৎসর্গ গ্রন্থ, ১৯৬১, পৃঃ ৩৩৫-৬১; ঐ দ্বিতীয় পর্যায়, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৮শ বর্ষ শ্রাবণ ১৩৬৮; আষাঢ় ১৩৬৯ পৃঃ ১১৪-৫১, ঐ রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫০, বৈশাখ পৃঃ ৬৫৯।

৫। ঐ ঐ ঐ ২য় পর্যায়, বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক পৌষ, ১৩৬৮, পৃঃ ১৪০-৪১।

৬। রবীন্দ্ররচনাবলী : পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১ম সংস্করণ, ১৩শ খণ্ড (বিহারীলাল) পৃঃ ৯১৫।
৭। অমিয়কুমার সেন : প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৩৯-৪০।
৮। বারিদবরণ ঘোষ : ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী, দেশ ৪১ বর্ষ, ২৮শে পৌষ ১৩৮০, পৃঃ ৯৬৮।
৯। সাহিত্য সাধক চরিতমালা : সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড, ৫ম সংস্করণ (বিহারীলাল) পৃঃ ২১।
১০। নীহাররঞ্জন রায় : রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা, ৫ম সংস্করণ, পৃঃ ৩৫।
১১। মোহিতলাল মজুমদার : আধুনিক বাংলা সাহিত্য, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ১২৮।
১২। সাহিত্যসাধক চরিতমালা-সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫ম খণ্ড ৫ম সংস্করণ (দেবেন্দ্রনাথ সেন) পৃঃ ২০
১৩। ঐ ঐ ঐ ৫ম খণ্ড ৫ম সংস্করণ পৃঃ ২০।
১৪। মোহিতলাল মজুমদার : আধুনিক বাংলা সাহিত্য, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ১৬২।
১৫। ঐ ঐ ঐ ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ১৫৩
১৬। T. S. Eliot—Selected Prose, ED.-J. Hayward, 1963 Edn. P: 25.
১৭। তারাপদ মুখোপাধ্যায় : আধুনিক বাংলাসাহিত্য, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ১৩৪।
১৮। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর : স্বপ্নপ্রয়াণ, ১৯৬৪ সংস্করণ, আলোচনা পৃঃ ১৮৩।

॥ পাঁচ ॥

বাংলা কাব্য ধারায় কবির স্থান—

সংযম শুধু কর্মজগতেই নয় ভাবজগতেরও একটি বড় গুণ। ভাবুক কবিও সংযমী এবং সেই অর্থে তপস্বীও বটে। রবীন্দ্রনাথের মতে, 'কলাবান গুণীরাও যেখানে বস্তুত গুণী সেখানে তাঁহারা তপস্বী'।[১] এই সংযম, এই সাধনা কবিকে সৌন্দর্যের মধ্যে মগ্নচেতন হতে সাহায্য করে। পৃথিবীর রসকেন্দ্রে উপনীত হতে শক্তি যোগায়। এই সৌন্দর্য আর প্রেম, এই সৌন্দর্য আর মঙ্গল সমার্থক। এ সব কিছুর মধ্যে একটি অপূর্ব সামঞ্জস্য আছে। উদার নীলাকাশ, চন্দ্রালোকিত পৃথিবী, সরোবরে প্রস্ফুটিত অজস্র কুমুদ এ-সবের সামঞ্জস্যে পূর্ণিমা-রাত্রির পূর্ণতা। সৌন্দর্যের সেই অখণ্ড সত্তার মধ্যে এ সবকিছুই আপন বৈশিষ্ট্যকে নিঃসর্তে সমর্পণ করে দেয়।

কবিভাবনার পূর্ণতার মধ্যে যখন অজস্র খণ্ড-সৌন্দর্য অখণ্ড সৌন্দর্য-সত্তায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তখনই জন্ম নেয় সার্থক কাব্য। বৃহৎ সৌন্দর্যের যেমন একটি বৃহৎ পটভূমির প্রয়োজন হয়, বৃহৎ ভাবের জন্যও প্রয়োজন হয় একটি বৃহৎ অন্তরের। ভূমার মধ্যে সেই বৃহৎ সৌন্দর্য যেমন বিশ্ববিধানের অন্তর্নিহিত পরম ঐক্যটির সন্ধান দেয়, শ্রেষ্ঠ কবির বক্তব্যের মধ্যে ধরা দেয় তেমনি জগৎ-বিধানের মধ্যে উপলব্ধ মহাসত্যটি। বস্তুত, সেও এক অপূর্ব সৃষ্টি, আর সেইজন্যই কাব্যস্রষ্টা কবিকে স্বয়ম্ভু বলেছেন রসশাস্ত্রবিদেরা।

আমাদের কবি-প্রদক্ষিণ ফুরোলো। যাত্রা শুরু করেছিলাম অনেক দ্বিধা আর সঙ্কোচ নিয়ে, অনেক জিজ্ঞাসা আর অভিযোগ নিয়ে। সবকিছুর অন্তরালে ছিল একটি সাত্ত্বিক প্রশ্ন, কবির অবদান কি সত্যিই মূল্যবান? মানুষকে বিচার করার পদ্ধতি দু'টো—একটি

বিশ্বাস অন্যটি অবিশ্বাসধর্মী। একদল বলেন, বিশ্বাস কর সবাইকে, সে যদি নিজেকে কোনদিন বিশ্বাসের অযোগ্য প্রমাণিত করে, ধারণার পরিবর্তন ঘটাবো। অন্যদল প্রথম থেকেই সবাইকে অবিশ্বাস করে যাত্রা শুরু করেন। কিন্তু মানুষ যদি নিজেকে বিশ্বস্ত প্রমাণিত করে তবে ধারণার পরিবর্তন ঘটান এঁরাই। অসংকোচে বলতে হয় প্রথম দলই উদার পন্থী ও মানবপ্রেমিক।

সমালোচনার তেমনি দু'টো ধারা লক্ষ্য করি। আমরা দ্বিতীয় ধারার মানসিকতা নিয়ে বিহারীলালের কাব্যমূল্যায়নে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম। আমাদের শোনা ছিল তাঁর ব্যর্থতার বিভিন্ন কারণ এবং সার্থকতামূলক সীমিত ক্ষেত্রের বর্ণনা। আমাদের জানা ছিল সমালোচনার ক্ষেত্রে তাঁর প্রতি একদিকের উদারতার আধিক্য কীভাবে অন্যদিকের অনুদারতা দিয়ে ভারসাম্যে আনবার চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা এই অনুদার পথ দিয়েই যাত্রা করেছি; দেখতে চেয়েছি, যে কারণগুলির ভিত্তিতে এই অনুদারতা গড়ে উঠেছে তার যৌক্তিকতা কতখানি। কিন্তু এই মূল্যায়নের জন্যে আমরা ততখানি সহায়তা নিইনি অন্য রসবেত্তার, যতখানি নিয়েছি নিজেদের রসানুভূতির।

কবির কাব্যধারা অবলম্বন করে আমরা কালানুক্রমিকভাবে অগ্রসর হয়েছি। আমরা নিবিড় মনোযোগে শুনতে চেয়েছি কবির বক্তব্য, তাঁকে অবসর দিয়েছি তাঁর উপলব্ধিটিকে আমাদের অন্তরে সঞ্চারিত করে দেবার জন্যে। কিন্তু একথাও ভুলিনি আমরা যে বিশ্লেষণের নির্মমতা পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের অখণ্ড মূর্তিটিকে নষ্ট করে ফেলে। আমরা তাই সতর্ক থেকেছি, কিন্তু রসাস্বাদনের জন্যে উন্মুখ রেখেছি মস্তিষ্ক আর হৃদয়কে; এইভাবেই আমাদের প্রদক্ষিণ ফুরোলো একদিন। যে চিহ্নিত বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিল, আমরা প্রত্যাবর্তন করলাম অভ্রান্তভাবে সেই বিন্দুতেই। যাত্রা কবে যে প্রদক্ষিণে রূপান্তরিত হয়েছে, বস্তুত সে ধারণা মধ্যপথে আমাদের একেবারেই ছিল না। যাঁকে সামনে রেখে অজস্র সঙ্কোচ

ও অভিযোগ নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলাম, এখন দেখি তাঁকে দক্ষিণে রেখে আমরা একটা পরিবেষ্টন রচনা করেছি মাত্র। আমরা প্রত্যাবর্তন করেছি সূচনা বিন্দুতে।

অস্বীকার করব না, এ-অনুভূতি মধ্যপথেই একবার হয়েছে আমাদের। আমাদের মনে হয়েছে, যেদিন কবি তাঁর গানের ডালা নিয়ে এসেছিলেন, ছোট গান সুর তান সংযোগে গাইতে শুরু করেছিলেন; সেদিনের বক্তব্য আর পরবর্তী যুগের বক্তব্যের মধ্যে একটা মৌলিক ঐক্য আছে। সেদিনের ক্ষুদ্রায়তন 'গীত' আর পরযুগের দীর্ঘ কবিতা মূলত একই বক্তব্য প্রকাশ করেছে। অক্ষমালার আবর্তন বাহ্যিক, যে নিগূঢ় ধ্যানমন্ত্রটি কবি জপ করে চলেছেন, সেটি স্বল্পাক্ষর। ভাবৈকবিন্দুতে নিবিষ্ট। আমাদের এই অনুভূতির কথা সেদিন একবার উল্লেখ করেছি। পাশ্চাত্য সমালোচকের উদ্ধৃতি উল্লেখ করে প্রমাণ করতে চেয়েছি, এই ভাবগত ঐক্য শিল্পসৃষ্টির ঐক্যে প্রকাশিত হয়েছে প্রতিটি স্রষ্টার সৃষ্টিতে। এঁরও সমগ্র রচনা একটি স্বল্পাক্ষর কবিতা।

আজ এই কথা আবার স্মরণ করব। বহু গান আর কবিতার মধ্যে যে মূল কথাটি তিনি বলতে চেয়েছেন, তা আজ আর একবার শুনব, ভেবে দেখব তার যৌক্তিকতা।

কবির বক্তব্য একটিই—প্রেম, প্রীতি আর ভক্তি এই তিনটি ভাবের সার্থক সমন্বয়ের মধ্যেই জগৎ-সত্তার প্রকৃত অর্থ নিহিত। প্রেমময় ভাব থেকে উৎপন্ন হয় সমগ্র মানবসমাজের প্রতি উদার মনোভঙ্গী। তার মধ্যে উচ্চনীচ, আপন-পর-চিন্তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। হৃদয় অসীম ঔদার্যের অধিকারী হয়ে ওঠে। এর থেকে আসে প্রকৃতি-প্রীতি। সে প্রীতিরও ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়, তাকে অবলম্বন করে অনুভূতি এক সময় উপলব্ধির ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হয়। তখন জড় আর চেতন, প্রকৃতি আর মানুষ এ দুয়ের মধ্যে যে সৃষ্টি আর উপযোগিতাগত ঐক্য আছে, সেই সত্যটি উপলব্ধ হয়। এ গেল রসদৃষ্টির দিক। এর পরই আসে

রসসৃষ্টির কথা। প্রেম ও প্রীতিসন্ধানী সত্তা জগৎ ও জীবনের কেন্দ্র থেকে যে মহৎ আর চিরন্তন সত্যটিকে আবিষ্কার করেছে এবার সেটিকে প্রকাশ করার পালা। কিন্তু তার জন্যে চাই একটি বিশেষ শক্তির আনুকূল্য। এর অভাবে সীমার অসীমে উত্তরণ সম্ভব নয়, ব্যক্তিসত্তার মধ্য থেকে কবিসত্তার পূর্ণ প্রকাশ সম্ভব নয়। এবার তাই এলো ভক্তিভাবের কথা। একনিষ্ঠভাবে সারস্বত প্রেরণা লাভের জন্য তপস্যার কথা। যে বিশেষ লগ্নে এই ভাবত্রয়ীর সম্মেলন ঘটল, সেই লগ্নেই নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ। বিভিন্ন আকৃতির আর প্রকৃতির কথা—দেহকে আশ্রয় করে কাব্যের আত্মা নিজেকে প্রকাশিত করল সহৃদয় পাঠকের জন্যে।)—

চরাচর ত্রিসংসার
সকলেই আপনার,
স্বপনে জানে না কারে
অবিশ্বাস কয়

যাত্রা শুরু হোল এখান থেকে। এর সঙ্গে যুক্ত হোল—

অনুরাগী প্রমদার
অমায়িক ব্যবহার
কৃপাময় জনকের

স্নেহ ছায়াবলম্বন। (মাতৃহীন বিহারীলালের স্নেহাশ্রয় পিতা আর প্রেমের আধার পত্নী। মোহ একাধারে অবিদ্যা আর দুঃখ। তাই কবি স্মরণ করিয়ে দিলেন, দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপাশ্রয়ে আকর্ষণ সৃজিত হলেও প্রেমের মধ্যে রূপমোহ নেই। সেই রূপমোহ প্রেমস্বরূপ উপলব্ধির ক্ষেত্রে বিরাট বাধা।) বললেন—

প্রেম প্রেম করে লোকে
কে জানে প্রেম কি ধন ?
সকলে রূপের করে
অনায়াসে সঁপে মন।

দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপে যেমনি বিভিন্নতা দেখা যায়, তেমনি দেখা যায় মানুষের ব্যবহারে ভিন্নধর্মিতা। এই বিভিন্নতাকে ঐক্যের বিন্দুতে আনতে না পারলে তা জ্ঞান নয়, আর আনন্দও নয়। জ্ঞানময় সত্তাই আনন্দময় সত্তা। কবি তাই আপন ভাবজগতের মধ্যে জ্ঞানের সন্ধানে ব্রতী হন—

যাইব নির্জন স্থলে
নাইব পবিত্র জলে
দেখিব হৃদি কমলে
প্রেমময় সনাতন।
নয়নে বহিবে ধারা
আপনারে হব হারা
আমি কে বা এরা কারা
যথার্থ হইবে জ্ঞান।

প্রেমাঞ্জনরঞ্জিত দৃষ্টিতে এবার বহিঃপ্রকৃতির রূপদর্শন। কিন্তু এক্ষেত্রেও রূপময়তার গণ্ডীর মধ্যে কবির শান্তি নেই, রূপাতীত ভাবে উত্তীর্ণ হবার সাধনা তাঁর। রূপের আকর্ষণে ধরা দেবার পর এখন প্রণয়ের নিবিড় বন্ধন স্পষ্টতই অনুভূত হচ্ছে—

প্রণয় করেছি আমি
প্রকৃতি রমণী সনে,
যাহার লাবণ্য ছটা
মোহিত করেছে মনে।

এ প্রণয়বন্ধন অচ্ছেদ্য, এর অনুভূতিও সর্বাত্মক।

যখন যেথায় যাই
প্রকৃতি তো ছাড়া নাই,
ছায়া সমা প্রিয়তমা
সদা আছে সনে সনে।

এ পর্যন্ত হ'ল শক্তিসঞ্চয়ের ইতিহাস বর্ণনা। এর মধ্যে কবির

প্রেম ও প্রীতির আধারগুলির সন্ধান পাওয়া গেল। এগুলিকে কেন্দ্র করে তাঁর উপলব্ধির স্বরূপটিরও অর্থবোধ হ'ল। এখন শুরু হ'ল সারস্বত প্রেরণাসন্ধান। সে প্রেরণার মূলে বিদ্যা,—যে বিদ্যা মুক্তি দেয়। কবি বিদ্যা বা সত্যজ্ঞানকেই প্রতিভার স্পর্শে আলোকিত হয়ে উঠতে দেখলেন এবার। পুরুষ আর প্রকৃতির আপাত দৃশ্যমান দ্বৈতসত্তা প্রকৃতপক্ষে অদ্বৈতসত্তারই রহস্যাবৃত প্রকাশ। কবি যাদের দেখে প্রশ্ন করেছিলেন 'কে এঁরা যুগল রূপে করেন ভ্রমণ?' তাঁদের পরিচয় নিজেই দিলেন—

* * প্রতিভা সতী
লয়ে জ্ঞান প্রাণপতি
হয়েছেন মূর্তিমতী
দিতে দরশন।

ভক্তিভাবে আপ্লুত অন্তরের মধ্যে জ্ঞান ও প্রতিভার প্রতিমূর্তি সারদা প্রতিষ্ঠিতা হলেন প্রেরণাদাত্রীরূপে। এবার কবির সৃজনশীল অধ্যায় শুরু হলো। কিন্তু এই অধ্যায়ের দিকে দৃষ্টি দেবার পূর্বে মনে রাখতে হবে যে কবির এ-সৃষ্টি শুধু বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়। 'বুদ্ধি আর হৃদয়ে মিলন, বড় সুশোভন, সুঘটন'—সমস্যার সন্ধানসূত্র দিলেন কবি স্বয়ং। বুদ্ধির সঙ্গে হৃদয়ের, বিচারশীলতার সঙ্গে অনুভূতি-প্রবণতার সংমিশ্রণ চাই যথাযথ পরিমাণে। তাহলেই এ কবির কাব্যধারা কাব্যপাঠকের অন্তরে রসনিষ্পত্তি ঘটাতে সক্ষম হবে। তাই কবির সতর্কতাবাণী শুনি—

বুঝিলে ইহার ভাব,
পাইবে ইহার ভাব,
প্রেম, ধর্ম, প্রকৃতির
হবে উদ্দীপন।

যদি বলি যাত্রা শুরু হ'ল আমাদের আর প্রদক্ষিণ শেষও হ'ল আমাদের, অনৃতভাষণ হবে না সেটি। লক্ষণীয় যে এতক্ষণ আমরা

শুধু সঙ্গীত-শতকের মধ্যেই থেকেছি। কিন্তু বিহারীলালের সমগ্র কাব্যসৃষ্টিকে আশ্রয় করে যে মূল বক্তব্যটি আত্মার মূল্যে প্রতিষ্ঠিত তাকেও উপলব্ধি করতে পেরেছি। 'সারদামঙ্গল' রচনা প্রসঙ্গে কবি যে প্রীতি, মৈত্রী আর সারদা-বিরহের কথা উল্লেখ করেছিলেন, যে ভাবত্রয়ীকে আমরা প্রেম প্রীতি ও ভক্তির ভাব বলে গ্রহণ করেছি, তারই বিচিত্র প্রকাশ লক্ষ্য করা গেল তাঁর সঙ্গীতশতক' গ্রন্থের মধ্যেও। এক্ষেত্রে ধারণাশক্তি বা 'ধর্ম' বলে কবি যাকে উল্লেখ করেছেন আমরা তাকেই বলেছি ভক্তিভাব, তাকেই সারস্বতপ্রেরণার সঙ্গে একাত্ম করে নিয়েছি। এ ধর্ম বন্ধনসূত্র। (বিহারীলালের কাছে ধর্ম অর্থহীন চিরাচরিত আচারসমষ্টি নয়, আনন্দময় প্রেমসত্তা, ভূমাস্বরূপ। প্রকৃতিপ্রেম, মানবপ্রেম আর ভগবৎপ্রেমের নির্যাস।) কবিজীবনের আনন্দ বেদনা এই প্রেমধর্মকেই কেন্দ্র করে সৃজিত হয়। আলোছায়ার সেই অপরূপ সৌন্দর্য আমরা কাব্যবৈচিত্র্য আলোচনাপ্রসঙ্গে অনুভব করেছি। যাই হোক, কবি বিহারীলালের বক্তব্য যে উপলব্ধি-টিকে আশ্রয় করে প্রকাশিত, সে উপলব্ধির সাক্ষাৎ পাই 'সঙ্গীত-শতকে' সর্বপ্রথম, কিন্তু সেইটাই পরবর্তীকালে ধ্বনিত হয় নানা সুরে বিভিন্ন কাব্যের আধারে।

প্রতীয়মানার্থই কাব্যের আত্মা নয়, বাহ্য জগতেরও বক্তব্য নয়। কাব্যের প্রাণ তার শব্দার্থের অতীত ব্যঞ্জনা বা ধ্বনি। 'ধ্বন্যালোকে' বলা হয়েছে,—

যত্রার্থঃ শব্দো বা তমর্থমুপসর্জনীকৃতস্বার্থৌ।
ব্যঙ্ক্তঃ কাব্যবিশেষঃ স ধ্বনিরিতি সূরিভিঃ কথিতঃ॥

বাহ্যজগতের বেলায়ও তাই। যা দেখছি তার চাইতে অনেক বেশী দেখছিনা। দৃশ্যমান জগতের অন্তরে যে মহাসত্যটি, যে বহু মূল্য বক্তব্যটি নিহিত, তার উপলব্ধির মধ্যেই আনন্দ। কবির পারিবারিক পরিচয়ে যিনি 'প্রেয়সী' সেই সৌন্দর্যময়ী, প্রেমময়ী আর রসময়ীর মধ্যেই প্রেম ও সৌন্দর্যের, বুদ্ধি ও প্রেরণার সারীভূত

মূর্তি সারদাকে প্রত্যক্ষ করলেন। 'সাধের আসন' কাব্যগ্রন্থের উপসংহারে ঘোষণা করলেন—

প্রেয়সীর ঢল ঢল বিকশিত আননে,
দেখি গে যোগেন্দ্রবালা যোগভোলা নয়নে !

কিন্তু এও বলি আমরা এই অপূর্ব মূর্তি যাত্রারম্ভে প্রত্যক্ষ করেছিলাম। 'বঙ্গসুন্দরী'র 'নারীবন্দনা' সর্গে বঙ্গনারীর সঙ্গে উমা ও রাধার মিলিত সত্তা লক্ষ্য করেছি। প্রিয়তমার অপূর্ব সংমিশ্রণে যে ভাবমূর্তি কবি জীবনের প্রারম্ভে গড়েছিলেন, 'নিশান্ত-সঙ্গীতে'র পর্যায়ে এসে তারই বেদীমূলে কবি সশ্রদ্ধ অঞ্জলি দিলেন—

তোমার পবিত্র কায়া
প্রাণেতে পড়েছে ছায়া
মনেতে জন্মেছে মায়া ভালোবেসে সুখী হই।
ভালবাসি নারী নরে,
ভালবাসি চরাচরে,
সদাই আনন্দে আমি চাঁদের কিরণে রই।

আমরা এখানে পৌঁছেই অনুভব করতে পারি যে কোন দূরলক্ষ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে আমরা যাত্রা করিনি। যে বিন্দু থেকে চলতে শুরু করেছিলাম, সেখানেই প্রত্যাবর্তন করেছি আমরা। বস্তুত একটি মহৎ ভাবসত্তাকে দক্ষিণাবর্তে প্রদক্ষিণ করেছি শুধু। প্রদক্ষিণ করেছি তাঁর প্রেরণা-উৎসের চতুর্দিকে।

শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে বিহারীলালের প্রতিষ্ঠা এইখানেই। তাঁর কাব্যসৃষ্টির প্রাচুর্য যেমনি উপেক্ষণীয় নয়, তেমনি দুর্লক্ষ্য নয় তাঁর কাব্যে বৈচিত্র্য। আর এ দু'টি গুণকে অবলম্বন করে প্রসঙ্গ আর প্রযুক্তিগত দক্ষতার আধারে যে চিরন্তন সত্যটিকে তিনি তুলে ধরেছেন তা এই যে কবির জীবনে সারস্বত প্রেরণার সঙ্গে যদি প্রেম ও প্রীতির বন্ধনটি সুদৃঢ় হয়, তবেই সৃষ্টি সার্থক। পরম দক্ষতার সঙ্গে অপূর্ব সামঞ্জস্য রক্ষা করে বিহারীলাল এই প্রতীতিটিকে নিষ্ঠাসহকারে

'সঙ্গীত-শতকে'র কাল থেকে 'নিশান্ত সঙ্গীত' পর্যন্ত কৃতাঞ্জলিপুটে ধারণ করে রেখেছেন। এ যে সুগঠিত, সুসংহত ব্যক্তিত্ব এবং উচ্চকোটির প্রতিভালক্ষণ তাতে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই। এই সবকিছুর পটভূমিতে কবির সমগ্র রচনা একটি ক্ষুদ্রায়তন গীতিকবিতার অখণ্ড সৌন্দর্যে অভিষিক্ত হয়ে উঠেছে। আবার বিহারী কবির প্রতিষ্ঠা এইখানে।

কবির সৃষ্টিবৈচিত্র্য আলোচনা করেছি। দেখেছি তাঁর সজাগ আর সরাগ মন পঞ্চেন্দ্রিয়কে উন্মুখ করে রেখেছে চিরদিন। পৃথিবীর রূপ, রস, শব্দ কোন কিছুর প্রতিই তিনি উদাসীন নন। 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যের প্রথম সর্গে প্রকৃতিউপভোগের এই কামনাটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কিন্তু তারই আধারে আছে মানবপ্রেম আর দেশপ্রেম। ধীরে ধীরে বিভিন্ন কাব্যের ভিতর দিয়ে যখন অগ্রসর হই, দেখতে পাই অধ্যাত্মচেতনার বিকাশ আর সেই সঙ্গে সংসার সমাজ এমনকি শিল্পসচেতনতার প্রকাশও। প্রতিটি বক্তব্য সুমিত ভাষণের আধারে মর্মস্পর্শী। গৃহে 'দুরাত্মা পুত্র' স্থান পায় কিন্তু পাপস্পর্শমাত্রই 'কন্যা ভেসে যায়।' সমাজে 'মানুষ জন্তুর' প্রাধান্য আর নারী সম্পর্কে মূল্যবোধের অভাব। এ সমাজের সংস্কার 'কিছুই হবে না কিন্তু কেবল কথাতে'- এ সব কথা নানা প্রসঙ্গে শুনেছি। আবার এও শুনেছি যে 'ইউরোপী ব্যাঘ্র দলে দলে' এসে ভারতবর্ষের দুর্দশা বৃদ্ধি করছে। এ সব নানা বক্তব্যের মাঝখানে কবি ও কাব্যের কথা ভোলেননি বিহারীলাল। তিনি সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করেছেন অবিশ্রাম 'মাতৃভাষা সাধনা' প্রসঙ্গে 'কৃত্তি, কাশী, ভারত, মুকুন্দ' মহাকবিদের কথা। বড় দুঃখ করেই বলেছেন 'এখন ভারতে ভাই কবিতার জন্ম নাই,' বলেছেন প্রকৃত কাব্য সমালোচকদেরও অভাব যথেষ্ট। এমন করে বহু বিচিত্র বিষয়ের অবতারণা করে কবি বিহারীলাল উনিশ শতকের গীতিকবিতার প্রাচুর্যকে আহ্বান করে এনেছেন। কিছু পরিমাণে পুরাণ উপনিষদে আর বহুল পরিমাণে সংসার আর সমাজেই যে কাব্যসৃষ্টির উপাদান

সংগুপ্ত আছে, বিহারীলাল তার সন্ধান দিলেন। আত্মমগ্ন কবির কল্পনার আলোয় ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু বস্তু আর ভাব গীতিময় উচ্ছ্বাসে অসংখ্য তারকার দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। উনিশ শতকের গীতিকবিতার ক্ষেত্রে নতুন পথের সন্ধান পেল। সৃজনধর্মী কবিপ্রতিভা বহির্মুখিতা পরিত্যাগ করে মুখ্যত আত্মমুখিনতায় প্রতিষ্ঠিত হ'ল। 'বাধাবন্ধ-হারা' আবেগ কাব্যধারার নিয়ামক রইল না। কাব্য ঐতিহ্যের ও সামাজিক চিন্তাবিবর্তনের ধারাটিকেও আত্মস্থ করল সুনিপুণভাবেই। এর ফলে বিহারীলালের কাব্যে মননপ্রধান সৃষ্টির সঙ্গে অনুভূতিপ্রধান সৃষ্টির অপূর্ব মেলবন্ধন লক্ষ্য করা গেল। এ ধারার ভগীরথ বলে আমরা তাঁর নাম বহুবার উল্লেখ করেছি। এখানেও তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিষ্ঠা। আর এ আলোচনাও করা হয়েছে যে কবির প্রবর্তিত ধারা পরবর্তী কালে সুরেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার প্রভৃতি বহু কবিকেই প্রভাবিত করেছে।

কবির শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর আধুনিক মানসিকতা সৃষ্টিতেও। যে সত্যোপলব্ধি সমাজচেতনা আর ঐতিহ্য চেতনার ঐক্য ঘটিয়েছে, তা যে আধুনিক মনোভঙ্গীরই পরিচায়ক সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। গীতিকবিতা মন্ময়তামুখ্য। কবি বিহারীলালও নিবিড়ভাবে আত্মমগ্ন। প্রশ্ন ছিল এই আত্মমগ্নতার কারণ কী? উনিশ শতকের নবজাগরণমূলক বিভিন্ন মনোভঙ্গীর মধ্যে তীব্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ অন্যতম। আমাদের বিশ্লেষণ এইটিই প্রমাণ করেছে যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের তীব্রতাই বিহারীলালের নিবিড় আত্মমগ্নতার কারণ। এই মন্ময়তা গীতিকবিতার ভাব উৎস হয়ে উঠেছে। কিন্তু উনিশ শতকের পটভূমিতে এই মন্ময়তা যদি মন্ময়সর্বস্বতায় পর্যবসিত হ'ত, তবে তার মূল্যহানি ঘটত নিঃসন্দেহে। বিহারীলাল তা যে হতে দেননি, এখানেও তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত।

বিহারীলালের কাব্য প্রাচ্য আলংকারিকদের বিচারে নিতান্তই ভাবগম্য। সেখানে কবির আপন আনন্দটি আর আপন উপলব্ধিটিই

মুখ্য। এই উপলব্ধি আর আনন্দাস্বাদনের গভীরতা বিহারীলালের ক্ষেত্রে এত বেশী যে সেখানে কিয়ৎপরিমাণে অস্পষ্টতা থাকাই স্বাভাবিক। কবির কাছে নিজের অন্তর্দৃষ্টিতে যা ধরা পড়ে, তাকে সবসময় সর্বগ্রাহ্য ভাষায় নিখুঁতভাবে প্রকাশ করা যে সম্ভব নয় এই সহজ সত্যটি কাব্যপাঠকমাত্রেই অনুভব করতে পারেন। আর তাছাড়া কাব্য যে বাচ্যার্থে সম্পূর্ণ নয়, বাচ্যাতীতের ব্যঞ্জনায় তার প্রকৃত মূল্য, এ সব কথা আর নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই এ যুগে। অস্পষ্টতা যা-কিছু থাকে তার অনেকখানিই আমাদের উপলব্ধির মধ্যে, আর তার প্রধান কারণ শ্রদ্ধাহীনতা। অতি সাম্প্রতিক কালে যেসব কবিতা রচিত হচ্ছে তার প্রতিও এক শ্রেণীর পাঠকের এই ধরনের অভিযোগ আছে। সে অভিযোগও একই শ্রেণীভুক্ত এবং তার কারণও ঐ একই। অস্পষ্টতার অন্যান্য কারণ কতখানি কাব্যগুলির মধ্যে নিহিত, সে আলোচনাও আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে করেছি।

প্রাক্ রবীন্দ্রযুগের কাব্যাশ্রিত ঐতিহ্যধারা যাঁদের অবদানে পরিপুষ্ট তাঁদের মধ্যে প্রধান মধুসূদন, হেমচন্দ্র, বিহারীলাল ও নবীনচন্দ্র। এঁদের সৃষ্টিগত পার্থক্য, এমনকি এঁদের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রভাবগত পার্থক্য যে পরিমাণ থাকনা কেন, এঁরা চারজনই প্রথম শ্রেণীর কবি, major poets। এই চারজন প্রথমশ্রেণীর কবি মূলত দু'টি কাব্যধারার প্রবর্তক। সে দুটি ধারার একটি আখ্যানধর্মী এবং অন্যটি গীতিধর্মী। এই দুটি ধারাকে অবলম্বন করেই বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার প্রকাশ। গীতিধর্মী ধারার প্রথম সার্থক প্রবর্তনের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব বিহারীলালের। মহাকাব্যে মধুসূদন এবং মন্ময়তামুখ্য গীতিকাব্যে বিহারীলাল সমান শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী।

যুগপ্রভাব থেকে কবি বিহারীলাল মুক্ত ছিলেন এ ধারণার পোষকতা আমরা করিনা, বরং যুগচেতনা তাঁর কবিসত্তাকে বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করেছিল, এই বক্তব্যই আমরা বহুক্ষেত্রে তুলে ধরেছি।

কিন্তু তাই বলে এই ধারণার সমর্থক আমরা নই যে, তাঁর কোন কোন কাব্যের সর্গবিভাগ আছে বলেই মৌলিকতা নেই এবং এই রীতি মধুসূদনের প্রভাবসঞ্জাত, অতএব বিহারীলালের স্থান কবি হিসেবে এমন কিছু উচ্চে নয়।[২] 'সারদামঙ্গল' ও 'সাধের আসন' খণ্ডকবিতার সমষ্টি নয়, বিভিন্ন সর্গের মধ্যে ভাবগত সংযোগসূত্র সংশয়াতীত ভাবেই বর্তমান, এ কথা আমরা কাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গেই বলেছি। আমরা সর্গসজ্জাকে মৌলিকতার নিদর্শন মনে করিনা। কবির মৌলিকতা আত্মমগ্ন গীতিকবিতার ধারাসৃষ্টিতে এবং নতুন কাব্যাদর্শ গ্রহণে। শুধু তাই নয় প্রেম ও প্রকৃতি, কবিজীবনে অবারিত প্রেরণার উৎস। অধ্যাত্মভাবমূলক সারদাচেতনা পরবর্তীকালে নানা ভাবে ও রূপে বাংলা কাব্যধারাকে প্রভাবিত করেছে। এ দিক থেকেও বিহারীলালের এই মৌলিক অবদান সশ্রদ্ধ উল্লেখের দাবী রাখে। এ যুগের শ্রেষ্ঠ প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু এই প্রতিভা-বিকাশে কবি বিহারীলালের কাব্যমন্ত্র তর্কাতীত পরিমাণেই সাহায্য করেছে।[৩] এখানেও কবির অবদান যে যথেষ্ট মূল্যবান সেই সত্যটি প্রমাণিত। অতএব উনবিংশ শতকের আখ্যানমূলক কাব্যধারার সমান্তরাল ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন আত্মমগ্ন গীতিধর্মী কাব্যশাখার সংযোজন করে বিহারীলাল অনন্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন এবং তিনি শুধুমাত্র রোম্যান্টিক কবিগণের অগ্রণীই নন, বাংলা কাব্যধারায় অন্যতম প্রথম সারির কবি।)

নির্ঘণ্ট—১

(ব্যক্তিনাম)

* শ্রীতাপসকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক সংকলিত।

নির্ঘণ্ট—২

(গ্রন্থ, প্রবন্ধ, পত্র-পত্রিকা)